মনোজ বসুর

শ্রেষ্ঠ গল্প

বেঙ্গল পাবলিশার্স

১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট,

কলিকাতা—১২

প্রথম সংস্করণ—আষাঢ়, ১৩৫৬

প্রকাশক—শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

বেঙ্গল পাবলিশার্স

১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট

কলিকাতা—১২

মুদ্রাকর—শক্তি দত্ত

দি প্রিন্টিং হাউস

৭, শ্যাক স্ট্রীট,

কলিকাতা—৫

প্রচ্ছদপট পরিকল্পনা—

আশু বন্দ্যোপাধ্যায়

ব্লক ও প্রচ্ছদপট-মুদ্রণ—

ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও

বাঁধাই—বেঙ্গল বাইণ্ডার্স

পাঁচ টাকা

সূচীপত্র

রায়রায়ানের দেউল	১
বনমর্মর	২৪
জলতরঙ্গ	৪৩
লাল চুল	৬৯
ফার্স্ট বুক ও চিত্রাঙ্গদা	৮৭
অভিভাবক	১০৬
আঙটি চাটুজ্জের ভাই	১১৮
খাজাঞ্চিমশায় ও ভাইঝি	১৩৬
পৃথিবী কাদের ?	১৫৯
বন্দে মাতরম্	১৬৪
মন্বন্তর	১৮০
লঙ্গরখানা	১৯৭
কানু গাঙ্গুলির কবর	১৯৯
আধুনিকা	২১১
কুম্ভকর্ণ	২২৩
মাথুর	২৩৯

মনোজ বসু

১৩০৮ বঙ্গাব্দে যশোহর জেলার ডোঙাঘাটা গ্রামে জন্ম। শিক্ষা—জন্মপল্লী, বাগেরহাট ও কলিকাতায়। আট বছর বয়সে পিতৃহীন হয়ে দুঃখকষ্টের সঙ্গে নিদারুণ সংগ্রাম করতে হয়েছে। ইস্কুল ও কলেজ-জীবনে কয়েকজন বিপ্লব-নেতার সংস্পর্শে আসেন—'ভুলি নাই' প্রভৃতি উপন্যাসে এর প্রভাব আছে। ১৯২১ অব্দের অসহযোগ-আন্দোলনে কিছুকাল কলেজ ছেড়ে খদ্দর ও দেশি কাপড়ের প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। ভবানীপুর সাউথ সাবার্বান ইস্কুলের মাষ্টার ছিলেন। তেজস্বী ও স্পষ্টবাক্—মাথা নিচু করে দাস্যবৃত্তি করা এঁর স্বভাব নয়। সুবিধা পেয়েই চাকরি ছেড়ে দিলেন। সাহিত্যই বর্তমানে প্রধান উপজীবিকা।

পিতার প্রবন্ধ, কবিতা ও গান তখনকার কোন কোন কাগজে ছাপা হত। এই সাহিত্যকর্ম বাল্যবয়সে মনোজ বসুকে অনুপ্রেরণা দিয়েছে। বস্তুত অসংখ্য প্রতিকূলতার মধ্যে সাহিত্যই তাঁর জীবন-রস বিশুষ্ক হতে দেয় নি। পল্লীবাংলার শিল্পসম্পদ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে বিশেষ অনুরাগী। গুরুসদয় দত্ত মহাশয়ের সঙ্গে একসময়ে এই সম্পর্কে গ্রামে গ্রামে অনুসন্ধান করেছেন।

'বাঁধ' ও 'নতুন মানুষ' একই সময়ে 'প্রবাসী' ও 'বিচিত্রা' পত্রিকায় ছাপা হয়। এই প্রথম গল্প দুটোই মনোজ বসুকে অসামান্য প্রতিষ্ঠা দান করল। বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে এ সৌভাগ্য খুব কম লেখকেরই হয়েছে। উপন্যাস, ছোটগল্প ও নাটক লিখে থাকেন। এক সময়ে কবিতা লিখেও খ্যাতি লাভ করেছিলেন; ইদানীং কবিতা লেখেন না।

ভূমিকা

১

আধুনিক বাংলা সাহিত্যে প্রথম-সমরোত্তর বামপন্থী অত্যুগ্রতায় প্রলুব্ধ না হয়ে যাঁদের অপ্রমত্ত সাধনায় ছোটগল্পের কোমলকান্ত রূপটির পুনঃপ্রতিষ্ঠা সম্ভব হল, মনোজ বসু তাঁদেরই একজন। 'কল্লোল'-যুগের অব্যবহিত পরে, বঙ্গীয় চতুর্দশ শতাব্দীর চতুর্থ দশকে, তিনি লিখতে শুরু করেছেন; কিন্তু কল্লোলীয় প্রভাব থেকে তাঁর লেখনী সম্পূর্ণ মুক্ত। মূলত পল্লীবাংলার মানসলোকের শিল্পী তিনি। রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রেরই উত্তরসাধক। জীবনের স্নিগ্ধ নয়নাভিরাম রূপটিই তাঁর রচনাতে বিশেষ ভাবে ধরা পড়েছে।

মনোজ বসু যশোহরের সন্তান। পশ্চিমে পুণ্যতোয়া ভাগীরথী, পূর্বে কূলপ্লাবিনী পদ্মার বিশাল জলধারা। মধ্যভাগে ইচ্ছামতী-মধুমতী-চিত্রা-ভৈরব-কপোতাক্ষের চিরপ্রবহমান প্রসন্নতা। এখানে-সেখানে দিগন্ত-জোড়া বিলে-বিলে পশ্চিম-সমতটের ভৌগোলিক রূপটি বিশিষ্টতা পেয়েছে। অনতিদূরে সুন্দরবনের ভীষণ-সুন্দর আরণ্যক পরিবেশ। তারও দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের নীলাম্বুরাশি। সমুদ্রের সঙ্গে সম্পর্ক প্রত্যক্ষ না হলেও মধ্যে মধ্যে তার উচ্ছল তরঙ্গভঙ্গে লবণ-সমুদ্রের প্লাবন বয়ে যায়; পুনরায় শাখা-প্রশাখায় প্রবাহিত গাঙ্গেয় পলিমাটির প্রাণদ প্রলেপ লেগে বন্ধ্যা ধরিত্রী উর্বরতায় শ্যামল হয়ে ওঠে। দক্ষিণ বঙ্গের এই দাক্ষিণ্যময়ী প্রকৃতি এবং নিজের জীবনের ওপর তার প্রভাব বর্ণনাপ্রসঙ্গে মনোজ বসু বলছেন: 'পাড়াগাঁয়ের ছেলে, বাড়ির সামনে বিল। ছেলেবয়স থেকে ঋতুতে ঋতুতে বিলের রূপ বদলানো দেখেছি। চৈত্র-বৈশাখে ক্রোশের পর ক্রোশ ধু-ধু করে। রাত্রিবেলা বাইরের উঠোনে দাঁড়িয়ে দেখতাম, দূরে আগুন জ্বলে জ্বলে উঠছে। আলেয়া নাকি ঐগুলো!...* * * এই ভয়ংকর বিল বর্ষায় সবুজ-সজল-স্নিগ্ধ। দিগন্তব্যাপ্ত ধানক্ষেত। আলের প্রান্তে শাপলা আর কলমিফুলে আলো

হয়ে যায়। আল পেরিয়ে জলস্রোত বয়ে চলে, নৌকা-ডোঙা অবিরাম ছুটোছুটি করে। ধানবনের ভিতর থেকে চাষীর গলায় গান ভেসে আসে—সখিসোনার প্রেমকাহিনী। * * * আবার প্রথম শীতে পাকা ধানে বিলের গেরুয়া রং। বাঁক-বোঝাই ভারে ভারে ধান নিয়ে আসছে। ঘরে ঘরে পাল-পার্বণ ভাসান-কবি-যাত্রাগান। ঢোল বাজছে এ-পাড়ায় ও-পাড়ায়। * * * এই বিল ও বিলের প্রান্তবর্তী মানুষগুলো তাদের দুঃখ-সুখ-আশা-উল্লাস নিয়ে আমার মন জুড়ে রয়েছে। বিশাল বাংলাদেশকে চিনেছি আমি এদের মধ্য দিয়ে।' বস্তুত মনোজ বসুর বৃহত্তর জীবনচৈতন্যে বাংলাদেশের সমগ্র রূপটি ধরা পড়েছে বটে, কিন্তু তার কেন্দ্রবিন্দুতে আছে দক্ষিণ বাংলার এই প্রকৃতি-পালিত মানুষ, আর প্রকৃতিরই প্রভাবে নিয়ন্ত্রিত তাদের সুখদুঃখের কাহিনী।

২

একদিকে এই রুদ্র-মধুর প্রাকৃতিক পরিবেশ, অন্যদিকে মনোজ বসুর অনুভূতিপ্রধান শিল্পিমানস। বুদ্ধিপ্রদীপ্ত সৌরভাস্বরতা নয়, অনুভূতি-স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না-কোমলতায় মধুর হয়ে আছে তাঁর শিল্পলোক। মনের যে প্রত্যন্ত-প্রদেশে বুদ্ধির বিচারশক্তি বিমূঢ় হয়ে ফিরে আসে, অনুভববেদ্য সেই আলো-আঁধারি-লীলার শিল্পী তিনি। অনুভূতি কখনো লঘু রোমান্সের স্বচ্ছ-সলিলে সফরীধর্মী, কখনো অতীন্দ্রিয় উপলব্ধির অতলান্ত গভীরতায় নিমজ্জমান। 'রাত্রির রোমান্সে'র গার্হস্থ্য কূজন-গুঞ্জনের লিপিকার রূপেই হোক্‌, আর 'বনমর্মরে'র অবাঙ্‌মানসগোচর আরণ্য-চৈতন্যের 'মিস্টিক'-স্রষ্টারূপেই হোক,—তাঁর রহস্যরসিক শিল্পিমানসকে একটি সাধারণ বিশেষণে বিভূষিত ক'রে বলা যেতে পারে—'রোমান্টিক'। অবশ্য 'রোমান্স' আর 'রোমান্টিক'-রচনায় যে পার্থক্য বর্তমান, তার কথা সর্বদাই স্মরণ রাখতে হবে। 'রোমান্স' শিল্পলোকের দুলালী কন্যা। তার গায়ে দুঃখের আঁচড়টি লাগবারও উপায় নেই। ট্রাজেডি তার পক্ষে কল্পনাতীত। স্বপ্নলোকে সুখের হিল্লোলে ভেসে-বেড়ানোই তার স্বভাব। জীবনসত্তাকে পাশ কাটিয়ে মানুষের মন যে রূপকথার স্বপ্নস্বর্গ রচনা করে, তারই কুসুমিত রাজ্যে রোমান্সের আসন অধিষ্ঠিত।

রোমান্টিক রচনায় রোমান্সের এই স্বপ্নাবেশ হয়ত আছে, কিন্তু সে-স্বপ্ন জীবনসত্যের গভীরতম উপলব্ধির পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে না। 'রোমান্টিক' শিল্পী 'রিয়লিস্টে'র মত আত্মপ্রত্যক্ষ বাস্তবতাকেই শিল্পের একমাত্র উপাদান ব'লে স্বীকার করেন না, ভাবলোকে জীবনসত্য যে রহস্য-সুন্দর মূর্তিতে রূপায়িত হয়, তিনি সেই রূপকেই শিল্পে ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা করেন। রিয়লিস্ট এবং রোমান্টিক—দুজনেই জীবনের রূপকার;—একজন সত্যের স্বরূপ উদ্ঘাটনের সাহায্যে তা করেন, আরেকজন করেন সুন্দরের রহস্যোন্মোচন ক'রে। কাজেই রোমান্স আর রোমান্টিক রচনা এক পর্যায়ভুক্ত নয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে, বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী' বিশুদ্ধ রোমান্স। কিন্তু তাঁর 'কপালকুণ্ডলা' রোমান্টিক শিল্পের উৎকৃষ্ট নিদর্শন। তুলনায় আমাদের সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যে সাধারণ ভাবে রোমান্সেরই প্রাধান্য পরিলক্ষিত হবে, কিন্তু মহাকবি কালিদাসের শকুন্তলায় রোমান্টিক সৃষ্টির চরমোৎকর্ষ সাধিত হয়েছে। রাজপুরীর মানুষ দুষ্মন্তের সঙ্গে কণ্বমুনির আশ্রমকন্যা শকুন্তলার প্রথম পরিচয় রোমান্সের সীমা অতিক্রম করতে পারেনি। কিন্তু বহুদুঃখ ও বহুতপস্যার অবসানে মারীচের আশ্রমে দুষ্মন্ত-শকুন্তলার পুনর্মিলনে জীবনেরই রহস্যসুন্দর মূর্তিটি উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠেছে।

মনোজ বসুও রোমান্টিক, কিন্তু তাঁর সাহিত্যেও শকুন্তলার এই পূর্বমিলন ও উত্তরমিলনের রহস্যটি ধরা পড়েছে। আর এই জন্যেই সাধারণ রোমান্স-লেখকগোষ্ঠীর ঊর্ধ্বে জীবনশিল্পীদের মধ্যেই তাঁর আসন প্রতিষ্ঠিত। উদাহরণ হিসেবে তাঁর 'ফার্স্ট বুক ও চিত্রাঙ্গদা' গল্পটির উল্লেখ করা যেতে পারে। এ গল্পের নায়ক পশুপতি মাস্টার একজন দরিদ্র স্কুলশিক্ষক। প্রথম-যৌবনে তারও মনে স্বপ্ন ছিল। মহার্ঘ মূল্যে ক্রয় ক'রে সচিত্র প্রেমের কাব্য-পাঠের মধ্য দিয়ে সে-স্বপ্নকে সে জীবনে আস্বাদনও করেছে। আবার নিতান্তই প্রাণোচ্ছলতাবশে চলার পথে অপরিচিতা বালিকার হাতে সেই কাব্যগ্রন্থখানি তুলে দিতেও তার বাধেনি। কিন্তু জীবনের পথ-পরিক্রমায় দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম ক'রে সে-স্বপ্নের আজ লেশটুকুও অবশিষ্ট নেই। প্রোষিতভর্তৃকা গৃহিণীর পত্রে সংসারের অনটনের ছবিটিই প্রকট হয়ে ওঠে। শিশুপুত্র লিখতে-

শিশু প্রথম পত্রে পিতার নিকট একখানি ছবির বইএর আব্দার করে —কিন্তু অর্থাভাব হেতু শিশুর সেই সামান্ত আব্দার রক্ষাও বুঝি দুঃসাধ্য। "ভাবিতে ভাবিতে পশুপতির মন চলিয়া গেল আবার সেই বহু দূরবর্তী পশর নদীর পারে তাহার নিজের বাড়িতে···এবং সেখান হইতে চলিয়া গেল আরও দূরে প্রায় বিশ বছরের বিস্মৃতির দেশে— যেদিন প্রভাসিনীকে বিবাহ করিয়া গ্রামে ঢুকিয়া সর্বপ্রথমে ঠাকরুণতলায় জোড়ে প্রণাম করিয়াছিল···তারপর কত নির্জন নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নের মধুর স্মৃতি—ছায়াচ্ছন্ন সন্ধ্যাকালে চুরি করিয়া চোখাচোখি—স্বপ্নিময় জ্যোৎস্নারাত্রি জাগিয়া জাগিয়া কাটানো—ভোর হইলে বউকে তুলিয়া দিয়া নিজে আবার পাশ ফিরিয়া শোওয়া···। এখন আর সে-সব কথা কিছু মনে পড়ে না, পৃথিবীতে কিন্তু তেমনি দুপুর সন্ধ্যা ও রাত্রি আসিয়া থাকে। পৃথিবীর লোকে গান গায়, কবিতা পড়ে, প্রেয়সীর কানে ভালবাসার কথা গুঞ্জন করে, আকাশে নক্ষত্র অচঞ্চল দীপ্তিতে ফুটিতে থাকে, তারার আলোকে নারিকেল-পাতা ঝিলমিল করিয়া দোলে। পশুপতি সে সময় সংসারের অনটনের কথা ভাবে, জ্যামিতির আঁক কষে, নয় তো ঠাণ্ডা লাগিবার ভয়ে জানলা আঁটিয়া ঘুমাইয়া পড়ে।" কিন্তু এই দারিদ্র্য-অভিশপ্ত জীবনের মধ্যেও একদিন তার রুদ্ধগৃহের বাতায়ন-পথে স্বপ্নের ছোট্ট একটি পাখী উড়ে আসে। এক ঝড়ের রাতে একটি তরুণ-দম্পতি তার ঘরে কিছুক্ষণের জন্য আশ্রয় নেয়, এবং তাদের তরুণপ্রাণের স্পর্শ দিয়ে পশুপতির বিস্মৃতপ্রায় স্বপ্নকে সঞ্জীবিত ক'রে দিয়ে যায়। হয়ত প্রত্যক্ষ দিনের আলোয় সে স্বপ্নের কোনোই অর্থ নেই; কিন্তু তবু জীবনের কঠোর তপস্যায় মারীচাশ্রমে দুষ্মন্তরূপী রসিকচিত্তের সঙ্গে শকুন্তলারূপিণী হারানোস্বপ্নের উত্তরমিলনে দুঃখদারিদ্র্যময় জীবনই মধুরতর রূপে সত্য হয়ে ওঠে।

৩

মনোজ বসুর আরেকটি বৈশিষ্ট্য,—তাঁর জীবনবোধ গড়ে উঠেছে মানুষের ছোট্ট একটি নীড়কেই আশ্রয় ক'রে। বিরহ-মিলনে, দুঃখ-সুখে মুখ্যত তিনি দাম্পত্য-জীবনেরই শিল্পী। বাঙালীর ঘরোয়া

জীবনের এই প্রাণকেন্দ্রটির সন্ধান পেয়েছেন বলেই তাঁর রচনা যেমন স্বতস্ফূর্ত তেমনি চিত্তস্পর্শী। বস্তুত, দাম্পত্য-মিলনের রোমান্স ও মাধুর্য, তার সম্ভাব্যতা ও ব্যর্থতার কথা নিয়েই তাঁর বেশির ভাগ গল্পের সূত্রপাত। সুখস্বপ্নাবিষ্ট রসিক-মানুষের গার্হস্থ্য জীবনের ভিত ভাঙবার কাজে কখনো আসে দুর্ভাগ্যের অভিশাপ, কখনো প্রকৃতির উপদ্রব, আবার কখনো মানুষের অত্যাচার। জীবনসমুদ্র মন্থন ক'রে ওঠে দুঃখের হলাহল। তার জ্বালায় মানুষের জীবন হয় জর্জরিত। ব্যক্তিমানুষের সুখের ঘরে এই দুঃখের হলাহল-জ্বালা নিয়েই শুরু হয়েছে তাঁর জীবনের পরিচয়।— প্রশ্ন জেগেছে মনে, কেন এই দুঃখ? সমস্যা রূপ নিয়েছে বিভিন্ন দিক থেকে। জীবনবোধ প্রসারিত হয়েছে ব্যক্তি থেকে সমাজে, রাষ্ট্রে, দেশে। এমনি ক'রেই তাঁর শিল্পলোক ব্যষ্টিকেন্দ্রিক হয়েও সামগ্রিক জীবনচৈতন্যে উদ্ভাসিত।

দৃষ্টান্ত হিসেবে লেখকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা 'রায়রায়ানের দেউল'কেই গ্রহণ করা যেতে পারে। গল্পটি একটি ব্যক্তিপুরুষের আত্মপ্রতিষ্ঠার ব্যর্থ কাহিনী। বীরভৌমিকদের স্মৃতিবিজড়িত যশোহরের মাটিতে অবলুপ্ত একটি ভগ্নকীর্তিকে আশ্রয় ক'রেই এই বিশুদ্ধ রোমান্টিক গল্পটি গড়ে উঠেছে। দরিদ্র রামেশ্বর গৃহে তরুণী বধূ আর ছোট্ট বৈমাত্রেয় ভাইটিকে রেখে জীবিকান্বেষণে বেরিয়েছিল। দারিদ্র্যকে জয় করবার সম্বল নিয়ে সে এল ফিরে। কিন্তু ঘরের বুকে এসে দেখে তার ঘরটি শূন্য। মনের দুঃখে রামেশ্বর বৈমাত্রেয় ভাই মধুকরকে নিয়ে দেশ ছেড়ে চলে গেল। ফিরে এল কুড়ি বছর পরে ভাগ্যকে জয় ক'রে জায়গিরদার রায়রায়ান হয়ে। জায়গির নিয়ে লাগল লড়াই ভরত রায়ের সঙ্গে। ভরত রায় হলেন পরাজিত, তাঁর পত্নী-কন্যা হলেন রামেশ্বরের অন্তঃপুরে বন্দিনী। ভরত রায়ের কন্যাকে দেখে রামেশ্বরের নিজের হারানো নীড়টির কথা মনে পড়ল। নতুন করে সংসার গড়বার সাধ জাগল মনে। সংসার ত নয়, গৃহমন্দিরে দেবীর প্রতিষ্ঠা! ঐশ্বর্যখচিত রায়রায়ানের দেউল গড়ে উঠতে লাগল মহাসমারোহে। কিন্তু ভাগ্যের সঙ্গে লড়াই ক'রে ইতিমধ্যে যে আয়ুঃসূর্য অস্তাচলে ঢলে পড়েছে সেদিকে স্বপ্নাবিষ্ট মানুষটির খেয়াল নেই। ভাগ্যের ছলনা এল

শত্রুকন্যার হাত দিয়েই। যাকে অবলম্বন ক'রে দেউল প্রতিষ্ঠার কল্পনা, মিলনের ব্যর্থ প্রতীক্ষার লগ্ন উত্তীর্ণ ক'রে জানা গেল, সে তাঁরই বৈমাত্রেয় ভ্রাতার বাগ্‌দত্তা বধূ। ভাগ্যের সঙ্গে শেষসংগ্রামে পরাজিত রামেশ্বর নিজের কীর্তিকে চূর্ণ বিচূর্ণ ক'রে দীঘির অতল জলে ঝাঁপ দিয়ে জীবনের অবসান ঘটালেন। রোমান্টিক গল্পের উপযুক্ত বর্ণাঢ্য বর্ণনা আর অতীতাশ্রয়ী বীরত্ব-কল্পনায় গল্পটি রসোত্তীর্ণ হয়েছে। কিন্তু রোমান্সের স্বপ্নলোকে জীবনসত্যের স্পর্শ লেগেছে বলেই গল্পটি অসামান্য। যত বড় বীরপুরুষই হোন্ না কেন, প্রতিকূল দৈবের হাতে তাঁর নিস্তার নেই। বীর্যবত্তা দ্বারা দারিদ্র্যকে জয় করা যায়, কালের যাত্রাকে রোধ করা যায় না। ভোগলিপ্সু মানুষ বহু কষ্টে দারিদ্র্যকে জয় ক'রে দেখল, সংগ্রামের মধ্যেই নিজের অগোচরে ভোগ করবার বয়স তার উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। রামেশ্বরের ব্যক্তি-জীবনে মানবসাধারণের নিয়তি-নিয়ম-গ্রথিত এই ট্র্যাজেডিই রোমান্টিক কল্পনাকে জীবনমূল্য দান করেছে।

৪

মনোজ বসুকে মনের প্রত্যন্ত-প্রদেশবর্তী আলো-আঁধারি-লীলার শিল্পী বলে অভিহিত করেছি। জাগ্রত চেতনার সীমান্তলোকে প্রাকৃতিক পরিবেশে অতিপ্রাকৃতের রহস্যসুন্দর আবির্ভাবকে তিনি শিল্পরূপ দিয়েছেন। তাঁর শিল্পিমানসের এই বৈশিষ্ট্যের পরিচয় বিশেষভাবে পাওয়া যাবে 'লাল চুল' আর 'বনমর্মর' গল্পে। 'লাল চুল' গল্পে বেণুধরের জীবনে আবাহনের পূর্বেই এল বিসর্জন। বিয়ের আসরে বর এসে বসতে না-বসতেই দৈবদুর্ঘটনায় ছাত থেকে প'ড়ে কনের জীবনদীপ হল নির্বাপিত। কাঁচা হলুদের মত রং, রাজরাজেশ্বরী লক্ষ্মীপ্রতিমা। কনে-চন্দন-আঁকা শুভ্র কপাল ফেটে চাপ চাপ রক্ত জমে আছে। মেঘের মত কালো চুলের রাশি এখানে-সেখানে রক্তের ছোপে হয়ে উঠেছে ডগ্‌মগে লাল। মৃত্যুর অবগুণ্ঠনের অন্তরালেই হল বরকনের শুভদৃষ্টি। তারপর বেণুধর আর কিছুতেই তাকে ভুলতে পারল না। এদিকে পরিবারের ইজ্জৎ রক্ষার জন্যে পিতা দাবী করলেন, তিন দিনের মধ্যেই অন্য জায়গায় বিয়ে করতে

হবে। কিন্তু মরা মানুষ যে বেণুধরের পিছু নিয়েছে। এত সাধ-আহ্লাদ-ভালবাসা মুহূর্তে নিঃশেষ ক'রে কি মানুষ চলে যেতে পারে? এক ভৌতিক রহস্য বেণুধরের সমস্ত মন আচ্ছন্ন ক'রে রইল। রাত্রির অন্ধকারে তার মনে হল, একটি অসহায় প্রীতিমতী বালিকা বাপ মা এবং চেনাজানা সকল আত্মীয়পরিজন ছেড়ে এসে তার শয়নঘরের আশেপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বেণুধর দেখতে পায়, তার জানলায় সেই অদৃশ্যচারিণী হাতছানি দিয়ে তাকে ডাকছে। সে ডাকে সে সাড়া না দিয়ে পারে না। নিশীথ রাত্রে ঝড়ের বুকে সে বেরিয়ে পড়ে। জীবন ও মৃত্যুর সীমারেখা অতিক্রম ক'রে পৃথিবীতে এই মুহূর্ত প্রতিদিন আসে। দিনের অবসানে সন্ধ্যা—তারপর রাত্রি—পলে পলে রাত্রির বক্ষঃস্পন্দন বাড়ে, মধ্য আকাশ থেকে একটি নক্ষত্র খসে পড়ে, মৃত্যুপুরীর সিংহদ্বার খুলে যায়, পৃথিবীর মানুষের শিয়রে ওপারের লোক দলে দলে এসে বসে, ভালবাসে, আদর করে, স্বপ্নের মধ্য দিয়ে কত কথা কয়ে যায়।......

এই রহস্যচেতনা আরো রসনিবিড় হয়ে উঠেছে 'বনমর্মর' গল্পে। আধুনিক কথাসাহিত্যে 'মিস্টিক'-রসের পরিবেশন বড়-একটা চোখে পড়ে না, এদিক দিয়ে 'বনমর্মর' গল্পটি তুলনারহিত। সুন্দরবনের প্রভাব এ গল্পে অবিস্মরণীয় হয়ে রয়েছে। অরণ্যভূমির সংস্পর্শে জন্ম-জন্মান্তরব্যাপী জীবনপ্রবাহের এক অতীন্দ্রিয় চেতনা এই গল্পে অনুবিদ্ধ হয়ে আছে। মানুষের জ্ঞানবুদ্ধি আজও যা আবিষ্কার করতে পারেনি তারই কোন-একটা অপূর্ব ছন্দসংগীতময় গুপ্তরহস্য যেন এর মধ্যে মর্মরিত হয়ে উঠেছে। শুধু তাই নয়, এই অরণ্যময় পৃথিবীর স্থানকালপ্লাবী বিশাল অস্তিত্বের পাশে খণ্ড-কালের মধ্যে সীমাবদ্ধ পৃথিবীর মানুষ অতি ক্ষুদ্র একটি স্থানের ওপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য সংকীর্ণ স্বার্থচেতনায় কত ক্ষুদ্র হয়ে দেখা দিয়েছে! এই মানুষই নাকি অরণ্যকে উৎখাত ক'রে তার বুকে নিজের বসতি গড়ে তুলবে! কিন্তু বৃথা মানুষের এই চেষ্টা! বরং সৃষ্টির আদিকাল থেকে যত মানুষ পৃথিবীর বুকে তাদের সুখদুঃখ নিয়ে খেলা ক'রে গেছে, তারা সবাই আশ্রয় পেয়েছে সৌরালোকহীন এই অরণ্যরাজ্যে। তাই রাত্রির

অন্ধকারে এই রাজ্যের সিংহদ্বারে গিয়ে দাঁড়ালে বিস্মৃত অতীত যেন চোখ মেলে কাছে এসে কথা কয়ে ওঠে। অতিপ্রাকৃত এক বিপুল জীবনোপলব্ধি মনকে আবিষ্ট করে তোলে। নাগরিক সভ্যতা-নিয়ন্ত্রিত শিল্পক্ষেত্রে মনোজ বসু অরণ্যচেতনার মর্মরধ্বনিকে ভাষা দিলেন। সুন্দরবনের আত্মা বাংলা সাহিত্যে অমর হয়ে রইল।

৫

কিন্তু প্রাকৃতিক প্রভাব শুধু যে মানুষের জীবনে এক রহস্যময় চেতনার নতুনমহলকে অর্গলমুক্ত ক'রে দেয় এমন নয়; তার জীবনে চরম দুঃখও ডেকে নিয়ে আসে। 'জলতরঙ্গ' গল্পে আছে প্রাকৃতিক প্রতিকূলতায় সর্বস্বান্ত মানুষের দুঃখের কাহিনী। বর্ধিষ্ণু মাতব্বর চাষীপ্রজা ত্রিলোচন আর তার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী ফুলকুমারী। গোলাভরা ধান আর ঘরভরা আত্মীয়পরিজনে সুখের সংসার। একদিকে দুধমতী নদী, আরেক দিকে খাল—তারই মাঝখানে দিগন্ত-বিসারী বিলের বুকে ত্রিলোচনের সোনার ফসল ফলে। ইতিমধ্যে দুধমতীর ওপর নতুন সেতু প্রস্তুত হল। লোহালক্কড়ের জালে আবদ্ধ হল তার স্রোত। আর সেই জলধারা খালের মুখ আলগা পেয়ে সে দিকে বন্যাবেগে প্রবাহিত হতে লাগ্‌ল। বর্ষায় তার রূপ প্রলয়ংকর। বাঁধ ভাসিয়ে দিয়ে ক্ষেতের মধ্যে নোনা-জলের তুফান ওঠে। বিলের সমস্ত ফসল নষ্ট হয়ে যায়। ত্রিলোচন হাহাকার করে, কিন্তু উপায় নেই। অবশেষে জমিজমা জমিদারের কাছে ইস্তফা দিয়ে হয় সর্বস্বান্ত। কিন্তু দুর্ভাগ্য একলা আসে না, ওলাওঠায় একই সঙ্গে স্ত্রীপুত্রকন্যাকে খালের পাড়ে শ্মশানে তুলে দিয়ে আসতে হয়। সেই থেকে ত্রিলোচন ঘরছাড়া এক স্বপ্নাচ্ছন্ন বাতুল মানুষ। কেবল ঐ রাক্ষুসী খালের ধারে-ধারে ঘুরে বেড়ায়। আর জলতরঙ্গের মধ্যে সাগর-পারের লক্ষ লক্ষ জীবন্ত প্রাণচঞ্চল শিশুর কলধ্বনি শুনতে পায়। প্রমত্ত জোয়ার-জলে খালের বুক বেয়ে ভেসে আসে তার পুত্রকন্যা, আর আসে অনন্তকাল ধরে যে-সব ছেলেমেয়ে নদীর জলে ভেসে গেছে তারা সবাই; শ্মশানঘাট থেকে তারা উঠে আসে। অবশেষে সে পথ হল একদিন বন্ধ। বহুমানুষের অপরিসীম শ্রমে গড়ে উঠ্‌ল নতুন বাঁধ। গোটা

অঞ্চল জুড়ে মানুষের জোতজমি-গৃহরচনার নতুন আশা নতুন স্বপ্ন। কিন্তু ত্রিলোচনের চোখে ঘুম নেই। ভরা পূর্ণিমার প্রমত্ত জোয়ার এসে প্রতিহত হচ্ছে নতুন বাঁধের কঠিন মাটিতে। লক্ষ লক্ষ শিশু মাথা খুঁড়ে মরছে, তাদের মুক্তির পথ আজ অবরুদ্ধ। চুপি চুপি ত্রিলোচন বাঁধের মাটির চাঁই সরিয়ে দিয়ে তাদের পথ দিলে মুক্ত ক'রে। অমনি হাজার হাজার শিশু এসে স্নেহবুভুক্ষু বৃদ্ধকে হাজার হাজার বাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরল। বিপুল আনন্দ-বন্যায় জলোচ্ছ্বাসে 'কুটোর মত তারা পাগ্‌লা বুড়োকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল।

আশ্চর্য এই গল্প, প্রাকৃতিক অভিঘাতে বিকৃতমস্তিষ্ক ত্রিলোচনের ওপর জলকল্লোলের প্রতিক্রিয়া-বর্ণনায় লেখক অতি উচ্চশ্রেণীর কবিত্ব-কলার পরিচয় দিয়েছেন।

প্রকৃতির প্রতিকূলতায় মানুষের দুঃখের শেষ নেই। তবু এই প্রকৃতি, এই মাটিকেই মাটির সন্তানেরা প্রাণ দিয়ে ভালবাসে। 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রে ওরা এই মাটিরই পূজো করে। বঙ্কিমচন্দ্রের জাতীয় সংগীত তাদের জীবনে নতুন তাৎপর্যে সত্য হয়ে ওঠে। তাই পল্লীচাষী গহর জানে—এ তাদের মাটিরই গান। সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা ধরিত্রীমাতারই বন্দনা। তাই এই মাটি-মায়ের শ্যামল রূপটি যাদের লোভে ও লালসায় ক্লিষ্ট ও কলুষিত হয়, যেসব জমিদার আর ব্যবসায়ীর স্বার্থচেতনায় বহুমানুষের মুখের গ্রাস কেড়ে ধানের জমিতে নোনাজলের প্লাবন বয়ে যায়, তাদের তারা শত্রু বলেই জানে। প্রতিকারের সত্য পথ হয়ত তাদের জানা নেই, তাই অন্ধ আক্রোশে যেখানে-সেখানে আঘাত ক'রে নিজেরাই ক্ষতবিক্ষত হয়। দুঃখের পাত্র কানায়-কানায় ভরে ওঠে। কিন্তু 'বন্দে মাতরম্'-এর শিক্ষা মাটির ভালবাসায় রূপান্তরিত হয়ে তারই জন্যে দুঃখবরণের মধ্যে এক নতুন স্বাদেশিকতা ও শহীদজীবনের উদাহরণ রচনা করে।

তবু মাটির ওপর মাটির সন্তানদের দাবীই বা কতটুকু? কাদের এই পৃথিবী? যুগে যুগে যারা এই মাটির জন্যে প্রাণপাত করেছে, বন কেটে গড়ে তুলেছে জনপদ, বন্ধ্যা ভূমিকে শ্রমজলে করেছে শস্যশালিনী, সেই মাটির ওপর তাদের কিইবা অধিকার আছে?

জমিদারের মালখাজনার দায়ে অক্ষম প্রজার জমি অনায়াসে নিলাম হয়ে যায়। নায়েব-উজিরের চক্রান্তে একদিনে সম্পন্ন মানুষ হয় সর্বহারা। অপ্রবুদ্ধ বেদনাহত বঞ্চিত মানুষের মনে প্রশ্ন জাগে, 'পৃথিবী কাদের?' কিন্তু তারা জানেনা বিচারের আশায় কার দ্বারে গিয়ে দাঁড়াবে; তাই নিরুপায় হয়ে দেশত্যাগী হবার আগে নিজেরই ঘরে আগুন লাগিয়ে দরিদ্রের ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন পাঠাতে চায়,—'পৃথিবী যদি বাঁটোয়ারা করে দিয়েছিস—তবে আমাদের সেখানে পাঠাস কি জন্যে?'

৬

এ প্রশ্ন মননশীল মনের নয়, সংবেদনশীল বিক্ষুব্ধ চিত্তের। শিল্পীর মনেও গভীর সংবেদনশীলতার মধ্য দিয়েই এই প্রশ্ন জেগেছে। দুঃখী মানুষের দুঃখের স্বরূপ এবং দুঃখমোচনের উপায় আবিষ্কার করতে গিয়ে শিল্পিমানসে জেগেছে শিবপ্রতিষ্ঠার শুভৈষণা। জীবনসুন্দরের পূজারীকে প্রার্থনা জানাতে হয়েছে, 'হে মোর সুন্দর, আজ তুমি হও দণ্ডধর।' রৌদ্রী রাগিণীতে দীক্ষা গ্রহণ ক'রে স্বাপ্নিক নিজেও হয়েছেন সৈনিক। 'বনমর্মর'-'জলতরঙ্গে'র শিল্পী এমনি ক'রেই হয়ে উঠলেন 'ভুলি নাই'-'সৈনিক'-'দুঃখনিশার শেষে'র জনয়িতা। মনোজ বসুর জীবনে কোমল থেকে কঠোরে, মধুর থেকে রুদ্রে এ পরিবর্তন আকস্মিক বা অপ্রত্যাশিত নয়, তাঁর শিল্পিমানসের স্বভাব-ধর্মানুসারে স্বাভাবিক নিয়মেই এ বিবর্তন সংসাধিত হয়েছে। তাঁর সাধনা জীবনাশ্রয়ী ব'লেই জীবনবোধের ব্যাপ্তি ও বিস্তারের ফলে তাঁর সৃষ্টিবিবর্তনশীল রচনায় এ পরিবর্তন অনিবার্য রূপেই দেখা দিয়েছে

বর্তমান সংকলনে 'কানু গাঙ্গুলির কবর', 'আধুনিকা', 'কুম্ভকর্ণ' ও 'মন্বন্তর' গল্পে লেখকের এই বিবর্তিত শিল্পরূপের পরিচয় পাওয়া যাবে। বাংলার অগ্নিযুগের বিপ্লবী তরুণদের আলেখ্যরচনায় লেখকের একটি বিশিষ্ট ভঙ্গী আছে। প্রলয়রাত্রির অন্ধকারে লোকলোচনের অন্তরালে তাদের সর্বত্যাগী স্বদেশপ্রেম এবং নিঃশেষ আত্মবিসর্জনের দুর্লভ আদর্শ তাঁর বিস্ময়বিস্ফারিত মুগ্ধদৃষ্টির শ্রদ্ধাঞ্জলি লাভ করেছে। হয়ত তাদের

দুঃখবরণের রোমান্টিক দিকটাই তাঁর রচনায় অসামান্যতা পেয়েছে; তবু আদর্শনিষ্ঠ মহৎজীবনকে সাহিত্যে ধ'রে রাখার মূল্য চিরদিনই থাকবে। এ হিসেবেও গল্পগুলোর একটা স্বতন্ত্র আসন আছে। 'বাচ্চু গাঙ্গুলির কবরে' অমনি একটি বীর-কিশোরের আত্মোৎসর্গের কাহিনী। সেদিন বিপ্লবীদের নিরাপত্তার জন্যে যে অখ্যাত শহীদকে তাড়াতাড়ি মাটি চাপা দিতে হয়েছিল, আজ তাকে সেই ভূমিগর্ভ থেকে আবিষ্কার ক'রে জাতির মর্মমঞ্জুষায় সাতরাজার ধন মানিকের মতই সযত্নে রক্ষা করতে হবে—গল্পের এই ভাবব্যঞ্জনাটি বড় সুন্দর হয়ে উঠেছে।

'আধুনিকা' গল্পে বিয়াল্লিশের আগস্ট-আন্দোলনের একটি গুপ্ত-সংগ্রামিকার ছবি। পোস্ট-গ্রাজুয়েটের ছাত্রী লিলি মিত্তির। যার বাইরের রূপ দেখলে বিলিতি পারফিউমারির জীবন্ত বিজ্ঞাপন ছাড়া আর কিছু বলা যাবেনা। ধুলোভরা নোংরা পৃথিবী জুতোর হাই হিলের ডগায় সে ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে চলে। বিলাসিতা আর উচ্ছৃঙ্খলতায় সে সহপাঠীদের মুখরোচক গল্পের সামগ্রী। সেই বর্ণচোরা মেয়েটি কি ক'রে তারই প্রেমে অন্ধ পুলিশের এক গুপ্তচরের চোখে ধুলো দিয়ে ভারতের মহাবিপ্লবের অগ্নিযজ্ঞে সর্বাঙ্গ দগ্ধ সহকর্মীকে নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করল তারই দুঃসাহসিক কাহিনী এ গল্পের বিষয়বস্তু। নিরঙ্কুশ কল্পনা-সমৃদ্ধিতে লেখকের এই-জাতীয় রোমান্টিক গল্পের সঙ্গে একই সূত্রে গ্রথিত হলেও বিলাসিনীর ছদ্মবেশে সংগ্রামিকার তপস্বিনী মূর্তির পরিকল্পনায় 'আধুনিকা' বিশিষ্টতা পেয়েছে।

'কুম্ভকর্ণ' গল্পটিতে দেশের দরিদ্র অন্ত্যজ জনগণের জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের জর্জ-বিদীর্ণ সমাজ ও নবলব্ধ স্বাধীনতার স্বরূপ নির্ণয়ের চেষ্টা হয়েছে। গল্পটির পরিকল্পনা প্রতীকধর্মী। এর নায়ক শম্ভু হিন্দুসমাজের অচল-অচল অজাত-কুজাতদেরই একজন মাটির তলার মানুষ। জীবনের পাঠশালায় গুরুর হাতে এরা প'ড়ে প'ড়ে মার খায়; কিন্তু কুম্ভকর্ণের নিদ্রা ভেঙে কোনদিনই এদের চৈতন্য আর হয় না। হিন্দু-মুসলমানে যেদিন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধে, সেদিন এদেরই শূদ্রশক্তি উচ্চবর্ণদের ধনপ্রাণ রক্ষার হয় একমাত্র সম্বল, আবার সমাজে শেয়াল-কুকুরের চেয়েও ঘৃণ্য এদের অবস্থার সুযোগ নিয়ে মুসলমান রাজাবাজরা

করে এদের বিভ্রান্ত। কিন্তু অর্থনৈতিক স্বার্থচেতনায় যেদিন বিষ্টু চক্রবর্ত্তী আর সামাদ মিঞা হাত মেলান সেদিন এদের দুঃখের কথা ভাববার কারোই একটু সময় হয় না। পনেরোই আগস্টের স্বাধীনতা-উৎসবে সমাজের উচ্চপাড়ায় সাড়া পড়ে যায়, কিন্তু সেদিনও শম্ভু কুম্ভকর্ণের মতই অঘোরে ঘুমিয়ে আছে। এ ঘুম ভাঙাতে কারোই সাহস নেই, কারণ কুম্ভকর্ণের ঘুম ভাঙলেই খিদের চোটে তোলপাড় ক'রে স্বাধীনতার উৎসবটাই হয়ত মাটি ক'রে দেবে। প্রতীকধর্মী এই গল্পটি গূঢ়ব্যঞ্জনায় লেখকের সমাজ-সচেতনতার উৎকৃষ্ট নিদর্শন বলেই পরিগণিত হবে।

'মন্বন্তর' গল্পে বাংলার পঞ্চাশের মন্বন্তরের পটভূমিকায় আরেকটি প্রতীকদ্যোতনার মধ্য দিয়ে ধনী-দরিদ্রের বৈষম্যটি মর্মস্পর্শী হয়েছে। আলিবাবার গল্পে দস্যুরা পৃথিবীর সব ঐশ্বর্য লুণ্ঠন ক'রে রুদ্ধদ্বার গুহার মধ্যে সঞ্চিত ক'রে রেখেছিল। চিচিং-ফাঁক মন্ত্র যাদের জানা নেই তাদের কাছে সেই ধনভাণ্ডারের দ্বার চিররুদ্ধ। পঞ্চাশের মন্বন্তরে একদিকে লক্ষ লক্ষ লোক না খেতে পেয়ে মরেছে, অন্যদিকে মজুতদার-চোরাকারবারিদের গুপ্তভাণ্ডারে সঞ্চিত হয়েছে সারা বাংলার অন্ন। দরজা খোলার মন্ত্রটি যে হতভাগাদের জানা ছিল না! মন্বন্তরের মহাদুর্দিনে একটি বিলাসী পরিবারের বিবাহোৎসবের মহাসমারোহের বৈপরীত্যে কলিকাতার বুকে ভেঙে-পড়া হাজার হাজার বুভুক্ষু নরনারীর অনাহার-মৃত্যুর শোকাবহ চিত্রটি আরো করুণ হয়ে উঠেছে। কোন্নগরে কনে-দেখা থেকেই গল্পের সূত্রপাত। ভৈরব মাঝির নৌকোয় গঙ্গাবক্ষে কলিকাতা প্রত্যাবর্তনের পথে ঝড়ের মুখে নিজের পুত্রকে গঙ্গায় বিসর্জন দিয়েও বৃদ্ধ মাঝি বাবুদের নিরাপদে ঘাটে পৌঁছে দিল। কৃতজ্ঞতায় বড়-লোকের গৃহিণী দুখানি দশ টাকার নোটই গুঁজে দিলেন তার হাতে, আর জানালেন বিবাহের ভোজের নিমন্ত্রণ। সেই নিমন্ত্রণ রক্ষার্থেই ভৈরব মাঝি এসেছিল কলকাতায়, কিন্তু তখন বুভুক্ষাকাতর জীর্ণদেহে মন্বন্তরের নাভিশ্বাস উঠেছে। বিবাহ-বাড়ির উৎসব-কোলাহলের মধ্যে মা-জননীর কর্ণে মুমূর্ষু ভৈরবের শীর্ণকণ্ঠের ডাক আর পৌঁছল না। রুদ্ধ দ্বারের বাইরে এক মুঠো অন্নের অতৃপ্ত কামনা নিয়ে ফুটপাথের ওপর তার শেষ নিশ্বাস পড়ল। এ গল্পে ধর্মভীরু সরলপ্রাণ ভৈরব মাঝির মৃত্যুবর্ণনার

লেখকের সমবেদনা প্রতিছত্রে অশ্রুসজল হয়ে উঠেছে। মনোজ বসুর প্রথম-দিককার কল্পনাভূমিষ্ঠ রচনার তুলনায় তাঁর সাম্প্রতিক মননশীল গল্পগুলো সব সময় শিল্পাংশে সমান উৎকর্ষ লাভ করতে পারেনা ব'লে নালিশ করা যেতে পারে, কিন্তু 'মন্বন্তর' গল্পটি দুঃখী-মানুষের প্রতি স্রষ্টার অপরিসীম দরদের জন্যই শুধু নয়, সার্থক শিল্পসৃষ্টির দিক দিয়েও একটি অত্যুৎকৃষ্ট রচনা।

৭

অদ্ভুত চরিত্র আর উদ্ভট পরিবেশ-সৃষ্টির নৈপুণ্য প্রকাশিত হয়েছে বিশেষ ভাবে 'অভিভাবক', 'আণ্ডটি চাটুজ্জের ভাই' এবং 'খাজাঞ্চিমশায় ও ভাইঝি'—এই তিনটি গল্পে। 'অভিভাবক' আর 'খাজাঞ্চিমশায় ও ভাইঝি' গল্প দুটি ঈষৎ হালকা চালের, প্রথমটিতে কৌতুকাবহ ঘটনাসংস্থানের জন্যই সরসতার সৃষ্টি হয়েছে, দ্বিতীয়টিতে আছে বিশুদ্ধ রোমান্সের পরিণামরমণীয় ফলশ্রুতি। 'অভিভাবক' গল্পে ট্রেনযাত্রায় সঙ্গিহীনা কলেজছাত্রী প্রীতিলতার স্বয়ংবৃত অভিভাবক অবিনাশের প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব চমৎকারিত্বের সৃষ্টি করেছে। তার হাতের টোপরটিও ঘটনা-সংস্থানকে আরো রহস্যমধুর করে তুলেছে। এমন কি, এই অপরিচিত যুবকটির অদ্ভুত কাণ্ড দেখে প্রীতিলতার নিজের মনেও একসময় একটি অস্ফুট স্বপ্নের দক্ষিণা-হাওয়া দোল দিয়ে গেছে। কিন্তু অবিনাশ স্বয়ং শেষ পর্যন্ত অবিচলিত। তার দশকর্মভাণ্ডারের হাতাবেড়ি-লোহালক্কড় বোঝাই মালপত্র নির্বিঘ্নে পার করার জন্যেই প্রয়োজন হয়েছিল মেয়েটির। নইলে রোমান্টিক হৃদয়দৌর্বল্যের কোনো মর্যাদা তার কাছে নেই। তাই গন্তব্য স্টেশনে পৌঁছে টিকিট-কালেক্টারের নাগালের বাইরে বেরিয়েই দূরে অপেক্ষমান একটি গাড়ি সে স্বচ্ছন্দে প্রীতিলতাকে দেখিয়ে দেয়। রোমান্স ত নয়ই, গায়ে-পড়া আত্মীয়তা করার মনোবৃত্তি থেকেও সে মুক্ত। এই গল্পে শুধু ঘটনা-সংস্থানই নয়, অবিনাশের অ্যান্টি-রোমান্টিক চরিত্রসৃষ্টিতেও লেখকের লিপিকুশলতার পরিচয় পাওয়া যায়।

'খাজাঞ্চিমশায় ও ভাইঝি' গল্পের ফলশ্রুতির কথা পূর্বেই বলা

হয়েছে। কিন্তু এই মধুর পরিসমাপ্তি ছাড়াও জমিদার শ্রীনাথ রায় আর গোপাল খাজাঞ্চির অমায়িক সরলপ্রাণতা গল্পটিতে একটি প্রসন্ন পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। যাত্রাপাগল গোপাল খাজাঞ্চির সর্ববিধ প্রশ্নের একটিমাত্র উত্তর—'যে আজ্ঞে'—শুধু তাঁর মুদ্রাদোষ হয়েই দেখা দেয়নি, এই আত্মভোলা মানুষটির অকপট অন্তরের মর্মস্থল পর্যন্ত উদ্ভাসিত ক'রে দিয়েছে।

কিন্তু অদ্ভুত চরিত্র-পরিকল্পনায় 'আওটি চাটুজ্জের ভাই' বসন্ত চাটুজ্জে বোধ করি সবার সেরা। সাংসারিক কোনো বন্ধনেই এই বাউল মানুষটি বাঁধা পড়ে না। ঘরের বুকে ছককাটা পোষমানা জীবনে সে হাঁপিয়ে ওঠে। তাই বন্ধনহীন নিরুদ্দেশ যাত্রার পথিক সে। 'সকাল বেলা জানা নেই, রাতে কোথায় প'ড়ে থাকতে হবে। হাঁটতে হাঁটতে বালু উত্তীর্ণ হয়ে আসবে-আওাল, জাঙাল ছাড়িয়ে অড়হর-ক্ষেত...কাদের কাছারিবাড়ি...একটা পচা দীঘি, কত পদ্ম ফুটে আছে...আমবন; তারই ছায়ায় দাঁড়িয়ে তাকিয়ে দেখবে—দিগন্ত বিস্তৃত বিল চোখের সামনে। সন্ধ্যায় দাওয়ায় বসে গোপীযন্ত্র বাজিয়ে কে গান গাইছে...যে-বাড়িতে খুশি উঠোনে গিয়ে দাঁড়াও, নতুন মানুষের সঙ্গে পরিচয় কর, ভালবাসাবাসি হোক,...একরাত্রি বেশ কাটল, আবার ভোরবেলা বোঁচকা বগলে বেহালা কাঁধে বেরিয়ে পড়ো.........'। শুধু কবিত্বময় পরিকল্পনার গুণেই নয়, বসন্ত চাটুজ্জের বিচিত্র জীবনকথার সরস পরিবেশনের মধ্য দিয়েই এই অনাসক্ত অথচ রসিক মানুষটি জীবন্ত হয়ে উঠেছে। মনোজ বসু প্রধানত ঘরোয়া জীবনের শিল্পী। এই ঘরছাড়া মানুষের চরিত্রসৃষ্টিতে তাঁর শক্তির আরেকটি দিকের পরিচয় স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

৮

কিন্তু 'মাথুর' গল্পেই মনোজ বসুর সৃষ্টিপ্রতিভার পূর্ণ প্রকাশ। কোনো বিশেষ স্থান বা পরিবেশ এখানে মুখ্য হয়ে ওঠেনি। এ গল্পে বাঙালী জীবনের চিরন্তন রসপ্রবাহের মধ্যেই তিনি অবগাহন করেছেন। বাংলার বৈষ্ণবী-রসধারায় অনুকরণ ক'রে জীবনকে ফুটি

ভাগে ভাগ করা যায়ঃ বৃন্দাবনলীলা আর মথুরালীলা। কৈশোর-স্বপ্নে বৃন্দাবনের কিশোর-কিশোরী-লীলায় অম্লান মধুরতায় মন আবিষ্ট হয়ে থাকে। কিন্তু সংসারের মথুরারাজ্যে প্রবেশ করার পর কৈশোরের রাখালিয়া বাঁশীর সুরটি আর শুনতে পাওয়া যায় না। সংসারাসক্তি-রূপ কুব্জাপ্রেমে বৃন্দাবনের রাইকমলের কথা মনে থাকে না। ভাগবতলীলায় মথুরার শ্রীকৃষ্ণ আর বৃন্দাবনে ফিরে যাননি, কিন্তু রসিক বৈষ্ণব-মহাজনগণের কাব্যে ভাবসম্মিলনের মধ্য দিয়েই বৃন্দাবনের নিত্যলীলার ধারা অব্যাহত রয়েছে। 'মাথুর' গল্পটিতে প্রাকৃত কাহিনীর মধ্য দিয়ে এই রসেরই পরিবেশন। এ গল্পের প্রৌঢ় নায়ক ক্ষেত্রনাথ চাটুজ্জে ঘোর সাংসারী মানুষ। লোকে বলে, বাঘের মুখ থেকে মানুষ ফেরে কিন্তু ক্ষেত্রনাথের কবলে কারো বিষয়-সম্পত্তি একবার প্রবেশ করলে তা ফিরেছে বলে কেউ কোনোদিন শোনেনি। সেই ক্ষেত্রনাথের গ্রাস থেকে পৈত্রিক সম্পত্তি ফিরিয়ে নেবার জন্যে এসেছেন বিধবা জগদ্ধাত্রী। সম্পত্তির মধ্যে পৈত্রিক ভিটা আর একটি কাঠের সিন্দুক। জগদ্ধাত্রীর পিতা সহায়রাম তাঁর সম্পর্কিত-খুল্লতাত দেবীদাস রায়ের নিকট থেকে পেয়েছিলেন এই সিন্দুক। জনশ্রুতি আছে, এ সিন্দুকে সোনা ফলে। কিন্তু লোভী বিষয়ী মানুষ এর অতলস্পর্শী অন্ধকার হাতড়ে পায় কেবল তালপাতার আঁস্তাকুড়! ক্ষেত্রনাথের ভাই কবি উমানাথ কিন্তু জানে, পূর্বগামী মহাজনেরা তাঁদের অতি আদরের যে কথাগুলো উত্তরপুরুষের জন্য যত্ন ক'রে তালপাতার পুঁথিতে গেঁথে রেখে গেছেন, সেই অমূল্য ভাবসম্পদেই পূর্ণ এই সিন্দুকটি। জগদ্ধাত্রীও এই সিন্দুকের দৌলতেই ফিরে পেলেন তাঁর হারানো বৃন্দাবন। ক্ষেত্রনাথ-জগদ্ধাত্রীর জীবনের একটি পূর্বকথা আছে। সেই কিশোর-কিশোরীর স্বপ্ন। বিয়ের কথাও উঠেছিল। তারপর চল্লিশ বৎসরের ব্যবধানে সংসারের কুব্জাপ্রেমে সে স্বপ্ন কোথায় হারিয়ে গিয়েছিল। সম্পত্তির অধিকার নিয়ে কোন্দল করতে বসে ক্ষেত্রনাথ-জগদ্ধাত্রীর জীবনে অকস্মাৎ চল্লিশ বৎসরের ব্যবধান খসে পড়লো, কৈশোরের জগো আর পল্টুদা'র হল পুনরুজ্জীবন। এ গল্পে কোথাও অতিরঞ্জন নেই। অতি শান্ত ও স্বাভাবিক পল্লীপরিবেশে বিষয়াসক্ত মানুষের সংসারের সুখদুঃখের কাহিনী অনাড়ম্বর

প্রাকৃত ভাষায় বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু সমস্ত দুঃখব্যথা, দ্বন্দ্বকোলাহলের অন্তরালে যে রসের ফল্গুপ্রবাহ বাঙালী জীবনকে চিরমধুর ক'রে রেখেছে, 'মাথুর' গল্পে মনোজ বসু বাংলার সেই জীবন-রসেরই পরিবেশন করেছেন। তাই এ গল্পটিকে তাঁর সাহিত্য সাধনার শ্রেষ্ঠ অভিজ্ঞান বলে গ্রহণ করা যেতে পারে।

শুধু 'মাথুর' গল্পেই নয়, মনোজ বসুর সমস্ত রচনায় বাঙালী জীবনের এই বৈশিষ্ট্যটিই ধরা পড়েছে। অতীতের স্বপ্ন মধুরতা, বর্তমানের সংগ্রামশীলতা ও ভবিষ্যতের মঙ্গল চেতনা নিয়ে জীবনের এক রহস্য সুন্দর রূপ তাঁর সাহিত্যে সত্য হয়ে উঠেছে। কথাশিল্পী হয়েও তিনি কল্পনাকুশল কবিচিত্তের অধিকারী, তাই তাঁর শ্রেষ্ঠ গল্পও স্বাদে ও সুরভিতে উৎকৃষ্ট কাব্য।

বঙ্গবাসী কলেজ
আষাঢ় ১৩৩৬

জগদীশ ভট্টাচার্য

রায়রায়ানের দেউল

ক্রোশ-দশেকের ভিতর গ্রাম নাই, দিগন্ত-বিসারী পাকসির বিল। চৈত্র-বৈশাখেও এখানে-সেখানে পানাভরা জল, খানিকটা বা পাঁক— রাত্রে ঐ সব জায়গায় আলেয়া জ্বলে। তখন মানুষ-জন কেহ ওদিকে যায় না, যাইবার উপায় থাকে না। সুপারিকাঠের ছোট ছোট নৌকা ও তালের ডোঙা গ্রামের কিনারে ফাঁকায় পড়িয়া পড়িয়া শুকায়।

বর্ষায় ভরা-বিলের আর এক মূর্তি! শোলা, কলমিলতা ও চেঁচো-ঘাস জাগিয়া ওঠে, ডোঙা ছুটাছুটি করে হাজারে হাজারে। এ অঞ্চলের লোকের হামেশাই কিল্লাবাড়ির গঞ্জে যাইতে হয়। বিল ঘুরিয়া অতদূর যাইতে হাঙ্গামা অনেক। বর্ষার সময়টা সোজা বিল পাড়ি দিয়া যাওয়ার বড় সুবিধা।

গ্রাম ছাড়াইয়া ক্রোশ-দুই আগাইলে দেখিতে পাইবে, অনেক দূরে জলের মধ্যে সবুজ সুউচ্চ দ্বীপের মতো খানিকটা। তার উপর বড় বড় তালের গাছ আকাশ ফুঁড়িয়া দাঁড়াইয়া আছে। আরও আগাইয়া দেখিবে—ঝোপ-জঙ্গল, ঘরের মটবার মতো উঁচু মাটির স্তূপ, মানুষে নাগাল পায় না এমনি অজস্র নলবন বাতাসে বাজিতেছে। সামনে পিছনে ডাহিনে বাঁয়ে সাঁ-সাঁ করিয়া জল কাটিয়া ডোঙা ছুটিতেছে, ঠক-ঠক করিয়া কাঠের উপর লগির আওয়াজ…দ্রুত গমনশীল মানুষে মানুষে পলকের জন্য চোখাচোখি……কদাচিৎ দু-এক টুকরা আলাপন। নিঃশব্দতার অতলে কথার ধ্বনি ডুবাইয়া দেখিতে দেখিতে আরোহীগুলি নলবনের ফাঁকে ফাঁকে বিলুপ্ত হইয়া যায়।

আস্তে ভাই, সামাল—পাথরে ডোঙার তলা ফাঁসবে।

তাইতো বটে! নূতন-কেহ ডোঙা চালাইতে আসিলে এমন জায়গায় পাথর দেখিয়া চমকিয়া ওঠে।

পাহাড় নাকি?

না, রায়রায়ানের দেউল।

বিলের সে দিকটা একেবারে ফাঁকা, একগাছি ঘাসের আগাও নাই।

কিন্তু ভোরের দিকে সেখানে গিয়া পড়িলে আর চোখ ফিরাইবার উপায় থাকে না। সাদা বেগুনি লাল রঙের শাপলাফুলের মধ্যে পথ হারাইয়া বিভ্রান্ত হইয়া যাইতে হয়। জলের মধ্যে বড় বড় পাথরে-খোদা ভাঙা-চোরা কত মূর্তি…ময়ূরে সাপ ধরিয়াছে—ময়ূরের ঠোঁট আছে, পা নাই…পদ্মফুল—পাপড়িগুলি ভাঙিয়া থ্যাবড়া হইয়া গিয়াছে…হাত ও নাক-ভাঙা উড়ন্ত অপ্সরী অল্প অল্প মাথা জাগাইয়া আছে।

আহা-হা, এমন দেউল ভাঙল কে গো ?

রায়রায়ান নিজেই।

এই যে ভাঙা দেউল, এখান হইতে অনেক—অনেক দূরে একটি গ্রাম। সে গ্রামের নাম আজকালকার লোকে বলিতে পারে না। একদিন শেষ-রাতে সুন্দরি-কাঠের ভরা আসিয়া লাগিল সেই গ্রামের ঘাটে। বর্ষার দুর্গম পথ, টিপটিপ বৃষ্টি পড়িতেছে, বাতাস বহিতেছে। সকলে মানা করিল, রাতটুকু নৌকায় কাটাইয়া সকালবেলা বাড়ি যাইও। রামেশ্বর শুনিল না—সাত দিন আজ বাড়ি ছাড়া, ঘরে তরুণী বউ। আর মা-বাপ-মরা ছোট বৈমাত্রেয় ভাইটি। যাবার বেলা বধূর চোখে জল দেখিয়াছিল, অনেক রকম আবদার ছিল তার। নৌকা খুলিয়া দিয়াও সেদিন রামেশ্বর ভাবিতেছিল—কাজ নাই এই কাঠের ব্যবসা করিতে গিয়া, নামিয়া যাই। ভাবনাকুল মনে ছপ-ছপ ছপ-ছপ দাঁড় ফেলিয়া পুরা আটটি দিন ও সাত রাত্রি আগে তারা গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছিল।

পিচ্ছিল পথে আছাড় খাইয়া জল কাদা মাখিয়া অনেক দুঃখে অবশেষে রামেশ্বর বাড়ি আসিল। হঠাৎ চমকাইয়া দিবে এই মতলবে আগে কাহাকেও ডাকিল না, টিপি-টিপি খোড়ো-ঘরের দাওয়ায় উঠিল। সবল দু'টি হাত দিয়া নড়বড়ে দরজায় দিবে এইবার প্রচণ্ড ঝাঁকি। ঘুম উড়িয়া গিয়া ঘরের মধ্যে উঠিবে ভয়ার্ত কোলাহল। তারপর বাহির হইতে পরিচিত উচ্চকণ্ঠের হাসি ফাটিয়া পড়িবে। তারপর দীপ জ্বলিবে। তারপর—

দরজায় ঘা দিতে রামেশ্বর হুমড়ি খাইয়া ঘরের ভিতর পড়িল।

খোলা দরজা। কেহ নাই। বউকে আর কি বলিয়া ডাকিবে, অন্ধকারে ভাইটির নাম ধরিয়া ডাকিতে লাগিল, মধুকর, মধুকর!···

সে রাত্রি কাটিয়া দিন আসিল। এবং মধুকরেরও খোঁজ হইল। জ্ঞাতিসম্পর্কের এক খুড়া তাহাকে বাড়িতে লইয়া রাখিয়াছেন। খোঁজ হইল না কেবল বধূটির, যাবার দিন বড় কান্না কাঁদিয়া যে বিদায় দিয়াছিল। তারপর দু-দিন ধরিয়া গ্রামের মঙ্গলার্থীরা দলের পর দল অফুরন্ত উৎসাহে রামেশ্বরকে সমবেদনা জানাইয়া যাইতে লাগিলেন। বড় অসহ্য হইল। আবার এক রাত্রিশেষে পাঁচ বছরের ভাইটির ঘুম ভাঙাইয়া রামেশ্বর তাহাকে কাঁধে তুলিল, দীর্ঘ লাঠিগাছটি লইয়া তারার অস্পষ্ট আলোকে সাঁকোর উপর দিয়া সে চোরের মতো গ্রাম-নদীটি পার হইয়া গেল। মনের ঘৃণায় দেশ ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

কুড়ি বছর পরে ঘোড়ায় চড়িয়া লোকজন সৈন্যসামন্ত লইয়া ফিরিয়া আসিলেন রায়রায়ান রামেশ্বর। আজমীরের এক বৃদ্ধ সেনানীর বুকে ছুরি মারিয়া ঘোড়াটি কাড়িয়া আনা। নাম তার কুণ্ডল, সে কি ঘোড়া! এক তাল উঁচু, ছুটিবার সময় যেন বাতাসের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলে। এই কুড়ি বছর রামেশ্বর ভাগ্যের সঙ্গে অবিরাম লড়াই করিয়াছেন, কপালের উপর বঙ্কিম বলিরেখায় অবোধ্য অক্ষরে সেই সব দিনের কত কি ভয়ঙ্কর কাহিনী লেখা রহিয়াছে! রায়রায়ান জায়গির লইয়া আসিয়াছেন, সেই জায়গিরের দখল লইয়া প্রথমেই বাধিল ভরত রায়ের সঙ্গে।

ভদ্রার দক্ষিণ পারে খালের মুখে ভরতগড। কিল্লাবাড়ি হইতে ফৌজদারের কামান আনিয়া প্রাকারের ধারে বসানো হইয়াছে। প্রথম দু-দিন খুব তোপ দাগা হইয়াছিল। এখন চুপচাপ। ভরত রায়ের লোক প্রাকারের মুখ কাটিয়া দিয়াছে, গড়ের চারিদিক নদীর জলে কানায় কানায় ভর্তি। ভিতরে কি একটা কাণ্ড চলিয়াছে, কিন্তু বাহির হইতে তাহার একবিন্দু আঁচ পাইবার জো নাই।

সেদিন বড় অন্ধকার রাত্রি। রায়রায়ানের ঘুম নাই। শিবির হইতে খানিকটা দূরে ভদ্রার কূলে আপনার মনে পায়চারি করিতেছেন। হঠাৎ

খস-খস-খস—রায়রায়ানের কান খাড়া হইয়া উঠিল, কেয়া-ঝাড়ের ভিতরে অতিশয় ক্ষীণ যৎসামান্য আওয়াজ। প্রবল জোয়ারের টান—তাহাতে যে ঐ শব্দটুকু না হইতে পারে এমন নয়। রামেশ্বরের তবু সন্দেহ হইল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বিসারিত করিয়া দেখিতে লাগিলেন। দেখিলেন, ঠিক। কেয়া-জঙ্গলের নিবিড় ছায়ার মধ্যে আগাগোড়া আবৃত করিয়া একখানা বজরা অতি চুপি-চুপি উজান ঠেলিয়া যাইতেছে। কাহাকেও ডাকিলেন না, নিজের বিপদের আশঙ্কা মনে হইল না, ঐ দিকে লক্ষ্য রাখিয়া তিনি আগাইতে লাগিলেন। পরিখার মুখে আসিয়া পথ আটকাইল। সেখান হইতে দেখিতে লাগিলেন—চোখ অন্ধকারে জ্বলিতে লাগিল—দেখিলেন, নৌকা নিঃশব্দে গড়ের পিছনে সঙ্কীর্ণ নালার মুখে আসিয়া লাগিল। সঙ্গে সঙ্গেই কয়টি সাদা পুঁটুলি নালায় গড়াইয়া আসিয়া নৌকায় পড়িল, আর চক্ষের পলক ফেলিতে না ফেলিতে নৌকা পাক খাইয়া সুতীব্র জলস্রোতে বিদ্যুতের বেগে অদৃশ্য হইয়া গেল।

রায়রায়ান ছুটিতে ছুটিতে তাঁবুর দিকে ফিরিলেন। খানিকটা দূরে একটি কেওড়া-গুঁড়িতে ঠেশ দিয়া মধুকর মৃদুস্বরে বাঁশী বাজাইতেছিল, বড় মধুর বাঁশী বাজায় সে। দ্রুত পদশব্দে চমকিয়া তাহার হাতের বাঁশী পড়িয়া গেল। নিঃশব্দে মধুকর দাদার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল।

চলো—

কোথায়?

বানায়ের মোহানায়।

বানায়ের মোহানা ক্রোশ পনের-ষোল দূর। গাঙটা সেখানে চারিমুখ হইয়া গিয়াছে। ঐলত রায়ের সঙ্গে দেবগঞ্জার চাকলাদারের সম্প্রীতি খুব বেশি। নৌকা যদি সে দিকে যায় তবে বানাই হইতে ডাইনে মোড় ঘুরিবে। স্থল পথে আগে গিয়া সেখানে ঘাটি দেওয়ার দরকার।

মুহূর্ত মধ্যে আট জন ঢালিসৈন্য প্রস্তুত হইয়া মাঠের প্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইল। অশান্ত কুণ্ডল মাটির উপর খুর দাপাইতে লাগিয়াছে। একক্ষণে রায়রায়ানের মুখে হাসি ফুটিল। ঘোড়ার কাঁধে কশাঘাত

করিয়া বলিলেন, থাম্—থাম্ বেটা, সবুর সয় না বুঝি। আচ্ছা, আমি চললাম আগে আগে, তোমরা এস শিগগির—

মাঠ ভাঙিয়া কুণ্ডল ছুটিল। নদীকূলে ঘোড়া ছাড়িয়া দিয়া রামেশ্বর মোহানার মুখে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। মধুকরেরা পৌঁছিল, তখন কৃষ্ণাদশমীর চাঁদ দেখা দিয়াছে। নিষুপ্ত জেলেপাড়া, ঘাটে অগণিত ডিঙা বাঁধা। এক একটা ডিঙার ছইয়ের মধ্যে সকলে প্রস্তুত হইয়া বসিলেন। রাত্রি শেষ হইয়াছে, ঝাপসা-ঝাপসা জ্যোৎস্না। সেই সময়ে জলের উপর বজরার ছায়ামূর্তি দেখা দিতেই—গুড়ুম।

বজরা হইতেও জবাব আসিল। তীরের উপর গাছে গাছে পাখীরা ব্যস্ত হইয়া কলরব শুরু করিয়াছে। অকস্মাৎ অনেকগুলি কণ্ঠের আর্তনাদ…ঝপ ঝপ শব্দে মাঝ-নদীর জল ছিটকাইয়া উঠিল…বজরা চরকির মতো পাক খাইতে লাগিল। রামেশ্বর তীব্র আনন্দে চিৎকার করিয়া উঠিলেন, হাসিল।

দশটি ডিঙা সকল দিক হইতে বজরা ঘিরিয়া ধরিল। জল রক্তে রাঙা হইয়া গিয়াছে। একটি শবের কাল চুল স্রোতের টানে একবার ভাসিয়া সেই মুহূর্তে অতলে তলাইয়া গেল। মাল্লা ক'জন গলুয়ে পড়িয়া কাতরাইতেছে। মধুকর লাফাইয়া ভিতরে ঢুকিল, ক্ষণপরে বাহির হইল ছোট একটি তোরঙ্গ লইয়া।

সমস্ত এই?

মধুকর বলিল, হাঁ দাদা, তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখেছি—আর কিছু নেই—

এস দিকি।

রামেশ্বরও ঢুকিতে যাইতেছিলেন, ইঙ্গিতে মধুকর নিরস্ত করিল। মৃদুকণ্ঠে বলিল, ওর মধ্যে রয়েছেন ভরত রায়ের স্ত্রী-কন্যা আর গড়ের আরও জন পাঁচ-সাত মেয়েলোক—

বজ্রকণ্ঠে রামেশ্বর বলিলেন, ডাক দেও পুরুষলোক যে আছে—

মধুকর বলিল, পুরুষ কেউ নেই। ভরতের মেজ ছেলে ওঁদের নিয়ে পালাচ্ছিলেন, তিনি ঘায়েল হয়ে ভেসে গেছেন। ভয়ে সকলে এখন মড়ার মতো। আপনি আর যাবেন না ও দিকে।

মুহূর্তকাল ভাবিয়া রায়রায়ান কূলে নামিয়া আসিলেন। একজনকে বলিলেন, খোল তো তোরঙ্গ। দেখি আমাদের ছোট রায় কি নিয়ে এলেন।

ডালা তুলিতেই মণিমুক্তা ঝক-ঝক করিয়া উঠিল। খুশিমুখে মধুকরের পিঠে থাবা দিয়া রামেশ্বর বলিলেন, বেশ, বেশ! এবারে তুমি নিজে রামনগর চলে যাও—তোরঙ্গসুদ্ধ দেওয়ানজির হাতে দাও গিয়ে—গড়ের কাজে টাকার অভাব আর হবে না। আর এঁরা থাকবেন বন্দীশালায়—কোন অসুবিধা না হয়, দেখবে—

মনের আনন্দে রামেশ্বর কুণ্ডলের পিঠে গিয়া বসিলেন।

সেই দিন সন্ধ্যার পূর্বেই রায়রায়ানের গোলায় ভরতগড় ধ্বসিয়া চুরমার হইয়া গেল। সেদিক দিয়া না আসিল কোন প্রতিবাদ, না পাওয়া গেল একটা মানুষের সাড়াশব্দ। অনেক কষ্টে পরিখা পার হইয়া সৈন্যেরা গড়ে ঢুকিয়া দেখে, যা ভাবা গিয়াছিল তা-ই—সকলে পলাইয়াছে, জিনিষপত্র কিছুই পড়িয়া নাই, বারুদখানায় পয়ঃপ্রণালী খুলিয়া খালের জল তোলা হইয়াছে, গড়ের শূন্য কক্ষগুলি খা-খা করিতেছে।

বিজয়োল্লাসে রামেশ্বর রামনগর ফিরিয়া চলিলেন।

নিজ নামে নগরের পত্তন মাত্র হইয়াছে, যুদ্ধ-বিগ্রহের মধ্যে কাজ বড় বেশি অগ্রসর হইতে পায় নাই। অসমাপ্ত চত্বরের প্রান্তে অতি-প্রাচীন একটা বকুল গাছ। শ্রান্ত রামেশ্বর অপরাহ্ন বেলায় প্রাসাদকক্ষ হইতে নবনির্মিত নগরীর দিকে অলস দৃষ্টিতে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছিলেন, অকস্মাৎ চমকিয়া উঠিলেন। দেখিলেন, চত্বরের প্রান্তে বকুলের ছায়াচ্ছন্ন তলদেশে অপ্সরীর মতো লঘুগামিনী বড় রূপসী একটি মেয়ে। মধুকর কি কাজে সেইখানে আসিয়াছিল, রায়রায়ান জিজ্ঞাসা করিলেন, কে ও-টি?

ভরত রায়ের মেয়ে।

রামেশ্বর ভাইয়ের দিকে তাকাইলেন, মুখের উপর দিয়া কৌতুক-হাস্য মৃদু খেলিয়া গেল। বলিলেন, বন্দীশালায় বন্দীদের রাখবার নিয়ম। এ কি করেছ?

কিন্তু নিয়ম হইলেও এ ছাড়া যে অন্য উপায় ছিল না, মধুকর প্রাণপণে তাহা বুঝাইতে লাগিল। কারণ, বন্দীশালাটা ঠিক নিরাপদ নয়...তা ছাড়া সেখানে থাকার অসংখ্য অসুবিধা—এমন অসুবিধা যে রাখাই চলে না...

রামেশ্বর তবু মৃদু হাসিতেছেন দেখিয়া আরও বিব্রত ভাবে মধুকর বলিল, আপনি দেখেন নি তাই। দেখতেন যদি—সে যে কি ভয়ানক কান্নাকাটি—

কান্নাকাটি? খুব ভয়ানক? রামেশ্বর সহসা সোজা হইয়া বসিলেন, মুখের কৌতুক-হাস্য নিভিল, চোখ জল-জল করিয়া উঠিল। ম্লান অপরাহ্ণ-আলোয় রহস্যাচ্ছন্ন অর্ধসমাপ্ত বিস্তীর্ণ নগরী...পশ্চিমে মাঠের প্রান্তে রক্তিম আভা বিলের জলে ডগমগ করিতেছে...দূরে, আরও দূরে সীমাহীন নিবিড় অরণ্যশ্রেণী। বিশ বছর আগেকার একটি গরিব খোড়ো-ঘর অকস্মাৎ রায়রায়ানের চোখের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিল। ঘরের মধ্যে বিদায়-যাত্রার আয়োজন, কথা নাই—নির্বাক বিদায়-চিত্র। ঘাটে সুন্দরি-কাঠ আনিবার নৌকা প্রস্তুত হইয়া ডাকাডাকি করিতেছে, ঘরের মধ্যে একটি কথা নাই, চোখ ভরিয়া গৌর গাল দু'টি বাহিয়া জল আসে, মুছাইয়া দিলে তখনই আবার ভরা-চোখ...অফুরন্ত, বাধা দিয়া ঠেকাইবার জো নাই।...সহসা হা-হা-হা করিয়া যেন স্বপ্ন ভাঙিয়া রায়রায়ান হাসিয়া উঠিলেন। হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভরত রায়ের মেয়েটা দেখতে কেমন মধুকর?

মুখ লাল করিয়া অন্য দিকে চাহিয়া মধুকর কোন প্রকারে জবাব দিল, ভাল।

তাড়াতাড়ি সে বাহির হইয়া গেল। ভাইয়ের গমন-পথের দিকে গভীর স্নেহে তাকাইয়া রায়রায়ান মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন। কিশোর বয়সের ইহাদের এই পাগলামি বড় মিঠা লাগে। মধুকর চলিয়া গেলেও অনেকক্ষণ হাসি পাইতে লাগিল।

প্রাঙ্গণের কাছাকাছি একদিন মেয়েটার সঙ্গে মুখোমুখি দেখা হইয়া গেল। সে একাকী দিক্‌প্রান্তে একাগ্র চোখে তাকাইয়া ছিল।

তুমি কে ?

গম্ভীর কণ্ঠে মুখ ফিরাইয়া থতমত খাইয়া মেয়েটি বলিল, আমার নাম মঞ্জরী।

রায়রায়ান বলিলেন, তুমি তো ভরত রায়ের মেয়ে। শুনেছ বোধ হয়, তোমাদের গড়ের ভিতর অবধি খুঁজে এসেছি। কিন্তু অদৃষ্ট খারাপ, রায় মশায়ের দেখা পাই নি। বলতে পার, তিনি কোথায় ?

আত্মগৌরবে রামেশ্বর যেন ফাটিয়া পড়িতে লাগিলেন। বলিলেন, চুপ করে চোখ নিচু করে রইলে যে বড়! জবাব দাও। গরজ আমারই। বীরবরের ঠিকানাটা পেলে তোমাদের বোঝা নামিয়ে অব্যাহতি পাই। ভয় নেই গো—আমরা কেউ যাচ্ছি না। খালি তোমাদের পালকি করে পাঠাব।

নিষ্ঠুর বিদ্রূপে মঞ্জরীর চোখ জ্বালা করিয়া জল আসিল। সুন্দরীর চোখের জল বড় পরিতৃপ্তির সঙ্গে রায়রায়ান উপভোগ করিতে লাগিলেন। বলিলেন, রাগ কোরো না। ভাগ্যে আমাদের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল, না হলে কোথায় আশ্রয় পেতে বল দিকি ?

চন্দ্রার জলে।

কুমারী মুখ তুলিল। অশ্রুহীন চোখ যেন জ্বলিতেছে। বলিতে লাগিল, চন্দ্রার জলে আশ্রয় হত রায়রায়ান,—সে হত ভাল আশ্রয়। আগে তো বুঝতে পারি নি যে আপনি—

রামেশ্বর দীর্ঘকাল ধরিয়া হাসিতে লাগিলেন। ব্যঙ্গের সুরে বলিলেন, কিছুই বুঝতে পার নি ? দেওড় শুনে কি ভাবলে বল তো ? ভাবলে, শ্বশুরবাড়ি থেকে ঘোড়া-পালকি নিয়ে মানুষ এসেছে, পটকা ছুঁড়ছে—না ?

মঞ্জরী বলিল, ভেবেছিলাম—জোলো ডাকাত। ঘুণাক্ষরে আপনাকে সন্দেহ হয় নি। তারপর চোখ মুছিয়া দৃপ্তকণ্ঠে কহিতে লাগিল, রায়রায়ান আপনার সমস্ত খবর দেশের লোকে জানে। চিরকাল আপনাকে একঘরে হয়ে থাকতে হবে—ভেবেছেন কি ! মিছামিছি এত জাঁক করে এই সব গড় করছেন। আপনার ঐ গড়খাইয়ের জলে ডুবে মরা উচিত—

মেয়েটির দুঃসাহসে রায়রায়ান স্তম্ভিত হইলেন। কিন্তু তুচ্ছতম প্রতিপক্ষের সামনে হঠাৎ রাগ দেখাইবার ব্যক্তি তিনি নহেন। বরঞ্চ আঘাত যে যথাস্থানে গিয়া বাজিয়াছে, তাহাতে বড় আনন্দ হইল। সহাস্য নেত্রে তেমনি চাহিয়া বলিলেন, বটে!

মঞ্জরী বলিতে লাগিল, এই জায়গির কেমন করে আপনি নিয়ে এসেছেন, লোকে সমস্ত জানে। চাকলাদারেরা আপনাকে ঘৃণা করে, তারা কোনও দিন আপনাকে দলে নেবে না। তারা সব চাকলা গড়েছে গায়ের জোরে, আমির-ওমরাহের ঘরে মেয়েলোক ভেট পাঠিয়ে নয়।

ভাল, ভাল—বলিয়া মৃদু হাসিয়া নির্লিপ্তভাবে রামেশ্বর ফিরিয়া চলিলেন। কয়েক পা গিয়া মুখ ফিরাইয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, সুন্দরী, তোমাকেও তবে একটা সু-খবর দিয়ে যাই। আমির-ওমরাহ্‌দের ঘরে তুমিও যাবে, দুঃখ নেই। আমি কোন পক্ষপাত করি নে।

অবনতমুখী পাষাণ প্রতিমার ন্যায় মঞ্জরী শুনিতে লাগিলেন। রামেশ্বর বলিতে লাগিলেন, সুখে থাকবে। বুঝলে? আগামী বুধবার যেতে হবে—প্রস্তুত থেকো।

কিন্তু ঐ মুখের কথাই। বুধবার তারপর দু-তিনটা কাটিয়া গেল, কিন্তু কোথায় বা রামেশ্বর, আর কোথায় তাহার সেই যাওয়ার আয়োজন।... মানুষ ও পশু পাশাপাশি খাটিয়া দিনের পর দিন নগর গড়িয়া তুলিতেছে। বড় বড় নৌকায় দেশ-বিদেশের কাঠ পাথর আসিয়া জড় হইতেছে—সেই পাথর ভাঙার শব্দ, করাতে কাঠ চিরিবার শব্দ।...আজ কোথায় নতুন একটা স্তম্ভ উঠিতেছে, এই কোনদিকে কি একটা ধসিয়া পড়িল, লোকজন কাতারে কাতারে ছুটিতেছে—তাড়া খাইয়া আবার উল্টা দিকে ছুটিতে লাগিল। দীর্ঘ দিন কোন্ দিক দিয়া কাটিয়া সন্ধ্যা হইয়া যায়, রাত্রির অন্ধকার গভীর হইতে গভীরতর হয়, তখন শত শত কামারশালায় জলন্ত হাপরের পাশে হাতুড়ির ঘায়ে লোহার উপর আগুনের ফুলকি উড়িতে থাকে, হাতুড়ি বাজে ঠং-ঠং-ঠং—

দেওয়ান জীবনলালের উপর জায়গির ও গড় তৈরির সমস্ত ভার। তাঁর তিলার্ধ বিশ্রাম নাই। জায়গিরের বিধিব্যবস্থা তবু কতক কতক হইয়াছে, কিন্তু গড়ের কাজ কবে যে মিটিবে, সে এক বিশ্বকর্মা ছাড়া কেহ বলিতে পারে না। রাত্রে শুইয়া জীবনলালের মাথায় নূতন নূতন মতলব জাগে। পরিখা খোঁড়া হইয়াছে—তার ওদিকে উঠিবে আকাশভেদী প্রাচীর, চারিদিকে চারিটি সিংদরজা, দুর্গদ্বার হইতে চারিটি রাস্তা সোজা সিংদরজা ফুঁড়িয়া পরিখার সেতুর উপর পৌঁছিবে। গভীর রাত্রি পর্যন্ত ভাবিয়া ভাবিয়া জীবনলাল মতলব খাড়া করেন, দিনের কাজকর্মের শেষে প্রসন্ন চোখে তাকাইয়া তাকাইয়া দেখেন, সুন্দর সুবৃহৎ রাজধানী আকাশের নিচে ধীরে ধীরে মাথা তুলিয়া উঠিতেছে।

নগরে ফিরিয়া ক'দিন অল্প কিছু বিশ্রাম লইয়া রায়রায়ানও এই-সব কাজের মধ্যে একেবারে ডুবিয়া গেছেন। খুব ভোরবেলা ঘড়াং করিয়া দরজা খুলিবার মুখে এক একদিন একটু-আধটু তাঁহার গলার আওয়াজ পাওয়া যায়। বন্দিনীদের পাঠাইয়া দিবার এখনও কোন উপায় হয় নাই। মধুকর তাঁহাদের তদারক করে, সমস্ত দিন সে প্রায় এই-সব লইয়া থাকে। তারপর গভীর রাত্রে সকলে শুইয়া পড়িলে অনেকক্ষণ অবধি নির্জন অলিন্দে বসিয়া আপন মনে বাঁশী বাজায়। সে সময়ে ঘুম-ভাঙা শয্যায় রামেশ্বরেরও এক একদিন মনে হয়, তাঁহার বড় যত্নে বড় কঠিন শ্রমে গড়া নগরীর উপর মধুকরের বাঁশী নিষুপ্ত রাত্রে মাঠের দিগন্ত হইতে স্বপ্ন-কুহকিনীদের ডাকিয়া আনিতেছে।

একদিন নির্জনে রামেশ্বর হঠাৎ আসিয়া মঞ্জরীর সামনে দাঁড়াইলেন। শোন—

সপ্রশ্নদৃষ্টিতে মঞ্জরী চাহিল। এক মুহূর্ত থামিয়া রামেশ্বর বলিতে লাগিলেন, সেদিন আমার সম্বন্ধে তুমি মিথ্যা অভিযোগ করছিলে। ও সব শত্রুদের রটনা।

এ কয়দিনে মঞ্জরী অনেক বুঝিয়াছে, চোখের জল একেবারে মুছিয়া ফেলিয়াছে। কৌতুক-চঞ্চল চোখ দু'টি নাচাইয়া সে চলিয়া যাইতেছিল। বাধা দিয়া রামেশ্বর বলিয়া উঠিলেন, বিশ্বাস করলে কি-না, বলে যাও—

মঞ্জরী কহিল, এ সাফাই-এর দরকার কি রায়রায়ান? আমি তো আপনার বিচারক নই—

রায়রায়ান বলিলেন, তুমি আমায় বিয়ে কর।

খিল-খিল করিয়া মঞ্জরী হাসিয়া উঠিল। অনেকক্ষণ চাপিয়া ছিল, আর পারিল না।

ক্রুদ্ধ হইয়া রামেশ্বর বলিলেন, তোমাকে আজই দিল্লি পাঠাতে পারি—জান? আর তার অর্থ কি, তা-ও বোধ হয় বোঝাতে হবে না।

পারেন তা? বলিয়া চোখে মুখে হাসির দীপ্তি তুলিয়া তাঁহাকে নিতান্ত অগ্রাহ্য করিয়া প্রগল্‌ভা তরুণী চলিয়া গেল।

ইহার পর প্রায়ই দেখা হইতে লাগিল। দেখিলেই মঞ্জরী হাসিয়া পলাইত। একদিন রামেশ্বর তাহার হাত ধরিয়া ফেলিলেন। তখনই ছাড়িয়া দিয়া বলিলেন, জোর করবার শক্তি আছে মঞ্জরী, কিন্তু মন তা চায় না। বলিতে বলিতে গলার স্বর ভারি হইয়া উঠিল, এ যেন সে লোক নয়—সজলকণ্ঠে রামেশ্বর বলিলেন, আমার জীবনের খবর তুমি জান না কিন্তু আর এই যুদ্ধবিগ্রহ ভাল লাগে না, এখন শান্তিতে একটুখানি মাথা গুঁজে থাকতে চাই।

মঞ্জরী শান্তভাবে শুনিতে লাগিল, পলাইবার চেষ্টা করিল না। রায়রায়ান বিশ বছরের কাহিনী বলিয়া চলিলেন। সমস্ত বলিয়া গভীর নিশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিলেন। ধীরে ধীরে মঞ্জরী চলিয়া গেল।

বিকালবেলা মঞ্জরী একখানা আয়না পাঠাইয়া দিল। সেই সঙ্গে ছোট্ট একটু চিঠি—

> তারপরে যে বিশ বৎসর কেটে গেছে, রায়রায়ান! যুদ্ধবিগ্রহে ব্যস্ত ছিলেন, সম্ভবত আয়নায় চেহারা দেখবার ফুরসৎ হয় নি। তাই একটা আয়না পাঠিয়ে দিলাম।

চিঠি পড়িয়া রামেশ্বর অনেকক্ষণ গুম হইয়া রহিলেন। ভ্রূকুটি-ভীষণ মুখে শুধু বলিলেন, আচ্ছা!

ভরতগড়ের রাণীর কানে পৌঁছিল, তাঁর দুরন্ত মেয়ে রায়রায়ানের সঙ্গে একটা কাণ্ড করিয়া বসিয়াছে। এবারে রায়রায়ানের প্রতিহিংসা। ইহা যে কি বস্তু—রামেশ্বর অল্প দিন দেশে আসিয়াছেন, তবু চাকলাদারের

ঘরের শিশুটি অবধি তাহা বুঝিয়া ফেলিয়াছে। সকলের আহার-নিদ্রা বন্ধ হইল। কিন্তু যাহাকে লইয়া এত বড় ব্যাপার, সে দিন-রাত দিব্য হাসিয়া খেলিয়া বেড়াইতে লাগিল।

ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া সেই চিঠি শতকুটি করিয়া ফেলিয়াও রায়রায়ানের রাগ মিটে না। তারপর এক সময়ে সত্যসত্যই তিনি আয়না দেখিতে বসিলেন। কুড়ি বছর ভাগ্যের সঙ্গে নিদারুণ লড়াই হইয়াছে, সর্বাঙ্গে তার প্রতিটি আঘাতের চিহ্ন। সমস্ত মাথার মধ্যে একটি কালো চুল নাই, মুখের উপর যে ছায়া পড়িয়াছে তাহা দেখিয়া নিজেরই প্রাণ আতঙ্কে কাঁপিয়া ওঠে—এ তরুণী ব্যঙ্গ করিবে ছাড়া আর কি? বিশ বছর আগে বেদনাবিদ্ধ যে যুবক গৃহত্যাগ করিয়াছিল, তাহার একবিন্দু চেহারা আর খুঁজিয়া পাইবার উপায় নাই। সাদাচুলের রাশি দুই হাতে ঢাকিয়া ধরিয়া আয়নার সম্মুখে বসিয়া রামেশ্বর সেই-সব দিনের কথা ভাবিতে লাগিলেন।

অকস্মাৎ সমস্ত রামনগর চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। পথে দু-জন লোক একত্র হইলেই একটিমাত্র কথা। একজন সান্ত্রীকে হীরার আংটি বকশিশ দিয়া ভরতগড়ের বাণী বৃত্তান্ত শুনিলেন। শুনিয়া বুকের রক্তে ফুল রাঙাইয়া শ্মশানকালীর পূজার জন্য গোপনে পাঠাইয়া দিলেন। ভরত রায় অগ্রবর্তী, সঙ্গে আরও চারি জন চাকলাদার—সকলে মিলিয়া রামনগর ধ্বংস করিতে আসিতেছেন। সৈন্য আসিয়া দুই ক্রোশের মধ্যে ঘাঁটি দিয়া বসিয়াছে।

অলিন্দে সেদিন আর মধুকরের বাঁশী বাজিতেছে না, সেইখানে শুভ্রযন্ত্রণা বসিয়াছে। মধুকর শত্রু-শিবির আক্রমণ করিতে চায়। কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি, আকাশে চাঁদ উঠে নাই। মধুকর জেদ ধরিয়াছে—এই আঁধারে আঁধারে নিঃসাড়ে দলবল লইয়া শত্রুশিবিরে ঝাঁপাইয়া পড়িবে।

রামেশ্বর মাথা নাড়িলেন। অসম্ভব, একেবারে অলৌকিক কথা। পাঁচ চাকলাদারের সমগ্র শক্তি সমবেত হইয়াছে, তার সামনে রায়রায়ানের নব-নিযুক্ত ঢালির দল কয়টি বানের মুখে কুটার মতো ভাসিয়া চলিয়া যাইবে।

পদশব্দ।···কে? এতক্ষণে দেওয়ান জীবনলাল আসিয়া পৌছিয়াছেন। জীবনলাল দৌত্যে গিয়াছিলেন, হাপাইতে হাপাইতে আসিয়া খবর বলিতে লাগিলেন, দেবগঙ্গার চাকলাদার বলিয়া পাঠাইয়াছেন, সকলের আগে ভরত রায়ের পুরমহিলাদের সসম্মানে পাঠাইয়া দিতে হইবে। তাঁরা গিয়া যদি বলেন, কোন দুর্ব্যবহার হয় নাই, সন্ধির বিবেচনা তারপর—

মধুকর লাফাইয়া উঠিল, কাজ নেই দাদা, ওঁদের পাঠানো হবে না। আমি সর্দারদের ডাকি।

কিন্তু ইহা কাজের কথা নয়। রামেশ্বর ভাইকে শান্ত করিয়া বসাইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, দেওয়ানজি, গড়ের বাকি কত?

জীবনলাল বলিল, শেষ হতে অন্তত আরও ছ-মাস। তখন পাঁচটা কেন পঞ্চাশটা চাকলাদার এলেও পিছু হটব না। কিন্তু এখন যা বলে, মেনে নিতে হবে।

মধুকর গর্জিয়া উঠিল, এই অপমান?

উপায় নেই। বলিয়া জীবনলাল ম্লান হাসিল। বলিল, চোখের সামনে এই-সব ভেঙে ছারখার করবে—আমি বেঁচে থেকে দেখতে পারব না রায়রায়ান।

মধুকর খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, বেশ। কিন্তু হাঙ্গামার মধ্যে যাবার আগে গড়ের বন্দোবস্ত শেষ করে ফেলা উচিত ছিল না কি? ওরা আসবে—এ তো জানা কথা।

এবার রামেশ্বর কথা কহিলেন। বলিলেন, জানা কথা কি বলছ মধুকর, এ স্বপ্নেও ভাবা যায় নি। চাকলাদারেরা চিরদিন নিজেদের মধ্যে লাঠালাঠি করে আসছে। আজকেই কেবল এক হল। এরা মতলব করেছে, স্বরে বাংলায় আর নতুন জায়গিরদার ঢুকতে দেবে না।

জীবনলাল কহিল, আর ভরত রায়ও নানা মিথ্যে রটনা করেছে। স্ত্রী কন্যা বেইজ্জত হয়েছে বলে সকলের কাছে কেঁদে কেঁদে বেড়িয়েছে।

মধুকর শেষ প্রস্তাব করিল, তবে আমরা পালাই। ভরতকে জব্দ করব। মেয়েদের নিয়ে ঢাকার দিকে চলে যাই।

জীবনলালের তাহাতেও মহা আপত্তি। বলিল, সে হয় না। তাঁ

হলে মানুষ না পেয়ে আক্রোশ পড়বে রামনগরের উপর। সমস্ত শ্মশান হয়ে যাবে। এবারে সন্ধি হোক। আমি কথা দিচ্ছি ছোট রায়, ছ-মাস পরে দশগুণ শোধ তুলব।

আরও অনেকক্ষণ ধরিয়া অনেক জল্পনার পর রামেশ্বর সকালবেলায় শিবিকার ব্যবস্থা করিতে হুকুম দিলেন।

চত্বরের প্রান্তে বহুপ্রাচীন শাখাবহুল সেই বকুলগাছ—ফুল ঝরিয়া ঝরিয়া বাতাসকে গন্ধমন্থর করিতেছে। তাহারই ছায়াতলে দাঁড়াইয়া রায়রায়ান নিঃশব্দে বিদায়যাত্রা দেখিতেছিলেন। সবুজ কিংখাবে মোড়া হাঙর-মুখো মাঝেব ঝালরদার শিবিকাখানি—ঐটি মঞ্জরীর। রামেশ্বর একাকী দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতেছিলেন, হঠাৎ নূপুরের শব্দে পিছনে তাকাইলেন। মঞ্জরী রূপে অলঙ্কারে বেশের পারিপাট্যে ঝলমল করিয়া আসিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইল।

রায়রায়ানের মুখ কালিবর্ণ হইয়া গেল। ইহারা আজ বিজয়ী, তরুণীর মুখে-চোখে সেই অহঙ্কার যেন ফুটিয়া পড়িতেছে। মৃদুস্বরে মঞ্জরী বলিল, যাচ্ছি—

রামেশ্বর অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া রহিলেন। মঞ্জরী বলিতে লাগিল, আপনাদের যত্নে বড় সুখে ছিলাম। আপনাদের আতিথ্যের কথা বাবাকে বলব।

স্বরটা রায়রায়ানের কাছে ব্যঙ্গের মতো ঠেকিল। রূঢ় স্বরে জবাব দিলেন, বেশ, বোলো—একটা কথাও বাদ দিও না। একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল। বলিতে লাগিলেন আমার ইচ্ছে হচ্ছে কি—ডিঙায় করে তোমাদের ভদ্রার মাঝখানে নিয়ে গিয়ে দিই তলা ফুটো করে। ছটফট করে ডুবে মর। কিন্তু সে তো হবার জো নেই মধুকর আর জীবনলালের জ্বালায়—

সহসা মুখ ফিরাইয়া দেখিলেন, হয়তো বুঝিবার ভুল হইয়াছে—মঞ্জরী দু'টি আয়ত চোখের গভীর দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিয়া আছে। চোখের কোণে অশ্রু টলমল করিতেছে। ঝর-ঝর করিয়া সেই অশ্রু গণ্ড বহিয়া ঝরিতে লাগিল। রামেশ্বর সেইদিকে চাহিয়া ক্ষণকাল

চুপ করিয়া রহিলেন। তারপর ম্লান হাসিয়া বলিলেন, তুমি গিয়ে স্বচ্ছন্দে সব কথা বলতে পার। এই-সব অট্টালিকা জায়গির স্বপ্নের মতো এসেছে—আবার যদি চলে যায়, আমার কিছু ক্ষতি হবে না।

রাজকন্যা তাড়াতাড়ি হেঁট হইয়া রায়রায়ানের পদধূলি লইল। বলিল, আমি সমস্ত শুনেছি। এই রাজ্যপাট আপনার বীরত্বের ইনাম। ইচ্ছে হলে এর চতুর্গুণ এখনই আজকেই আবার আপনি তৈরি করতে পারেন।

রামেশ্বর ম্লান হাসিয়া মাথার পলিত কেশের উপর হাত বুলাইতে লাগিলেন। বলিলেন, আর পারি নে। কুড়ি বছর পরে আয়নায় দেখলাম, সত্যিই বুড়ো হয়েছি। দেহে বল নেই। এখন এ-সব শেষ করে গরিবের ছেলে হয়ে আবার খোড়ো-ঘরে যেতে ইচ্ছে হয়। তোমায় আমি দিল্লি পাঠাচ্ছিলাম, আরও কত অত্যাচার হয়েছে হয়তো—আমার সমস্ত অপরাধ তোমার বাবাকে বোলো মঞ্জরী—

মঞ্জরী দৃঢ়কণ্ঠে বলিল, মিথ্যা বলব কেন?

রামেশ্বর অবাক হইয়া চাহিলেন। মঞ্জরী বলিতে লাগিল, দিল্লিতে কখনও আপনি পাঠাতেন না, সে আমি জানি। আপনার মনের কথা সমস্ত জানি আমি। যাবার বেলা তাই প্রণাম করতে এলাম।

বলিতে বলিতে সে থামিল। মুখের উপর এক ঝলক রক্ত নামিয়া আসিল। জোর করিয়া সঙ্কোচ কাটাইয়া বলিতে লাগিল, বাবা এবার অনেক আয়োজন করে এসেছেন, আমি না গেলে অনর্থ হবে। আমি তাই ফিরে যাচ্ছি। আপনার রাজধানী গড় নাওয়ারা—সমস্ত ব্যবস্থা ঠিক করে আমাকে নিয়ে আসবেন। তাই বলতে এলাম।

নিয়ে আসব? সম্মোহিত দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া রামেশ্বর ধীরে ধীরে মাথা নাড়িতে লাগিলেন। বলিলেন, তুমি কি সত্যি কথা বলছ? আমি বুড়ো হয়ে গেছি, মন বড় দুর্বল মঞ্জরী—

মঞ্জরী রায়রায়ানের দুই পায়ের মধ্যে মাথা গুঁজিয়া চুপ করিয়া রহিল। অশক্ত বৃদ্ধ নয়—রণশ্রান্ত মহাবিজয়ী বীর তার সম্মুখে। অনেকক্ষণ পরে মাথা তুলিয়া অশ্রুভরা চোখে কুমারী হাসিল—ম্লান কিন্তু বড় মধুর হাসি। বলিল, নিয়ে আসবেন। জন্মাষ্টমীর রাত্রে আমরা

প্রতি বছর গড়ের বাইরে শ্যামসুন্দরের মন্দিরে যাই। সঙ্গে জন-পঞ্চাশ মাত্র রক্ষী থাকে। এখনও তার ছ-সাত মাস দেরি। আপনি এর মধ্যে গড় শেষ করুন। কুণ্ডলকে নিয়ে যাবেন। আমি ভদ্রার কূলে কৃষ্ণচূড়ার তলায় অপেক্ষা করব—আপনি আর আপনার কুণ্ডল আমাকে উদ্ধার করবেন।

ঝুনঝুন নূপুর বাজাইয়া মঞ্জরী ধীরে ধীরে শিবিকায় গিয়া বসিল।

গড়ের কাজে পরদিন হইতে চতুর্গুণ লোক লাগানো হইল। পুরীর সামান্য কর্মচারীটি পর্যন্ত বুঝিয়াছে, রায়রায়ান প্রতিহিংসার জন্য অধীর হইয়া উঠিয়াছেন। জীবনলাল মহিলাদের পৌঁছাইয়া দিতে গিয়াছিল, ফিরিতে রাত হইল। তারপর গভীর রাত্রে আগের দিনের মতো আবার গুপ্ত পরামর্শ। চাকলাদারেরা সসৈন্যে ফিরিয়া যাইতে রাজি হইয়াছেন, কিন্তু ভূষণার মধ্যে রামেশ্বরকে এই নূতন গড় গড়িতে দেওয়া হইবে না।

জীবনলালের পরামর্শ, ইসলামাবাদের দিকে গিয়া ফিরিঙ্গিদের শরণ লওয়া। সেখানে জায়গিরের বিলিব্যবস্থা করিতে বেগ পাইতে হয় না। বাদশাহের নিকট হইতে একটি নূতন ফর্মান আনিবার অপেক্ষা মাত্র। কিন্তু রামেশ্বর ঘাড় নাড়িলেন। আর তাঁহার নূতন করিয়া ভাগ্য খুঁজিবার উৎসাহ নাই।

একদিন রামেশ্বর কিল্লাবাড়িতে ফৌজদারের সঙ্গে পরামর্শ করিতে গেলেন। তারপর অনেকদিন ধরিয়া এই পরামর্শ চলিল। জীবনলাল ইতিমধ্যে ইসলামাবাদের দিকে চলিয়া গিয়াছে। গড়ের সমস্ত কাজকর্ম বন্ধ। অর্ধসমাপ্ত পরিখা-ঘেরা নগর শ্মশানের মতো খাঁ-খাঁ করিতেছে।

পাকসির বিল ইদানীং মজিয়া গিয়াছে, চৈত্র-বৈশাখে প্রায় শুকাইয়া আসে। তখন দিগন্তব্যাপ্ত নিবিড়কৃষ্ণ অবিচ্ছিন্ন জলধারা ক্রোশের পর ক্রোশ তরঙ্গিত হইত। বড় শুকনার সময়ে গোটা বিশ-পঁচিশ চর মাত্র সীমাহারা বারিসমুদ্রের মাঝখানে অসহায়ের মতো মাথা উঁচু করিয়া থাকিত। বিলের কিনারা দিয়া কিল্লাবাড়ি যাইবার পথ। মাসাবধি পরে কুণ্ডলের পিঠে চড়িয়া একদিন রামেশ্বর ফিরিয়া

আসিতেছিলেন। কৌশলায় শেষ পর্যন্ত কোন সুবিধাই করিতে পারিলেন না। ফিরিবার পথে বিলের প্রান্তে আসিয়া বিদ্যুৎচমকের মতো একটি সঙ্কল্প হঠাৎ রামেশ্বরের মনে জাগিয়া উঠিল।

রামনগরবাসী এবং চাকলাদার মহলে রাষ্ট্র হইয়া গেল, পরাজিত অবমানিত রায়রায়ান মনোকষ্টে বিবাগী হইতে বসিয়াছেন, দিবারাত্রি অন্তঃপুরের মধ্যে শ্যামসুন্দরের উপাসনায় তিনি মাতিয়া থাকেন। তারপর অনেক দিন পরে একদিন কুণ্ডলের পিঠে রায়রায়ান বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সহস্র প্রজা সমবেত হইয়াছে।

জীবনলালও সেইদিন ফিরিয়াছে। সে চুপি-চুপি বলিল, এ সবে কাজ নেই প্রভু, ইসলামাবাদ চলুন—

পর্টুগিজদের সঙ্গে শর্ত হইয়া গিয়াছে, ইসলামাবাদে রাজ্য-পত্তন করিতে আর গোল নাই। সেখান হইতে রাজ্য ক্রমশ বিস্তৃত হইয়া একদিন ভূষণাকেও গ্রাস করিবে, জীবনলাল সেই স্বপ্নে মাতোয়ারা।

কিন্তু রামেশ্বর রাজি নহেন। নিরন্ন সর্বস্বহারা হইয়া পথে পথে ঘুরিতে হইয়াছে, বিনিদ্র কত রাত্রি অজানা প্রান্তরের মধ্যে অশ্বপৃষ্ঠে কাটিয়াছে, দিন মাস বৎসরগুলি দেহের উপর পদাঙ্ক আঁকিয়া রাখিয়া দ্রুত পলাইয়া গিয়াছে। জীবনের শেষপ্রান্তে আসিয়া নূতন করিয়া তিনি আর সংগ্রামে মাতিবেন না। হাসিয়া বলিলেন, জীবনলাল, ইসলামাবাদে তুমি রাজ্য কর। আমি ফর্মান এনে দেব।

জীবনলাল জিভ কাটিয়া বলিল, প্রভু, আমার কাজ রাজ্য গড়া—রাজত্ব করা নয়।

তবে মধুকরকে নিয়ে যাও। সে দেশ অরাজক, মগ আর ফিরিঙ্গি ডাকাতদের মধ্যে আমি তিলার্ধ বিশ্রাম পাব না। আমি পাকশির বিলের মধ্যে দেউল গড়ে শেষ ক'টা দিন শান্তিতে থাকব।

কাছাকাছি পাঁচ-সাতটা সুদীর্ঘ চর, তাদের মাঝে অল্প অল্প জল-কাদা। কুণ্ডলের পিঠের উপর বল্লম উঁচু করিয়া রায়রায়ান। প্রথম যৌবনের দুর্ধর্ষ বিক্রম বুকের মধ্যে আবার নাচিয়া উঠিয়াছে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একবার সামনের দিকে তাকাইয়া রায়রায়ান মাটিতে বল্লম

ছুঁড়িয়া মারিলেন। অমনি সারবন্দি হাজার কোদাল পড়িল—ঝপ্ ঝাপ্। সেই হাজার হাত হইল দীঘির উত্তরসীমা।

বল্লম তুলিয়া লইয়া রায়রায়ান তীরবেগে কুণ্ডলকে ছুটাইলেন। কুণ্ডল উড়িয়া চলিল। একদমে আধ ক্রোশ গিয়া একলহমা ঘোড়া থামিল। রায়রায়ান বল্লম পুঁতিয়া রাখিয়া রামনগরে ফিরিয়া আসিলেন।

হাজার হাজার কোদাল দিনের পর দিন পড়িতে লাগিল। অবশেষে পোঁতা বল্লমের গোড়ায় আসিয়া দীঘি কাটা শেষ হইল। মাটির স্তূপে আকাশভেদী পাহাড় হইয়াছে। দেশ-দেশান্তর হইতে বড় বড় পাথরের চাঁই আসিয়া জমিতে লাগিল। দিনরাত্রি সেই পাথর মাটিতে বসানো হইতেছে, পাথরের উপর পাথর বসাইয়া দ্রুত এক অতি-বিচিত্র দেউল রচিত হইতেছে। কত স্তম্ভ, কত চূড়া, কত মনোহর কারুকার্য তাহার উপর! সমস্ত জীবনের সঞ্চিত স্বর্ণভাণ্ডার উজাড় করিয়া রামেশ্বর পাকসিব বিলের মধ্যে ঢালিতে লাগিলেন।

আকাশ আলো করে দাঁড়িয়েছে, চমৎকার! চমৎকার!

লোকে বলে, রায়রায়ানের সাধনপীঠ।

কোন্ দেবতার প্রতিষ্ঠা হবে?

কেহ বলিতে পারে না।

শ্রাবণবর্ষণ মেঘান্ধকার ভাদ্র-অষ্টমীর সন্ধ্যাকালে রামেশ্বর যাত্রা করিলেন। মঞ্জরী ভুলে নাই—মন্দিরের লৌহ-সম্বদ্ধ সুদৃঢ় বেষ্টনীর বাহিরে কৃষ্ণচূড়ার তলে আঁচল ঝাঁপিয়া সে প্রতীক্ষা করিতেছিল, মুহূর্তে ঘোড়ায় চড়িয়া রায়রায়ানের পৃষ্ঠ-লগ্ন হইল। রক্ষীরা সচকিত হইয়া দেখিল, দস্যু কন্যাকে লইয়া পলাইতেছে। কড়কড় করিয়া মেঘ ডাকিয়া মুষলধারে জল নামিল।

কুণ্ডল তীরবেগে ছুটিল। কুণ্ডলের কে অনুসরণ করিয়া পারিবে? দেখিতে দেখিতে ঘোড়া নিখোঁজ হইয়া গেল।

রামনগরে যখন পৌঁছিল তখন শেষরাত্রি। পিঠের উত্তরীয় খুলিয়া রামেশ্বর কুমারীর দেহবল্লরী ধীরে ধীরে বাহুতে ধরিয়া তুলিলেন। পদ্মের পাপড়ির মতো চক্ষু দু'টি মুদিয়া মঞ্জরী ক্লান্তিতে এলাইয়া

রহিয়াছে। মেঘভাঙা ক্ষীণ জ্যোৎস্না আসিয়া পড়িয়াছে তার ঘুমন্ত মুখের উপর। গভীর স্নেহে মুহূর্তকাল রামেশ্বর সেই মুখের দিকে চাহিলেন, তারপর অতি সন্তর্পণে তাহাকে সুকোমল উচ্চ শয্যার উপর শোয়াইয়া দিলেন।

মধুকরের ডাক পড়িল। আনন্দের প্লাবন রামেশ্বরের অন্তর ভরিয়া ছাপাইয়া বাহিরে আসিতেছে, পরাজয়ের সমস্ত গ্লানি নিঃশেষে ভাসিয়া গিয়াছে। রামেশ্বর বলিলেন, মঞ্জরী রইলেন। দিনের বেলায় নয়— কাল সন্ধ্যার পর আঁধারে আঁধারে বজরায় করে ওঁকে পৌঁছে দিও। আমি দেউলের দরজায় প্রতীক্ষা করব।

মধুকর বলিল, এখনই যাচ্ছেন কেন? আপনি বড় ক্লান্ত, কিছুক্ষণ বিশ্রাম করুন।

রামেশ্বর কহিলেন, অবসর কোথা ভাই? এখনও মন্দিরের চূড়ায় সোনার কলসি বসানো হয় নি, কত কাজ বাকি। কাল দেবীর প্রতিষ্ঠা হবে। এর মধ্যে প্রস্তুত হতে হবে তো!

হাসিয়া তখনই তিনি রওনা হইয়া গেলেন।

দীঘির জল কাকচক্ষুর মতো টলমল করিতেছে, সকালের সোনার আলোয় দেউল জলের উপর ছায়া ফেলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। নিশ্বাস ফেলিয়া রায়রায়ান অসমাপ্ত কাজটুকু সমাধা করিতে লাগিয়া গেলেন। লোকজন আর বেশি নাই, অনেকেই বিদায় হইয়া গিয়াছে। দেউল-শীর্ষে সোনার কলসি বসানো হইল, সারচন্দনে সমস্ত প্রকোষ্ঠ অনুলিপ্ত করা হইল, সহস্র ঘৃতের দীপ সাজানো হইল—রাত্রে জ্বালা হইবে, ডিঙার পর ডিঙা ভরিয়া আসিতে লাগিল পাকসি বিলের সমস্ত পদ্মফুল।

এত ফুল?

রায়রায়ানের পূজায় লাগিবে।

রাত্রির দুই প্রহর অতীত হইয়াছে। রায়রায়ানের গুপ্ত পূজা, সেজন্য সন্ধ্যার আগেই সমস্ত লোক দেউল হইতে বিদায় করিয়া দেওয়া হইয়াছে, আর কেহ নাই। লোকালয় হইতে বহু দূরে প্রকাণ্ড বিলের নিঃশব্দ পাষাণপুরীর মাথায় অনন্ত তারকাশ্রেণী। কক্ষের দীপাবলী

একের পর এক নিভিয়া আসিতেছে, হু-হু করিয়া নৈশ-বাতাসে বিলের জল ছল-ছল করিয়া উঠিতেছে। রামেশ্বর ছুটিয়া জলের প্রান্তে গিয়া দাঁড়ান, বুঝি বজরা আসিয়া ভিড়িল! আবার মেঘ জমিয়া তারা ঢাকিয়া অন্ধকার নিবিড় হইয়া আসিতেছে। সহসা রামেশ্বরের মনে হইল, মরিয়া প্রেত হইয়া তিনি যেন নির্জন দ্বীপভূমিতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন —কণ্ঠে ধ্বনি নাই, পদতলে মৃত্তিকা নাই, অন্ধকার ছাড়া দৃষ্টি করিবার বস্তুও কিছু নাই, প্রবল প্রবাহশীল অনন্ত বায়ুমণ্ডলে তিনি হাহাকার করিয়া বেড়াইতেছেন। অন্তরাত্মা সত্য সত্যই তাঁহার কাঁপিয়া উঠিল, হা-হা-হা করিয়া অকস্মাৎ উদ্দাম হাসির সঙ্গে অমূলক ভয় ভাঙিতে চেষ্টা করিলেন। মনে হইল, দূরে মসীকৃষ্ণ অন্ধকারের মধ্য দিয়া জলরাশি উত্তাল তাড়নে ভেদ করিয়া দ্রুতবেগে কি যেন আগাইতেছে দুই চক্ষের সমস্ত দৃষ্টিশক্তি পুঞ্জিত করিয়া অন্ধকারের দিকে নির্নিমেষ চোখে চাহিয়া অধীর কণ্ঠে চিৎকার করিয়া উঠিলেন, মধুকর! মধুকর!

ফিরিয়া আসিয়া আবার দ্বারপ্রান্তে বসিলেন। দীপ নিবিয়া গিয়া অন্ধকারের মধ্যে বিশাল সৌধকক্ষ অপরূপ রহস্যাবৃত দেখাইতেছে। বাতাস উঠিয়াছে। ঝড়ের বাতাস নৈশ নিস্তব্ধতা মথিত করিয়া নবনির্মিত দেউলের পাষাণ-প্রাচীরে আর্ত ক্রন্দন তুলিয়া দাপাদাপি করিতে লাগিল। ক্রমে রামেশ্বর কোন সময়ে ঘুমাইয়া পড়িলেন।

হঠাৎ বৃষ্টি-সিক্ত শীতল হস্ত আসিয়া লাগিল বাহুর উপর। মুহূর্তে চমকিয়া জাগিয়া বলিলেন, এলি? চোখ মুছিয়া দেখিলেন, মধুকর নহে —জীবনলাল। জীবনলাল নমস্কার করিল। উঠিয়া বসিয়া গম্ভীর কণ্ঠে রায়রায়ান বলিলেন, আবার ইসলামবাদ গিয়েছিলে, না? কবে ফিরলে?

জীবনলাল বলিল, আজ্ঞ। সেখানে সমস্ত ঠিক করে এসেছি। ছোটখাট গড়ের পত্তন হয়েছে।

একটু বিরক্তির সঙ্গে রায়রায়ান বলিলেন, সে কথা আমার সঙ্গে কেন দেওয়ানজি, ছোট রায়ের সঙ্গে বোলো।

জীবনলাল আবার নমস্কার করিয়া বিনীত কণ্ঠে বলিল, তিনি চলে গেছেন সেখানে। আমি শুধু খবরটা দিতে এসেছি।

মঞ্জরী তা হলে তোমার সঙ্গে এলেন ? ব্যস্ত হইয়া রামেশ্বর উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

জীবনলাল বলিল, না প্রভু, তিনিও স্বামীর সঙ্গে গেছেন। ছোট রায় সেই খবর দিতে আমায় পাঠিয়ে দিলেন।

নিবিড় অন্ধকারে কেহ কাহারও মুখ দেখিতে পাইলেন না। অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল, দু-জনেই পাষাণ-মূর্তির মতো দাঁড়াইয়া। তারপর রায়রায়ান বসিলেন। হঠাৎ হাসিয়া উঠিয়া প্রশ্ন করিলেন, মধুকর কি বলে পাঠাল ?

তিনি বললেন, মঞ্জরী তাঁর বাগ্‌দত্তা বধূ—আট মাস আগে রামনগর প্রাসাদের অলিন্দে চন্দ্র-সূর্য সাক্ষি করে গোপনে তাঁদের মালা-বদল হয়েছিল। ভরত রায়ের কঠোর শাসন থেকে তাঁকে ছিনিয়ে আনা— আপনি আর আপনার কুণ্ডল ছাড়া জগতে আর কারও সাধ্য হত না। কৃতজ্ঞ চিত্তে তিনি আপনাকে প্রণাম পাঠিয়েছেন।

বেশ, বেশ। বলিয়া দিল গাঁপাইয়া রামেশ্বর আবার হাসিয়া উঠিলেন। আর রাণী মঞ্জরী—তিনি কিছু বললেন ?

জীবনলাল বলিল, রাণী বলে পাঠিয়েছেন, বাধ্য হয়েই তাঁকে আপনার সঙ্গে একটু ছলনা করতে হয়েছিল। আপনি তাঁকে ক্ষমা করবেন।

ভোর হইয়া গেলে জীবনলাল বিদায় লইতে আসিয়া দেখিল, রামেশ্বর জলের দিকে নিবিষ্ট মনে চাহিয়া আছেন। পদশব্দে মুখ তুলিয়া চাহিলেন। বলিলেন, জলে কেমন ছায়া পড়েছে—বড্ড বুড়ো হয়ে গেছি, না ?

কেমন যেন উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি, পাগলের মতো।

জীবনলাল বলিল, প্রভু, বিদায় দিন এবার—ইসলামাবাদ যাব।

এখনই ?

হাঁ। নতুন রাজ্য গড়ছি, অবসর নেই। আশীর্বাদ করুন রায়রায়ান, এবার যেন সফল হই।

রামেশ্বর গভীর কণ্ঠে আশীর্বাদ করিলেন। তারপর বলিলেন, আর একটা কাজ করে দিয়ে যাও দেওয়ান মশাই। যারা দেউল গড়তে

এসেছিল, তারা রামনগরে এখনও পুরস্কারের প্রতীক্ষায় অপেক্ষা করছে। তাদের একবার এখানে পাঠিয়ে যাও—কাজ আরও বাকি আছে।

লোকজন আসিয়া পড়িল। রৌদ্রোজ্জ্বল দেউল-চূড়ায় সোনার কলসি ঝকঝক করিতেছে, রামেশ্বর দেখাইয়া ইঙ্গিত করিলেন নামাইয়া আনিতে। কাল এমনি সময়ে কত কষ্টে কত কৌশলে কলসি ওখানে বসানো হইয়াছে, গাঁতি দিয়া খুঁড়িয়া খুঁড়িয়া আবার তাহা খসাইয়া আনা হইল। কলসি উপুড় করিয়া তাহার উপর বসিয়া রামেশ্বর হুকুম দিলেন, ভাঙো দেউল।

রায়রায়ান প্রকৃতিস্থ নাই, সকলে বুঝিল। কেহ অগ্রসর হইল না। রামেশ্বর পুনরায় বজ্রকণ্ঠে হুকুম দিলেন। কয়েক জন রামনগরে ছুটিল খবর দিতে, কাল রাত্রে পূজা করিতে গিয়া রায়রায়ান একেবারে উন্মাদ হইয়া গিয়াছেন। রামেশ্বর কলসি লইয়া ছুটিলেন কক্ষের মধ্যে। কুলুঙ্গির টানা খুলিয়া সঞ্চয়ের অবশেষ সমস্ত স্বর্ণ মুদ্রা বোঝাই করিয়া কহিলেন, ভাঙো দেউল, ভাঙো দেউল—। মুঠি মুঠি স্বর্ণ-মুদ্রা সকলের কোলে ঢালিয়া দিতে লাগিলেন, স্বর্ণমুঠি ধূলি-মুঠির মতো ছড়াইতে লাগিলেন। বলিতে লাগিলেন, ভাঙো, ভাঙো—

তারপর নিজেই গাঁতি লইয়া উপরে উঠিলেন।

ঝুপ-ঝুপ শব্দে ইট পাথর টুকরা টুকরা হইয়া পড়িতে লাগিল। মাসের পর মাস বাটালির আঘাতে পাষাণগুলি জীবন্ত প্রতিমার রূপ ধরিয়াছিল। বৃদ্ধ রতনদাস শিল্পীদের সর্দার। নিজে সে গাঁতি ধরিতে পারিল না, প্রাঙ্গণের এক ধারে দাঁড়াইয়া চক্ষু মুছিতেছিল। উন্মাদ রামেশ্বর নামিয়া আসিয়া তাহাকে দেখিলেন। দেখিয়া মুখ হাসিতে ভরিয়া গেল। তাহার মুখের উপরে অতি সন্নিকটে মুখ আনিয়া রামেশ্বর বলিতে লাগিলেন, কাঁদছ কেন। চুল পেকেছে বলে? এস আমার সঙ্গে—

কেহ কিছু বুঝিবার আগেই বিশাল তরঙ্গায়িত ঘোড়াদীঘির তলহীন ঘনকৃষ্ণ জলরাশির মধ্যে রামেশ্বর ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন। হায়-হায়—করিয়া আকুল চিৎকার উঠিল। শত শত লোক তাঁহাকে ধরিতে সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

এখন যুদ্ধ-বিগ্রহের দিনকাল নাই। সেকালের দুর্ধর্ষ চাকলাদারেরা মরিয়া গিয়াছে; সুস্থ স্বচ্ছন্দ নিরুদ্বিগ্ন বাংলাদেশ। সেই অগ্নিবর্ষী তোপগুলিরও পরমাগতি লাভ হইয়াছে। কামারের আগুনে পুড়িয়া কতক হইয়াছে কয়েদির বেড়ি কিংবা রাস্তা তৈরির রোলার। কতকগুলি নদীর পলিমাটিতে একেবারেই লুকাইয়া গিয়াছে। গ্রামে ঘুরিতে ঘুরিতে তবু কদাচিৎ ধূলামাটি-মাখা দু-একটার হঠাৎ দেখা পাইয়া যাইতে পার। হয়তো কোন অশ্বত্থতলায় বিলুপ্ত-বংশ প্রাচীন অতিকায় কঙ্কালের মতো রোদ-বৃষ্টির মধ্যে পড়িয়া আছে, মহাকাল পদাঘাতে ঠেলিয়া রাখিয়া গিয়াছে, ইদানীং রাখালেরা গরু ছাড়িয়া দিয়া তাহার উপরে বসিয়া বাঁশী বাজায়। এমনি একটা কিল্লাবাড়ির ঘাটে পড়িয়া রহিয়াছে, দেখিতে পাইবে। সেইটা থাকায় তাহার গায়ে ডোঙা বাঁধার বড় সুবিধা হইয়াছে।

কিন্তু সাবধান! ফুটফুটে জ্যোৎস্না দেখিয়া রাত্রে কোনদিন ঐ ঘাট হইতে ডোঙা খুলিয়া দিও না, সহস্র সহস্র ফুটন্ত শাপলা তোমাকে দিগ্‌ভ্রান্ত করিবে। লগি ঠেলিতে ঠেলিতে হঠাৎ এক সময়ে পাষাণ-স্তূপে ধাক্কা খাইবে, তাকাইয়া দেখিবে—একেবারে রায়রায়ানের দেউলের কাছে আসিয়া পড়িয়াছ। নিষুপ্ত রাত্রে দ্বীপের উপর তাল-গাছের ফাঁকে ফাঁকে তেরছা হইয়া পড়া জ্যোৎস্না · হঠাৎ বাতাস উঠিয়া নলবন বাজিয়া উঠিবে। মনে হইবে, নির্জন ধ্বংসাবশেষ দেউলে রায়রায়ান হাহাকার করিয়া বেড়াইতেছেন। ত্রস্ত হইয়া যে-দিকে ডোঙা ঘুরাইবে, দেখিতে পাইবে সেকালের প্রস্তরীভূত অসংখ্য অপ্সরা ময়ূর ও পদ্মফুল। অল্প অল্প মাথা তুলিয়া তাহারা তাকাইয়া থাকিবে, আলেয়ার মতো পথ ভুলাইয়া সমস্ত রাত্রি তোমাকে ঘুরাইয়া লইয়া বেড়াইবে—ফিরিবার পথ খুঁজিয়া পাইবে না।

বনমর্মর

মৌজাটি নিতান্ত ছোট নয়। অগ্রহায়ণ হইতে জরিপ চলিতেছে, খানাপুরি শেষ হইল এতদিনে। ছিঞ্চে-কলমির দামে-আঁটা নদীর কূলে বটতলার কাছাকাছি সারি সারি তিনটি তাঁবু পড়িয়াছে। চারিদিকে বিস্তীর্ণ ফাঁকা মাঠ।

শঙ্কর ডেপুটি সদর ক্যাম্প হইতে আজ আসিয়া পৌঁছিয়াছে। উপলক্ষ একটা জটিল রকমের মোকর্দমা। ছোকরা মানুষ, ভারি চটপটে—পত্নীবিয়োগের পর হইতে চাঞ্চল্য যেন আরও বাড়িয়া গিয়াছে। আসিয়াই আমিনের তলব পড়িল।

আমিনকে ডাকিতে পাঠাইয়া একটা চুরুট বাহির করিল। চুরুটের কৌটায় সেই সাত মাস আগেকার শুকনো বেলের পাতা ক'টি এখনও রহিয়াছে।

সাত মাস আগে একদিন বিকালবেলা তাহাদের দেশের বাড়িতে দোতলার ঘরে ঢুকিয়া শঙ্কর জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, সুধারাণী, কালকে কি বার?

সুধা বলিয়াছিল, পাঁজি দেখগে যাও, আমি জানিনে। তারপর হাসিয়া চোখ দু'টি বিস্ফারিত করিয়া বলিয়াছিল, চলে যাবেন, তাই ভয় দেখান হচ্ছে। ভারি কিনা ইয়ে—

শঙ্করও খুব হাসিয়াছিল। বলিয়াছিল, যদি মানা কর, তবে না হয় যাই নে—

থাক।

কোন জবাব না দিয়া সুধারাণী অত্যন্ত মনোযোগের সহিত কাপড় কোঁচাইয়া পাট করিতে লাগিল। শঙ্কর তাহার হাত ধরিয়া কাছে আনিল।

শোন সুধারাণী, উত্তর দাও—

বা-রে, পরের মনের কথা আমি জানি বুঝি!

নিজের তো জান?

তবু কথা কহে না দেখিয়া শঙ্কর বলিতে লাগিল, আমি চলে যাব বলে তোমার কষ্ট হচ্ছে কিনা সেই কথাটা বল আমায়—না বললে শুনছি নে কিছুতে—

না।

সত্যি বলছ ?

না—না—না। বলিয়া হাত ছাড়াইয়া সুধা বাহির হইয়া যাইতেছিল। শঙ্কর পলায়নপরার সামনে গিয়া দাঁড়াইল।

মিছে কথা। দেখি, আমার দিকে চাও—কই, চাও দিকি সুধারাণী—

সুধা তখন দুই চক্ষু প্রাণপণে বুজিয়া আছে। মুখ ফিরাইয়া ধরিতেই ঝর-ঝর-করিয়া গাল বহিয়া চোখের জল গড়াইয়া পড়িল। আঁকিয়া বাঁকিয়া পাশ কাটাইয়া বধূ পলাইল।...

শেষ রাতে বৃষ্টি নামিয়াছে। লক্ষ্মণ বাহির হইতে ডাকিল, ছোটবাবু, ঘাটে স্টিমার সিটি দিয়েছে।

সুধারাণী গলায় আঁচল বেড়িয়া প্রণাম করিল। কহিল, দাঁড়াও একটু। তাড়াতাড়ি কুলুঙ্গির কোণ হইতে সন্ধ্যাকালে গোছাইয়া-রাখা বিল্বপত্র আনিয়া হাতে দিল।

দুর্গা, দুর্গা, দুর্গা! হপ্তায় একখানা করে চিঠি দিও, যখন যেখানে থাক, বুঝলে ?

আরও একটা দিনের কথা মনে পড়ে, এমনি এক বিকালবেলা মামুদপুর ক্যাম্পে সে জরিপের কাজ করিতেছে, এমন সময় চিঠি আসিল, সুধারাণী নাই।

ইতিমধ্যে নক্সা ও কাগজপত্র লইয়া ভজহরি আমিন সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল।

দু'শ-দশ—এগারো—তার উত্তরে এই হল গে-দু'শ বারো নম্বর প্লট—বলিয়া ভজহরি নক্সার উপর জায়গাটা চিহ্নিত করিল। বলিতে লাগিল, অনাবাদি বন-জঙ্গল একটা, মানুষজন কেউ যায় না ওদিকে, তবু এই নিয়ে যত মামলা—

হঠাৎ একবার চোখ তুলিয়া দেখিল, সে-ই কেবল বকিয়া মরিতেছে, শঙ্কর বোধ করি একবারও কাগজপত্রের দিকে তাকায় নাই—সামনের উত্তরের মাঠের দিকে এক নজর তাকাইয়া আপন মনে দিব্য শিষ দিতে সুরু করিয়াছে, চুরুটের আগুন নিভিয়া গিয়াছে—

বলিল, হ্যাঁ, ঐ যে তালগাছ ক'টার ওধারে কালো কালো দেখা যাচ্ছে—জঙ্গলের আরম্ভ ঐখানে। এখান থেকে বোঝা যাচ্ছে না ঠিক, কিন্তু ওর মধ্যে জমি অনেক…এইবারে রেকর্ড একবার দেখবেন হুজুর, ভারি গোলমেলে ব্যাপার—

হাঁ হাঁ না—এই রকম বলিতে বলিতে একটু অপ্রস্তুত হইয়া শঙ্কর কাগজপত্রে মন দিল। পড়িয়া দেখিল, দু'শ বারোর খতিয়ানে মালিকের নাম লেখা হইয়াছে, শ্রীধনঞ্জয় চাকলাদার।

ভজহরি বলিতে লাগিল, আগে ঐ একটা নাম শুধু লিখেছিলাম। তারপর দেখুন, ওর নিচে নিচে উড-পেন্সিল দিয়ে আরও সাতটা নাম লিখতে হয়েছে। রোজই এই রকম নতুন নতুন মালিকের উদয় হচ্ছে। আজ অবধি একুনে আট জন তো হলেন—যে রেটে ওঁরা আসতে লেগেছেন দু-এক দিনের মধ্যে কুড়ি পুরে যাবে বোধ হচ্ছে। এই পাতায় কুলোবে না।

শঙ্কর কহিল, কুড়ি পুরে যাবে, যাওয়াচ্ছি আমি—রোসো না। আজই খতম করে দেব সব। তুমি ওদের আসতে বললে কখন?

সন্ধ্যের সময়। গেরস্ত লোক সারাদিন কাজকর্মে থাকে—একটু রাত হবে, জ্যোৎস্না রাত আছে—তার আর কি?

আরও খানিকটা কাজকর্ম দেখিয়া শঙ্কর সহিসকে ঘোড়া সাজাইতে হুকুম দিল।

বলিল, মাঠের দিক দিয়ে চক্কোর দিয়ে আসা যাক একটা—এ রকম হাত-পা কোলে করে তাঁবুর মধ্যে কাঁহাতক বসে থাকা যায়? এ জায়গাটা কিন্তু তোমরা বেশ সিলেক্ট করেছ আমিন মশাই। ওগুলো ভাটফুল, না? কিন্তু গাছের দশা দেখে হাসি না কাঁদি—

বলিতে বলিতে আবার কি ভাবিল। বলিল, ঘোড়া থাকগে। এক কাজ করলে হয় বরং—চল না কেন দু-জনে পায়ে পায়ে জঙ্গলটা ঘুরে

আসি। মাইলখানেক হবে—কি বল? বিকেলে ফাঁকায় বেড়ালে শরীর ভাল থাকে। চল—চল—

মাঠের ফসল উঠিয়া গিয়াছে। কোনদিকে লোক-চলাচল নাই। শঙ্কর আগে আগে যাইতেছিল, ভজহরি পিছনে। জঙ্গলের সামনেটা খাতের মতো,—অনেকখানি চওড়া, খুব নাবাল। সেখানে ধান হইয়া থাকে, ধানের গোড়াগুলা রহিয়াছে। পাশ দিয়া উঁচু আল বাঁধা।

সেখানে আসিয়া শঙ্কর কহিল, গাঙের বড় খাল-টাল ছিল এখানে?

ভজহরি কহিল, না হুজুর, খাল নয়—এটা গড়খাই। সামনের জঙ্গলটা ছিল গড—

গড়?

আজ্ঞে হ্যাঁ, রাজারামের গড। রাজারাম বলে নাকি কে-একজন কোনকালে এখানে গড় তৈরি করেছিলেন। এখন তার কিছু নেই, জঙ্গল হয়ে গেছে সব।

তারপর দু-জনে নিঃশব্দে চলিতে লাগিল।

মাঝে একবার শঙ্কর জিজ্ঞাসা করিল, বাঘ টাঘ নেই তো হে?

ভজহরি তাচ্ছিল্যের সহিত জবাব দিল, বাঘ! চারিদিকে ধূ-ধূ করছে ফাঁকা মাঠ, এখানে কি আর···তবে হ্যাঁ, অন্যান্য বার শুনলাম কেঁদো-গোবাঘা দু-একটা আসত। এবারে আমাদের জ্বালায়—

বলিয়া হাসিল। বলিতে লাগিল, উৎপাতটা আমরা কি কম করছি হুজুর? সকাল নেই, সন্ধ্যে নেই—কম্পাস নিয়ে চেন ঘাড়ে করে করে সমস্তটা দিন ঐ পথ যা দেখছেন, জঙ্গল কেটে আমরাই বের করেছি, আগে পথঘাট কিছু ছিল না—এ অঞ্চলের কেউ এ বনে আসে না—

বনে ঢুকিয়া খানিকটা যাইতেই মনে হইল, এই মিনিট দুয়ের মধ্যেই বেলা ডুবিয়া রাত্রি হইয়া গেল।

ঘন শাখাজাল-নিবদ্ধ গাছপালা, আম আর কাঁটাল গাছের সংখ্যাই বেশি, পুরু বাকল ফাটিয়া চৌচির হইয়া গুঁড়িগুলি পড়িয়া আছে যেন এক একটা অতিকায় কুমীর, ছাতাধরা সবুজ··· ফাঁকে ফাঁকে পরগাছা

একদা মানুষেই যে ইহাদের পুতিয়া লালন করিয়াছিল আজ আর তাহা বিশ্বাস হয় না। কত শতাব্দীর শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা মাথার উপর দিয়া কাটিয়া গিয়াছে, তলার আঁধারে এইসব গাছপালা আদিম-কালের কত সব রহস্য লুকাইয়া রাখিয়াছে, কোনদিন সূর্যকে উঁকি মারিয়া কিছু দেখিতে দেয় নাই!...

এই রকম একটানা কিছুক্ষণ চলিতে চলিতে শঙ্কর দাঁড়াইয়া পড়িল।

ওখানটায় তো ফাঁকা বেশ! জল চকচক করছে—না?

আমিন বলিল, ওর নাম পঙ্কদীঘি—

খুব পাঁক বুঝি?

তা হবে, কেউ আবার বলে পক্ষী-দীঘির থেকে পঙ্কদীঘি হয়েছে।

বলিয়া ভজহরি গল্প আরম্ভ করিল—

সেকালে এই দীঘির কালো জলে নাকি অতি সুন্দর ময়ূরপঙ্খী ভাসিত। আকারেও সেটি প্রকাণ্ড—দুই কামরা, ছয়খানি দাঁড়। এত বড় ভারি নৌকা, কিন্তু তলির ছোট্ট একখানা পাটা একটুখানি ঘুরাইয়া দিয়া পলকের মধ্যে সমস্ত ডুবাইয়া ফেলা যাইত। দেশে সে সময় শাসন ছিল না, চট্টগ্রাম অঞ্চলের মগেরা আসিয়া লুটতরাজ করিত, জমিদারদের মধ্যে রেশারেশি লাগিয়াই ছিল। প্রত্যেক বড়লোকের প্রাসাদে গুপ্তদ্বার ও গুপ্তভাণ্ডার থাকিত, মান-সম্ভ্রম লইয়া পলাইয়া যাইবার—অন্ততপক্ষে মরিবার অনেক সব উপায় সম্ভ্রান্ত লোকেরা হাতের কাছে ঠিক করিয়া রাখিতেন। কিন্তু নৌকার বহিরঙ্গ দেখিয়া এসব কিছু ধরিবার জো ছিল না। চমৎকার ময়ূরকণ্ঠি রঙে অবিকল ময়ূরের মতো করিয়া গলুইটি কুঁদিয়া তোলা—শোনা যায়, এক-একদিন নিঝুম রাত্রে সকলে ঘুমাইয়া পড়িলে রাজারামের বড় ছেলে জানকীরাম তাঁর তরুণী পত্নী মালতীমালাকে লইয়া চিত্রবিচিত্র ময়ূরের পেখমের মতো পাল তুলিয়া ধীর বাতাসে ঐ নৌকায় দীঘির উপর বেড়াইতেন। এই মালতীমালাকে লইয়া এ অঞ্চলের চাষারা অনেক ছড়া বাঁধিয়াছে, পৌষ-সংক্রান্তির আগের দিন তাহারা বাড়ি বাড়ি সেই সব ছড়া গাহিয়া নূতন চাউল ও গুড় সংগ্রহ করে, পরদিন দল বাঁধিয়া সেই গুড়-চাউলে আমোদ করিয়া পিঠা খায়।

গল্প করিতে করিতে তখন তাহারা সেই দীঘির পাড়ের কাছে আসিয়াছে। ঠিক কিনার অবধি পথ নাই, নাছোড়বান্দা শঙ্কর ঝোপঝাড় ভাঙিয়া আগাইতে লাগিল। ভজহরি কিছুদূরে একটা নিচু ডাল ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

নল-খাগড়ার বন দীঘির অনেক উপর হইতে আরম্ভ হইয়া জলে গিয়া শেষ হইয়াছে, তারপর কুচো-শেওলা শাপলার ঝাড়। ঝুঁকিয়া-পড়া গাছের ডাল হইতে গুলঞ্চলতা ঝুলিতেছে। একটু দূরের দিকে কিন্তু কাকচক্ষুর মতো কালো জল। সাড়া পাইয়া ক'টা ডা'কপাখী নলবনে ঢুকিল। অল্প খানিকটা ডাইনে বিড়ালআঁচড়ার কাঁটা-ঝোপের নিচে এককালে যে বাঁধানো ঘাট ছিল, এখনও বেশ বুঝিতে পারা যায়।

সেই ভাঙাঘাটের অনতিদূরে পাতলা পাতলা সেকেলে ইটের পাহাড়। কতদিন পূর্বে বিস্মৃত শতাব্দীর কত কত নিভৃত সুন্দর জ্যোৎস্না রাত্রে জানকীরাম হয়তো প্রিয়তমাকে লইয়া ওখান হইতে টিপিটিপি এই পথ বহিয়া এই সোপান বহিয়া দীঘির ঘাটে ময়ূরপঙ্খীতে চড়িতেন। গভীর অরণ্যছায়ে সেই আসন্ন সন্ধ্যায় ভাবিতে ভাবিতে শঙ্করের সমস্ত সম্বিৎ হঠাৎ কেমন আচ্ছন্ন হইয়া উঠিল।

ধ্যেৎ, আমার ভয় করে—কেউ যদি দেখে ফেলে!

কে দেখবে আবার? কেউ কোথাও নেই, চল মালতীমালা—লক্ষ্মীটি, চল যাই—

আজ থাক, না না—তোমার পায়ে পড়ি, আজকের দিনটে থাক শুধু।

ঐ যেখানে আজ পুরানো ইটের সমাধিস্তূপ, ওখানে বড় বড় কক্ষ অলিন্দ বাতায়ন ছিল, উহারই কোনখানে হয়তো একদা তারা-খচিত রাত্রে ময়ূরপঙ্খীর উচ্ছ্বসিত বর্ণনা শুনিতে শুনিতে এক তন্বঙ্গী রূপসী রাজবধূর চোখের তারা লোভে ও কৌতুকে নাচিয়া উঠিতেছিল, শব্দ হইবে বলিয়া স্বামী হয়তো বধূর পায়ের নূপুর খুলিয়া দিল, নিঃশব্দে খিড়কি খুলিয়া পা টিপিয়া টিপিয়া দুইটি চোর সুপ্তপুরী হইতে বাহির হইয়া ঘাটের উপর নৌকায় উঠিল, রাজবাড়ির কেউ তা জানিল না। ফিসফিস কথাবার্তা···স্বচ্ছ মেঘের আড়ালে চাঁদ মৃদু মৃদু হাসিতেছিল··

শব্দ হইবার ভয়ে দাঁড়ও নামায় নাই···এমনি বাতাসে ময়ূরপঙ্খী রাঙ্গা-দীঘি অবধি ভাসিয়া চলিল—

ভাসিতে ভাসিতে দূরে—বহুদূরে—শতাব্দীর আড়ালে কোথায় তাহারা ভাসিয়া গিয়াছে!

ভাবিতে ভাবিতে শঙ্করের কেমন ভয় করিতে লাগিল। গভীর নির্জনতার একটি ভাষা আছে, এমন জায়গায় এমনি সময় আসিয়া দাঁড়াইলে তবে তাহা স্পষ্ট অনুভব হয়। চারিপাশের বনজঙ্গল অবধি ঝিম-ঝিম করিয়া যেন এক অপূর্ব ভাষায় কথা কহিতে আরম্ভ করিয়াছে। ভয় হইল, আরও কিছুক্ষণ সে যদি এখানে এমনি ভাবে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে, জমিয়া নিশ্চয় গাছের গুঁড়ির মতো হইয়া যাইবে; আর নড়িবার ক্ষমতা থাকিবে না। সহসা সচেতন হইয়া বারবার সে নিজের স্বরূপ ভাবিতে লাগিল, সে সরকারি কর্মচারী তার পসার-প্রতিপত্তি···ভবিষ্যতের আশা···মনকে ঝাঁকা দিয়া দিয়া সমস্ত কথা স্মরণ করিতে লাগিল। ডাকিল, আমিন মশাই!

ভজহরি কহিল, সন্ধ্যে হয়ে গেল, হুজুর—

যাচ্ছি।

ক্যাম্পের কাছাকাছি হইয়া শঙ্কর হাসিয়া উঠিল। কহিল, ডাকাত পড়েছে নাকি আমাদের তাঁবুতে? বাপরে বাপ! এবং হাসির সহিত ক্ষণপূর্বের অনুভূতিটা সম্পূর্ণরূপে উড়াইয়া দিয়া বলিতে লাগিল, চুরুট টেনে টেনে তো আর চলে না—হুঁকো-কলকের ব্যবস্থা করতে পার আমিন মশাই, খাঁটি স্বদেশি মতে বসে বসে টানা যায়—

আমিনও হাসিয়া বলিল, অভাব কি? মুখের কথা না বেরুতে গাঁ থেকে বিশটা রূপোবাঁধা হুঁকো এসে হাজির হবে, দেখুন না একবার—

গ্রামের ইতর-ভদ্র অনেকে আসিয়াছিল, ইঁহাদের দেখিয়া তটস্থ হইয়া সকলে একপাশে সরিয়া দাঁড়াইল। মিনিট দশেক পরে শঙ্কর তাঁবুর বাহিরে আসিয়া মামলার বিচারে বসিল। বলিল, মুখের কথায় হবে না কিছু, আপনাদের দলিলপত্তোর কার কি আছে দেখান একে একে। ধনঞ্জয় চাকলাদার আগে আসুন—·

ধনঞ্জয় সামনে আসিল। কোষ্ঠির মতো জড়ানো একখানা তুলোটে রঙের কাগজ, কালো ছাপ-মারা, পোকায় কাটা, সেকেলে বাংলা হরপে লেখা। শঙ্কর বিশেষ-কিছু পড়িতে পারিল না, ভজহরি কিন্তু হেরিকেনটা তুলিয়া ধরিয়া অবাধে আগাগোড়া পড়িয়া গেল। কে-একজন দয়ালকৃষ্ণ চক্রবর্তী নামজাদ রাজারামের গড় একশ' বারো বিঘা নিষ্কর জায়গা-জমি মায় বাগিচা-পুষ্করিণী তারণচন্দ্র চাকলাদার মহাশয়ের নিকট সুস্থ শরীরে সরল মনে খোশকোবলায় বিক্রয় করিতেছে।

শঙ্কর জিজ্ঞাসা করিল, ঐ তারণচন্দ্র চাকলাদার আপনার কেউ হবেন বুঝি ধনঞ্জয়বাবু?

ধনঞ্জয় সোৎসাহে কহিতে লাগিল, ঠিক ধরেছেন হুজুর, তারণচন্দোর আমার প্রপিতামহ। পিতামহ হলেন কৈলাসচন্দোর—তাঁর বাবা। তিরাশি সন থেকে এই সব নিষ্করের সেস গুণে আসছি কালেক্টরিতে, গুডিভ সাহেবের জরিপের চিঠে রয়েছে। কবলার তারিখটে একবার লক্ষ্য করে দেখবেন, হুজুর—

আরও অনেক কথা বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু উপস্থিত অনেকে না-না—করিয়া উঠিল। তাহারাও রাজারামের গড়ের মালিক বলিয়া নাম লেখাইযাছে, এতক্ষণ অনেক কষ্টে ধৈর্য ধরিয়া শুনিতেছিল, কিন্তু আর থাকিতে পারিল না।

ধমক খাইয়া সকলে চুপ করিল। শঙ্কর ভজহরিকে চুপি চুপি কহিল, তুমি ঠিকই লিখেছ, চাকলাদার আসল মালিক, আপত্তিগুলো ভুয়ো—ডিসমিস করে দেব।

ভজহরি কিন্তু সন্দিগ্ধভাবে এদিক-ওদিক বার দুই ঘাড় নাড়িয়া বলিল—আসল মালিক ধরা বড় শক্ত হয়ে দাঁড়াচ্ছে হুজুর—

বার-শ উনিশ সনের পুরানো দলিল দেখাচ্ছে যে!

ভজহরি কহিতে লাগিল, এখানে আটঘরা গ্রামে একজন লোক রয়েছে, ন-সিকে কবুল করুন তার কাছে গিয়ে—উনিশ সন তো কালকের কথা, হুবহু আকবর বাদশার আমলের দলিল বানিয়ে দেবে। আসল নকল চেনা যাবে না।

বস্তুত ধনঞ্জয়ের পর অন্যান্য সাতজনের কাগজপত্র তলব করিয়া দেখা

গেল, ভজহরি মিথ্যা বলে নাই—ঐ রকম পুরানো দলিল সকলেরই আছে। এবং বাঁধুনিও প্রত্যেকটির এমনি নিখুঁত যে যখনই যাহার কাগজ দেখে একেবারে নিঃসন্দেহ বুঝিয়া যায়, রাজারামের গড়ের মালিক একমাত্র সেই লোকটাই। এ যেন গোলক-ধাঁধায় পড়িয়া গেল। বিস্তর ভাবিয়া-চিন্তিয়াও সাব্যস্ত হইল না কাহাকে ছাড়িয়া কাহাকে রাখা যায়।

হাল ছাড়িয়া দিয়া অবশেষে শঙ্কর বলিল, দেখুন মশাইরা, আপনারা ভদ্রসন্তান—

হাঁ—হাঁ—করিয়া তাহারা তৎক্ষণাৎ স্বীকার করিল।

এই একটা প্লট একসঙ্গে ঐরকম ভাবে আটজনের তো হতে পারে না?

সকলেই ঘাড় নাড়িল। অর্থাৎ—নয়ই তো—

আপনারা হলফ করে বলুন, এর সত্যি মালিক কে।

ভদ্রসন্তানেরা তাহাতে পিছপাও নহেন। একে একে সামনে আসিয়া ঈশ্বরের দিব্য করিয়া বলিল দু'শ বাহান্ন প্লট একমাত্র তাহারই, অপর সকলে চক্রান্ত করিয়া মিথ্যা কথা কহিতেছে।

লোকজন বিদায় হইয়া গেলে শঙ্কর বলিল, না—এরা পাটোয়ারি বটে! দেখে শুনে সম্ভ্রম হচ্ছে।

ভজহরি মৃদু মৃদু হাসিতেছিল, এ রকম সে অনেক দেখিয়াছে।

শঙ্কর বলিতে লাগিল, তোমার কথাই মেনে নিলাম যে কাঁচা দলিলগুলো জাল। কিন্তু যেগুলো রেজেস্টি? দেখ, এদের দূরদৃষ্টি কত দেখ একবার—কবে কি হবে দু'-পুরুষ আগে থেকে তাই তৈরি হয়ে আসছে। চুলোয় যাকগে দলিলপত্তোর—তুমি গাঁয়ে খোঁজখবর করে কি পেলে বল? যা হোক একরকম রেকর্ড করে যাই—পরে যেমন হয় হবে—

ভজহরি বলিল, কত লোককে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি আসবার আগে কত সাক্ষিসাবুদ তলব করেছি, সে আরও মজা—এক একজনে এক এক রকম বলে। বলিয়া সহসা প্রচুর হাসিতে হাসিতে বলিল,

নরলোকে আকাঙ্খা হল না, এখন একবার কুমার বাহাদুরের সঙ্গে দেখা করে জিজ্ঞাসা করতে পারলে হয়—

শঙ্কর কথাটা বুঝিতে পারিল না।

ভজহরি বলিতে লাগিল, কুমার বাহাদুর মানে জানকীরাম। সেই যে তখন ময়ূরপঙ্খীর কথা বলছিলাম, গাঁয়ের লোকেরা বলে—আশপাশের গ্রাম নিশুতি হয়ে হয়ে গেলে জানকীরাম নাকি আসেন—উত্তর মাঠের ঐ নাককাটির খাল পেরিয়ে তেঘরা-বকচরের দিক থেকে তীরবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে রোজ রাত্তিরে মালতীমালার সঙ্গে দেখা করে যান—সে ভারি অদ্ভুত গল্প—কাজকর্ম নেই তো এখন?

* * * * *

তারপর রাত্রি অনেক হইল। তিনটি তাঁবুরই আলো নিভিয়াছে, কোন দিকে সাড়াশব্দ নাই। শঙ্করের ঘুম আসিতেছিল না। একটা চুরুট ধরাইয়া বাহিরে আসিল, আসিয়া মাঠে খানিক পায়চারি করিতে লাগিল।

ভজহরি বলিয়াছিল, কেবল জঙ্গল নয় হুজুর, এই মাঠেও সন্ধ্যের পর একলা কেউ আসে না। এই মাঠ সেই যুদ্ধক্ষেত্র, নদীপথে শত্রুরা এসেছিল। বেলা না ডুবতে রাজারামের পাঁচশ' ঢালি ঘায়েল হয়ে গেল, সেই পাঁচশ' মড়ার পা ধরে টেনে টেনে পরদিন ঐ নদীতে ফেলে দিয়েছিল···

উলুঘাসের উপর পা ছড়াইয়া চুপটি করিয়া বসিয়া শঙ্কর আনমনে ক্রমাগত চুরুটের ধোঁয়া ছাড়িতে লাগিল।

চারশ' বৎসর আগে আর একদিন সন্ধ্যায় গ্রামনদীকূলবর্তী এই মাঠের উপর এমনি চাঁদ উঠিয়াছিল। তখন যুদ্ধ শেষ হইয়া গিয়া সমস্ত মাঠে ভয়াবহ শান্তি থমথম করিতেছে। চাঁদের আলোয় স্তব্ধ রণভূমির প্রান্তে জানকীরামের জ্ঞান ফিরিল। দূরে গড়ের প্রাকারে সহস্র সহস্র মশালের আলো···আকাশ চিরিয়া শত্রুর অশ্রান্ত জয়োল্লাস···দুই হাতে ভর দিয়া অনেক কষ্টে জানকীরাম উঠিয়া বসিয়া তাঁহারই অনেক আশা ও ভালবাসার নীড় ঐ গড়ের দিকে চাহিতে চাহিতে অকস্মাৎ দুই

চোখ ভরিয়া জল আসিল। ললাটের রক্তধারা ডান হাতে মুছিয়া ফেলিয়া পিছনে তাকাইয়া দেখিলেন, কেবল কয়েকটা শিয়াল নিঃশব্দে শিকার খুঁজিয়া বেড়াইতেছে—কোন দিকে কেহ নাই…

সেই সময়ে ওদিকে অন্দরের বাতায়নপথে তাকাইয়া মালতীমালাও চমকিয়া উঠিলেন, তবে কি একেবারেই— ? অবমানিত রাজপুরীর উপরেও গাঢ় নিঃশব্দতা নামিয়া আসিয়াছে। দাসী বিবর্ণমুখে পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। মালতীমালা আয়ত কালো চোখে তাহার দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন, শেষ ?

খবর আসিল, গুপ্তদ্বার খোলা হইয়াছে, পরিজনেরা সকলে বাহির হইয়া যাইতেছে।

দাসী বলিল, বউমা, উঠুন—

বধূ বলিলেন, নৌকা সাজানো হোক।

কেহ সে কথার অর্থ বুঝিতে পারিল না। নদীর ঘাটে শত্রুর বহর ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, সে সন্ধানী-দৃষ্টি ভেদ করিয়া জলপথে পলাইবার সাধ্য কি।

মালতীমালা বলিলেন, নদীর ঘাটে নয় রে, দীঘির ময়ূরপঙ্খী সাজাতে হুকুম দিয়েছি। খবর নিয়ে আয় হল কি না—

সেদিন সন্ধ্যায় রাজোদ্যানে কনকচাঁপা গাছে যে ক'টি ফুল ফুটিয়াছিল তাড়াতাড়ি সেগুলি তুলিয়া আনা হইল, মালতীমালা লোটন-খোঁপা ঘিরিয়া তার কতকগুলি বসাইলেন, বাকিগুলি আঁচল ভরিয়া লইলেন। সাধের মুক্তাফল দুটি কানে পরিলেন, পায়ে আলতা দিলেন, মাথায় উজ্জ্বল সিঁদুর পরিয়া কত মনোরম রাত্রির ভালবাসার স্মৃতি-মণ্ডিত ময়ূরপঙ্খীর কামরার মধ্যে গিয়া বসিলেন।

নৌকা ভাসিতে ভাসিতে অনেক দূর গেল। তখন বিজয়ীরা গড়ে ঢুকিয়াছে, দীঘির পাড় দিয়া দলে দলে রক্তপতাকা উড়াইয়া জনমানবশূন্য প্রাসাদে ঢুকিতে লাগিল। সমস্ত পুরবাসী গুপ্তপথে পলাইয়াছে।

বিশ-পঁচিশটি মশালের আলো দীঘির জলে পড়িল।

ধর, ধর নৌকো—

মালতীমালা তলির পাটাখানি খুলিয়া দিলেন। দেখিতে দেখিতে

দীর্ঘ মাস্তুলটিও নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল। নৌকা কেহ ধরিতে পারিল না, কেবল কেমন করিয়া কোন ফাঁক দিয়া জলের উপর ভাসিয়া উঠিল আঁচলের চাঁপাফুল কয়েকটি—

তারপর ক্রমে রাত্রি আরো গভীর হইয়া গড়ের উঁচু চূড়ার আড়ালে চাঁদ ডুবিল। আকাশে কেবল উজ্জ্বল তারা কয়েকটি পরাজিত বিগত-গৌরব ভগ্নজানু জানকীরামের ধূলিশয্যার উপর নির্নিমেষ দৃষ্টি বিসারিত করিয়াছিল। সেই সময়ে কে-একজন অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়া অতি সন্তর্পণে আসিয়া রাজকুমারকে ধরিয়া তুলিল।

চলুন, প্রভু—

কোথা?

বটতলায়। ওখানে ঘোড়া রেখেছি, ঘোড়ায় তুলে নিয়ে চলে যাব।

গড়ের আর আর সব?

বিশ্বস্ত পরিচালক গড়ের ঘটনা সব কহিল। বলিল, কোন চিহ্ন নেই আর জলের উপরে কনকচাপা ছাড়া—

কই? বলিয়া জানকীরাম হাত বাড়াইলেন। বলিলেন, আনতে পার নি? ঘোড়ায় তুলে দিতে পার আমায়? দাও না আমায় তুলে দয়া করে—আমি একটা ফুল আনব শুধু—

নিষেধ মানিলেন না। খটখট খটখট করিয়া সেই অন্ধকারে উত্তরমুখো বাতাসের বেগে ঘোড়া ছুটিল। সকালে দেখা গেল, পরিখার মধ্যে যেখানে আজকাল ধান হইয়া থাকে—জানকীরাম পড়িয়া মরিয়া আছেন, ঘোড়ার কোন সন্ধান নাই।

সেই হইতে নাকি প্রতিরাত্রে এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটিয়া আসিতেছে। রাত দুপুরে সপ্তর্ষিমণ্ডল যখন মধ্য-আকাশে আসিয়া পৌঁছে, আশপাশের গ্রামগুলিতে নিষুপ্তি গাঢ়তম হইয়া উঠে, সেই সময়ে রাতের পর রাত ঐ গভীর নির্জন জঙ্গলের মধ্যে চারশ' বছর আগেকার সেই রাজবধূ পদ্মদীঘির হিম-শীতল অতল জলশয্যা ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়ান। ভাঙা ঘাটের সোপান বহিয়া বিড়ালআঁচড়ার গভীর কাঁটাবন দুই হাতে ফাঁক করিয়া সাবধানে লঘু চরণ ফেলিয়া তিনি ক্রমশ আগাইতে থাকেন।

তবু বনের একটানা ঝিঁঝির আওয়াজের সঙ্গে পায়ের নূপুর ঝুন-ঝুন করিয়া বাজিয়া উঠে, কুঙ্কুমে-মাজা মুখ…গায়ে শ্বেতচন্দন-আঁকা… সিঁথায় সেই চার শতাব্দী আগেকার সিঁদুর-লাগানো…পায়ে রক্তবরণ আলতা, অঙ্গের চিত্র-বিচিত্র কাঁচলি ও মেঘডম্বুর শাড়ি হইতে জল ঝরিয়া ঝরিয়া বনভূমি সিক্ত করে বনের প্রান্তে আমের গুঁড়ি ঠেস দিয়া দক্ষিণের মাঠে তিনি তাকাইয়া থাকেন…

আবার বর্ষায় যখন ঐ গড়খাই কানায় কানায় একেবারে ভরিয়া যায়, ঘোড়া তখন জল পার হইয়া বনের সামনে পৌছিতে পারে না, মালতীমালা সেই কয়েকটা মাস আগাইয়া ফাঁকা মাঠের মধ্যে আসিয়া দাঁড়ান। দুধসর ধানের সুগন্ধি ক্ষেতের পাশে পাশে ভিজা আ'লের উপর হিম-রাত্রির শিশিরে পায়ের আলতার অস্পষ্ট ছোপ লাগে, চাষারা সকালবেলা দেখিতে পায়, কিন্তু রোদ উঠিতে না উঠিতে সমস্তই নিশ্চিহ্ন হইয়া মিলাইয়া যায়…

চুরুটের অবশিষ্টটুকু ফেলিয়া দিয়া শঙ্কর উঠিয়া দাঁড়াইল। মাঠের ওদিকে মুচিপাড়ায় পোয়ালগাদা, গোড়োঘর, নূতন-বাঁধা গোলাগুলি কেমন বেশ শান্ত হইয়া ঘুমাইতেছে। চৈত্রমাসের সুশুভ্র জ্যোৎস্নায় দূরের আবছা বনের দিকে চাহিতে চাহিতে চারিদিককার সুপ্তিরাজ্যের মাঝখানে বিকালের দেখা সেই সাধারণ বন হঠাৎ অপূর্ব রহস্যময় ঠেকিল। ঐখানে এমনি সময়ে বিস্মৃত যুগের বধূ তাকাইয়া আছে, নায়ক তীরবেগে ঘোড়া ছুটাইয়া সেই দিকে যাইতেছে, কিছুই অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। মনে হয়, সন্ধ্যাকালে ওখানে সে যে অচঞ্চল নিষ্ক্রিয় ভাব দেখিয়া আসিয়াছে, এতক্ষণ জঙ্গলের সে রূপ বদলাইয়া গিয়াছে, মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি আজও যাহা আবিষ্কার করিতে পারে নাই, তাহারই কোন একটা অপূর্ব ছন্দ-সঙ্গীতময় গুপ্তরহস্য এতক্ষণ ওখানে বাহির হইয়া পড়িয়াছে।

সঙ্গে সঙ্গে তার সুধারাণীর কথা মনে পড়িল—সে যা-যা বলিত, যেমন করিয়া হাসিত, রাগ করিত, ব্যথা দিত, প্রতিদিনকার তুচ্ছাতিতুচ্ছ সেই সব কথা। ভাবিতে ভাবিতে শঙ্করের চোখে জল আসিয়া

পড়িল। জাগরণের মধ্যে স্পষ্ট প্রত্যক্ষ হইয়া কোনদিন সে আর আসিবে না !···ক্রমশ তাহার মনে কারণ-যুক্তিহীন একটা অদ্ভুত ধারণা চাপিয়া বসিতে লাগিল। ভাবিল, সে দিনের সেই সুধারাণী, তার হাসি চাহনি, তার ক্ষুদ্রহৃদয়ের প্রত্যেকটি স্পন্দন পর্যন্ত এই জগৎ হইতে হারায় নাই—কোনখানে সজীব হইয়া বর্তমান রহিয়াছে, মানুষে তার খোঁজ পায় না। ঐ সব জনহীন বনে-জঙ্গলে এইরূপ গভীর রাত্রে একবার খোঁজ করিয়া দেখিলে হয়। শঙ্কর ভাবিতে লাগিল, কেবল মালতীমালা সুধারাণী নয়, সৃষ্টির আদিকাল হইতে যত মানুষ অতীত হইয়াছে, যত হাসিকান্নার ঢেউ বহিয়াছে, যত ফুল ঝরিয়াছে, যত মাধবী রাত্রি পোহাইয়া গিয়াছে, সমস্তই যুগের আলো হইতে এমনি কোথাও পলাইয়া রহিয়াছে। তন্দগত হইয়া যেই মানুষ পুরাতনের স্মৃতি ভাবিতে বসে, অমনি গোপন আবাস হইতে তারা টিপি-টিপি বাহির হইয়া মনের মধ্যে ঢুকিয়া পড়ে। স্বপ্নঘোরে সুধারাণী এমনি কোনখান হইতে বাহির হইয়া আসিয়া কত রাতে তার পাশে আসিয়া বসিয়াছে, ঘুম ভাঙিলে আবার বাতাসে মিলাইয়া পলাইয়া গিয়াছে।··

বটতলায় বটের ঝুরির সঙ্গে ঘোড়া বাঁধা ছিল, ঐখানে আপাতত আস্তাবলের কাজ চলিতেছে, পৃথক ঘর আর বাঁধা হয় নাই। নিজে নিজেই জিন কষিয়া স্বপ্নাচ্ছন্নের মতো শঙ্কর ঘোড়ার পিঠে চড়িয়া বসিল। ঘোড়া ছুটিল। সুপ্ত গ্রামের দিকে চাহিয়া চাহিয়া অনুকম্পা হইতে লাগিল—মূর্খ তোমরা, জঙ্গলের বড় বড় কাঁঠালগাছগুলাই তোমাদের কেবল নজরে পড়িল এবং গাছ মারিয়া তক্তা কাটাইয়া দু-পয়সা পাইবার লোভে এত মোকর্দমা-মামলা করিয়া মরিতেছ। গভীর নিঝুম রাত্রে ছায়ামগ্ন সেই আম কাঁঠাল-পিত্তিরাজের বন, সমস্ত ঝোপ-ঝাড়-জঙ্গল, পদ্মদীঘির এপার-ওপার যাদের রূপের আলোয় আলো হইয়া যায়, এতকাল পাশাপাশি বাস করিলে—একটা দিন তাদের খবর লইতে পারিলে না !

গড়খাই পার হইয়া বনের সামনে আসিয়া ঘোড়া দাঁড়াইল। একটা গাছের ডালে লাগাম বাঁধিয়া শঙ্কর আমিনদের সেই জঙ্গল-কাটা সঙ্কীর্ণ পথের উপর আসিল। প্রবেশ-মুখের দুইধারে দুইটি অতিবৃহৎ শিরীষ

গাছ, বিকালে ভজহরির সঙ্গে কথায় কথায় এসব নজরে পড়ে নাই, এখন বোধ হইল মায়াপুরীর সিংহদ্বার উহারা। সেইখানে দাঁড়াইয়া কিছুক্ষণ সে সেই ছায়াময় নৈশ বনভূমি দেখিতে লাগিল। আর তাহার অণুমাত্র সন্দেহ রহিল না, মৃত্যু-পারের গুপ্ত রহস্য আজি প্রভাত হইবার পূর্বে ঐখান হইতে নিশ্চয় আবিষ্কার করিতে পারিবে। আমাদের জন্মের বহুকাল আগে এই সুন্দরী পৃথিবীকে যারা ভোগ করিত, বর্তমান কালের দুঃসহ আলো হইতে তারা সব তাদের অদ্ভুত রীতি-নীতি বীর্য-ঐশ্বর্য প্রেম লইয়া সৌরালোকবিহীন ঐ বন রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আছে। আজ জনহীন নিশারাত্রে যদি এই সিংহদ্বারে দাঁড়াইয়া নাম ধরিয়া ধরিয়া ডাক দেওয়া যায়, শতাব্দীপারের বিচিত্র মানুষেরা অন্ধকারের যবনিকা তুলিয়া নিশ্চয় চাহিয়া দেখিবে।

কয়েক পা আগাইতে অসাবধানে পায়ের নিচে শুকনা ডালপালা মড়মড় করিয়া ভাঙিয়া যেন মর্মস্থানে বড় ব্যথা পাইয়া বনভূমি আর্তনাদ করিয়া উঠিল। স্থির গভীর অন্ধকারে নিশিরীক্ষ সান্ত্রিগণ তাহাকে বাক্যহীন আদেশ করিল, জুতা খুলিয়া এস—

শুকনা পাতা খসখস করিতেছে, চারিপাশে কত লোকের আনাগোনা। জ্যোৎস্নার আলো হইতে আঁধারে আসিয়া শঙ্করের চোখ ধাঁধিয়া গিয়াছে বলিয়াই সে যেন কিছু দেখিতে পাইতেছে না। মনের ঔৎসুক্যে উদ্বেগাকুল আনন্দে কম্পিত হস্তে পকেট হইতে তাড়াতাড়ি সে টর্চ বাহির করিয়া জ্বালিল।

জ্বালিয়া চারিদিক ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখে—শূন্য বন। বিশ্বাস হইল না, বারম্বার দেখিতে লাগিল। আর একটা দিনের ব্যাপার শঙ্করের মনে পড়ে। দুপুরবেলা, বিয়ের কয়েকটা দিন পরেই সুধারাণী ও আর কে কে তার নূতন দামি তাসজোড়া লইয়া চুরি করিয়া খেলিতেছিল। তখন তার আর এক গ্রামে নিমন্ত্রণে যাইবার কথা সন্ধ্যার আগে ফিরিবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু কি গতিকে যাওয়া হইল না। বাহির হইতে খেলুড়েদের খুব হৈ চৈ শোনা যাইতেছিল, কিন্তু ঘরে ঢুকিতে না ঢুকিতে সকলে কোন দিক দিয়া কি করিয়া যে পলাইয়া গেল—শঙ্কর দেখিয়াছিল, কেবল তাসগুলি বিছানার উপর ছড়ানো

টর্চের আলোয় কাঁটাবনের ফাঁকে ফাঁকে সাবধানে দীঘির সোপানের কাছে গিয়া সে বসিল। জলে জ্যোৎস্না চিকচিক করিতেছে। আলো নিভাইয়া চুপটি করিয়া অনেকক্ষণ সে বসিয়া রহিল।

ক্রমে চাঁদ পশ্চিমে হেলিয়া পড়িল। কোন দিকে কোন শব্দ নাই, তবু অনুভব হয়—তার চারিপাশের বনবাসীরা ক্রমশ অসহিষ্ণু হইয়া উঠিতেছে। প্রতিদিন এই সময়ে তারা একটি অতি দরকারি নিত্যকর্ম করিয়া থাকে, শঙ্কর যতক্ষণ এখানে থাকিবে ততক্ষণ তা হইবে না—কিন্তু তাড়া বড্ড বেশি। নিঃশব্দে ইহারা তার চলিয়া যাওয়ার প্রতীক্ষা করিতেছে।

হঠাৎ কোনদিক হইতে হু-হু করিয়া হাওয়া বহিল, এক মুহূর্তে মর্মরিত বনভূমি সচকিত হইয়া উঠিল। উৎসবক্ষেত্রে নিমন্ত্রিতেরা এইবার যেন আসিয়া পড়িয়াছে, অথচ এদিকে কোন-কিছুর জোগাড় নাই। চারিদিকে মহা সোরগোল পড়িয়া গেল। অন্ধকার রাত্রির পদধ্বনির মতো সহস্রে সহস্রে ছুটাছুটি করিতেছে। পাতার ফাঁকে ফাঁকে এখানে-ওখানে কম্পমান ক্ষীণ জ্যোৎস্না—সে যেন মহামহিমার্ণব যারা সব আসিয়াছে, তাহাদের সঙ্গের সিপাহিসেন্যের সঙ্গিনের সুতীক্ষ্ণ ফলা। নিঃশব্দচারীরা অঙ্গুলি-সঙ্কেতে শঙ্করকে দেখাইয়া দেখাইয়া পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিল—এ কে? এ কোথাকার কে—চিনি না তো।

উৎকর্ণ হইয়া সমস্ত শ্রবণশক্তি দিয়া শঙ্কর আরও যেন শুনিতে লাগিল, কিছু দূরে সর্বশেষ সোপানের নিচে কে যেন গুমরিয়া গুমরিয়া কাঁদিতেছে। কণ্ঠ অনতিস্ফুট, কিন্তু চাপা-কান্নার মধ্য দিয়া গলিয়া গলিয়া তার সমস্ত ব্যথা বনভূমির বাতাসের সঙ্গে চতুর্দিকে সঞ্চরণ করিয়া বেড়াইতে লাগিল। অন্ধকারলিপ্ত প্রেতের মতো গাছেরা মুখে আঙুল দিয়া তাহাকে বারম্বার থামিতে ইসারা করিতেছে—সর্বনাশ করিল, সব জানাজানি হইয়া গেল!

কিন্তু কান্না থামিল না। নিশ্বাস রোধ করিয়া ঐ অতল জলতলে চারশ' বছরের জরাজীর্ণ ময়ূরপঙ্খীর কামরার মধ্যে যে মাধুরীমতী রাজবধূ সারা দিনমান অপেক্ষা করে, গভীর রাতে এইবার সে ঘোমটা খুলিয়া

বাহিরে আসিয়া নিত্যকার মতো উৎসবে যোগ দিতে চায়। যেখানে শঙ্কর পা ঝুলাইয়া বসিয়াছিল, তাহার কিছু নিচে জলে-ডোবা সিঁড়ির ধাপে মাথা কুটিয়া কুটিয়া বোবার মতো সে বড কান্না কাঁদিতে লাগিল।

তারপর কখন চাঁদ ডুবিয়া দীঘিজল আঁধার হইল, বাতাসও একেবারে বন্ধ হইয়া গেল, গাছের পাতাটিরও কম্পন নাই—কান্না তখনও চলিতেছে। অতিষ্ঠ হইয়া কাহারা দ্রুতহাতে চারিদিকে অন্ধকারের মধ্যে ঘন কালো পর্দা খাটাইয়া দিতে লাগিল—শঙ্কর বসিয়া থাকে, থাকুক—তাহাকে কিছুই উহারা দেখিতে দিবে না।

আবার টর্চ টিপিয়া চারিদিকে ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া দেখিল। আলো জ্বলিতে না জ্বলিতে গাছের আড়ালে কি কোথায় সব যেন পলাইয়া গিয়াছে, কোনদিকে কিছু নাই।

তখন শঙ্কর উঠিয়া দাঁড়াইল। মনে মনে কহিতে লাগিল আমি চলিয়া যাইতেছি, তুমি আর কাঁদিও না—লজ্জারুণা রাজবধূ, মৃণালের মতো দেহখানি তুমি দীঘির তল হইতে তুলিয়া ধর, আমি তাহা দেখিব না। অন্ধকার রাত্রি, অনাবিষ্কৃত দেশ, অজ্ঞানিত গিরিগুহা, গভীর অরণ্যভূমি এ সব তোমাদের। অনধিকারের রাজ্যে বসিয়া থাকিয়া তোমাদের ব্যাঘাত ঘটাইয়া কাঁদাইয়া গেলাম, ক্ষমা করিও—

যাইতে যাইতে আবার ভাবিল, কেবল এই সময়টুকুর জন্য কাঁদাইয়া বিদায় লইয়া গেলেও না হয় হইত। তাহা তো নয়। সে যে ইহাদের একেবারে উদ্বাস্তু করিতে এখানে আসিয়াছে। জরিপ শেষ হইয়া একজনের দখল দিয়া গেলে বন কাটিয়া লোকে এখানে টাকা ফলাইবে। এত নগর গ্রাম মাঠ ঘাটেও মানুষের জায়গায় কুলায় না—তাহারা প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিয়াছে, পৃথিবীতে বন-জঙ্গল এক কাঠা পড়িয়া থাকিতে দিবে না। তাই শঙ্করকে সেনাপতি করিয়া আমিনের দলবল যন্ত্রপাতি নক্সা কাগজপত্র দিয়া ইহাদের এই শত শত বৎসরের শান্ত নিরিবিলি বাসভূমি আক্রমণ করিতে পাঠাইয়া দিয়াছে। শাণিত খড়্গের মতো ভজহরির সেই সাদা সাদা দাঁত মেলিয়া হাসি—উৎপাত কি আমরা কম করছি হুজুর? সকাল নেই, সন্ধ্যে নেই, কম্পাস নিয়ে চেন ঘাড়ে করে

কিন্তু মাথার উপরে প্রাচীন বনস্পতিরা ভ্রকুটি করিয়া যেন কহিতে লাগিল, তাই পারিবে নাকি কোন দিন? আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া তাল ঠুকিয়া জঙ্গল কাটিতে কাটিতে সামনে তো আগাইতেছ আদিকাল হইতে, পিছনে পিছনে আমরাও তেমনি তোমাদের তাড়াইয়া চলিয়াছি। বন-কাটা রাজ্যে নূতন ঘর তোমরা বাঁধিতে থাক, পুরানো ঘর-বাড়ি আমরা ততক্ষণ দখল করিয়া বসিব।...

হা-হা-হা হা-হা তাহাদেরই হাসির মতো আকাশে পাখা ঝাপটাইতে ঝাপটাইতে কালো এক ঝাঁক বাদুড় বনের উপর দিয়া মাঠের উপর দিয়া উড়িতে উড়িতে গ্রামের দিকে চলিয়া গেল।...

বনের বাহির হইয়া শঙ্কর ঘোড়ায় চাপিল। ঘোড়া আস্তে আস্তে হাঁটাইয়া ফিরিয়া চলিল। পিছনের বনে ডালে ডালে ঝাঁক-বাঁধা জোনাকি, আমের গুটি ঝরিতেছে—তার টুপটাপ শব্দ, অজানা ফুলের গন্ধ...বারবার পিছন দিকে সে ফিরিয়া তাকাইতে লাগিল। অনেক দূরে কোথায় কুকুর ডাকিতেছে, কাহাদের বাড়িতে আকাশ-প্রদীপ আকাশের তারার সহিত পাল্লা দিয়া দপদপ করিতেছে...এইবার গিয়া সেই নিরালা তাঁবুর মধ্যে ক্যাম্প-খাটটির উপর পড়িয়া পড়িয়া ঘুম দিতে হইবে! যদি এই সময় মাঠের এই অন্ধকারের মধ্যে সুধারাণী আসিয়া দাঁড়ায়...কপালে জলজ্বলে সিঁদুর, একপিঠ চুল এলাইয়া টিপিটিপি দুষ্টামির হাসি হাসিতে হাসিতে যদি সুধারাণী ঘোড়ার লাগাম ধরিয়া সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়া দুই চোখ ভরিয়া তার দিকে তাকাইয়া থাকে...মাথার উপর তারাভরা আকাশ, কোন দিকে কেউ নাই—ঘোড়া হইতে লাফাইয়া পড়িয়া শঙ্কর তাহার হাত ধরিয়া ফেলিবে, হাত ধরিয়া কঠোর স্বরে শুনাইয়া দিবে—কি শুনাইবে সে? শুধু তাহাকে এই কথাটা জিজ্ঞাসা করিবে, কি করেছি আমি তোমার?

এই সময়ে হঠাৎ লাফ দিয়া ঘোড়া একটা আ'ল পার হইল। শঙ্করের হুঁশ হইল, এতক্ষণের মধ্যে এখনও গড়খাই পার হয় নাই—জঙ্গল বেড়িয়া ঘোড়া ক্রমাগত ধান-ক্ষেতের উপর দিয়াই চলিয়াছে। জুতা-পায়ে জোরে ঠোকর দিল, আচমকা আঘাত পাইয়া ঘোড়া ছুটিল। গড়খাইয়ের যেন শেষ নাই, যত চলে ততই ধানবন, দিক্ ভুল হইয়া

গিয়াছে, মাঠে না উঠিয়া খানবন ঘুরিয়া মরিতেছে। শঙ্করের মনে হইতে লাগিল, যেমন এখানে সে মজা দেখিতে আসিয়াছিল, ঘোড়াসুদ্ধ তাহাকে ঐ বনের সহিত বাঁধিয়া রাখিয়াছে, সমস্ত রাত ছুটিলেও কেবল বন প্রদক্ষিণ করিতে হইবে—নিষ্কৃতি নাই—গড়খাই পার হইয়া মাঠে পৌঁছান রাত পোহাইবার আগে ঘটিবে না। জেদ চাপিয়া গেল, ঘোড়া জোরে—আরও জোরে—বিদ্যুতের বেগে ছুটাইল, ভাবিল এমনি করিয়া সেই অদৃশ্য ভয়ানক বাঁধন ছিঁড়িবে। আর একটা উঁচু আ'ল, অন্ধকারে ঠাহর হইল না, ছুটিতে ছুটিতে হুমড়ি খাইয়া ঘোড়া সমেত তাহার উপর পড়িল। শঙ্করের মনে হইল, ঘোড়ার ঝুঁটি ধরিয়া তাহাকে আ'লের উপর কে জোরে আছাড় মারিল। তীব্র আর্তনাদ করিতে করিতে সে নিচে গড়াইয়া পড়িল। ঘোড়াও ভয় পাইয়া গেল, শঙ্করকে মাড়াইয়া ফেলিয়া ঝড়ের মতো মাঠে গিয়া উঠিল। শুকনা মাঠের উপর দ্রুতবেগে খুর বাজিতে লাগিল—খটখট খটখট। রাত্রির শেষ প্রহর, আকাশে শুকতারা জ্বলিতেছে। চারশ' বছর আগে যেখানে একদা জানকীরাম পড়িয়া মরিয়া ছিলেন, সেইখানে অর্ধমূর্ছিত শঙ্কর ভাবিতে লাগিল, সেই জানকীরাম কোন দিক্ হইতে আসিয়া তাহাকে ফেলিয়া ঘোড়া কাড়িয়া লইয়া উত্তর-মাঠের ওপারে রেখরা বকচরের দিকে চলিয়া যাইতেছেন। ঘোড়ার খুরের শব্দ আঁধার মাঠে ক্রমশ মিলাইয়া যাইতে লাগিল।

জলতরঙ্গ

নূতন নূতন ঘর ও গোলা বাঁধা ত্রিলোচন দাসের এক নেশা। ঘরের আর অন্ত নাই, আনাচে-কানাচে সকল জায়গায় ঘর। পৈতৃক আমলের প্রশস্ত উঠান ইদানীং এক গোলকধাঁধা হইয়া দাঁড়াইয়াছে—একবার ঢুকিয়া পড়িলে বাহির হইবার পথ পাওয়া দায়। আবার খুঁজিয়া পাতিয়া পথ নিতান্ত যদি মিলে, ত্রিলোচন অমনি আগলাইয়া আসিয়া দাড়াইবে। বলে, হুঁঃ, যাওয়া বললেই হল? ঘোড়ায় জিন দিয়ে এসে নাকি? বোসো—বোসো—তামাক খাও। চান করে একসঙ্গে বসে দুটো শাক-ভাত খাওয়া যাবে। তারপর যেও।

ফুলকুমারী ত্রিলোচনের দ্বিতীয় পক্ষের বউ। বয়স বেশি নয়—ছেলেপুলে হয় নাই আজও। তা হইলে কি হয়—সে ইতিমধ্যেই বিশ-পঁচিশটি শিশুর মা হইয়া নহা ভারিক্কি চালে চলিতে লাগিয়াছে। ত্রিলোচনের আগের সংসারের ছেলেমেয়ে দুটি—হারাণ ছোট, সে তো রাত দিন মায়ের পিছনে লাগিয়াই আছে, আর মেয়ে পটেশ্বরী—অতদূর নয় যদিচ—তবু খেলাধুলার ফাঁকে প্রায় ঘণ্টায় ঘণ্টায় একবার করিয়া তার মাকে দেখিয়া যাইতে হয়। ওদিকে ন-পিসীর দুই মেয়ে, রাণীর দু বছরের খোকা একটি, সতর মা গোলাপী—ইহাদের সব ছেলেমেয়ে। শেষরাত হইতেই এঘরে ওঘরে দুই-এক করিয়া জাগিয়া উঠিয়া শিশুরা তাদের অস্তিত্ব ঘোষণা করিতে শুরু করে। ঐ যে চলিল, সমস্ত দিন ও রাত্রি এক প্রহরের আগে ত া বিরাম নাই। মাঝে মাঝে খণ্ডযুদ্ধ চলে, ব্যাপার তুমুল হইয়া উঠিলে ফুলকুমারীকে রান্নাঘর হইতে ছুটিয়া আসিয়া পড়িতে হয়।

সে-বার কি-একটা যোগ ছিল, পাড়া ভাড়িয়া মেয়েপুরুষ সব কলিকাতায় গঙ্গাস্নানে চলিয়াছে। সকালবেলা কি কাজে ত্রিলোচন ঘরে আসিয়াছে, ফুলকুমারী চট করিয়া ঢুকিয়া দরজা ভেজাইয়া দিল। রান্না করিতেছিল, আগুনের তাপে মুখ লাল। একটু হাসিয়া বলিল, একটা কথা বলব?

কি ?

রাখ তো বলি। নইলে মিছিমিছি—

তারপর স্বামীর মুখের দিকে তাকাইয়া চোখ বড় বড় করিয়া কৌতুকভরা সুরে কহিল, বল দিকি কেমন ? যদি বলতে পার বুঝব তবে—

ত্রিলোচন গবেষণা করিয়া কহিল, কাঁচা লঙ্কা এনে দিতে হবে বোধ হয়।

ঐ তোমার কথা। তোমার কেবল সংসার সর্বস্ব। বধূ খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। একটু পরে গম্ভীর হইয়া বলিল, দেখ, সংসারের কচকচি নিয়ে আছি তো রাতদিন। পরকালের একটু কাজ করে আসি। মোক্ষদা-দিদি বলছিল, বউ, চল্ না কেন, একটা ডুব দিয়ে আসবি।

ত্রিলোচন কহিল, খুব একটা সহজ বুদ্ধি বলে দিতে পারি।

ফুলকুমারী উৎসুক চোখে চাহিয়া আছে। ত্রিলোচন বলিতে লাগিল, একটা ডুব বইতো নয়। যোগের দিন 'জয়গঙ্গা' বলে এই ভুধমতীতেই নেমে পোড়ো। কোথাও যেতে হবে না, কোন হাঙ্গাম পোয়াতে হবে না···ওই ভাল —

বধূ বলে, ঐ নোনা গাঙ হল তোমার গঙ্গা ?

'শত যোজন দূরে থাকি যদি গঙ্গা বলে ডাকি—' নোনা গাঙ— তা কি হয়েছে ! বলিতে বলিতে ত্রিলোচনের কণ্ঠ গম্ভীর হইয়া উঠিল। বলিতে লাগিল, হলই বা নোনা গাঙ—তিন সন্ধ্যে আমাদের অন্ন যোগাচ্ছে। দেখে এসোগে একবার ঐ কুশখালি-ন'হাটা অঞ্চলে। এক কোশ দু-কোশ সব মাঠ পড়ে রয়েছে—এক চিটে ধান নেই— বর্ষায় অথই জলে তলিয়ে থাকে। গাঙ নেই, তাই জল নিকেশ হয় না। বউ, ঐ ভুধমতী আমাদের গঙ্গা—মা গঙ্গা—খাইয়ে-দাইয়ে বাঁচিয়ে রাখছে। ওকে ঘেন্না কোরো না।

ফুলকুমারী মুখ ঘুরাইয়া বলে, তাই বলছি বুঝি ? খালি কথা ঘোরানো তোমার। আমি ওদের সঙ্গে যাব কলকাতা। দুটো ভাল-মন্দ দেখব শুনব—একটু হাঁপ ছেড়ে বেড়াব। রাত-দিন হাঁড়ি-বেড়ি ঠেলতে পারি নে তোমার।

আয়োজন চলিতে লাগিল। ফুলকুমারীর স্ফূর্তির অবধি নাই। কাজের একটু ফাঁক পাইলেই এটা-সেটা গোছাইয়া মোট বাঁধে। মোটঘাটের পাহাড় হইতে লাগিল। রকম দেখিয়া ত্রিলোচন কহিল, ব্যাপার কি বউ? পুরোদিস্তুর একটা সংসার নিয়ে চলেছ—পাকাপাকি গঙ্গাবাস করবার মতলব নাকি?

ফুলকুমারী কথা গায়ে পড়িতে দিবার মেয়ে নয়। বলিল, মন্দ কি? সংসার, স্বামী, ছেলেপুলে—সমস্ত সাধ তো ভগবান পুরোলেন। আমার মতো ভাগ্যি কার? এসো না, বুড়োবুড়ি দু-জনে গঙ্গাতীরে থেকে পরকালের কাজ করি গে—

ত্রিলোচন সভয়ে চক্ষু কপালে তুলিয়া কহিল, মা গঙ্গা মাথায় থাকুন। বাপ রে বাপ! অঘ্রাণ মাসে পিসির বাড়ি গিয়ে শেষে একটা বেলাতেই পাগল হয়ে যাই আর কি! চারিদিক চুপচাপ, কি রকম যেন! মনে হচ্ছিল, কে যেন বুকের উপর বিশমনি পাথর চাপিয়েছে।

ফুলকুমারী যেন কত মুরুব্বি! তেমনি ভাবে কহিল, সত্যি—বড্ড বেশি মায়া তোমার। আমি তো অবাক হয়ে যাই। দুপুরবেলা নন্দ এসে চুল টানবে, পটু বুকের উপর ঝাঁপাবে, খোকা আগডুম-বাগডুম বকবে, তিনু টুনি সব দল বেঁধে ঘরের মধ্যে কানামাছি শুরু করবে, তবে বাবুর ঘুম আসবে। আচ্ছা এক অভ্যেস করেছ কিন্তু—

ত্রিলোচন কহিল, ও বিষয়ে তুমি একেবারে পরমহংস—মায়ামমতা মোটে নেই। সবাই কি অমন পারে? কিন্তু বউ, তা যেন হল। তোমার নন্দ পটু ওদের চুল টেনে কি আগডুম-বাগডুম বকে সত্যি সত্যি তো পেট ভরবে না! তার ব্যবস্থা কি করে যাবে শুনি?

একটা কিছু হবে নিশ্চয়। বলিয়া বধূ আড়চোখে চাহিয়া স্বামীর মুখভাবটা দেখে, আর মুখ টিপিয়া হাসে। বলে, তুমি রইলে কি করতে তবে? ওদের খাওয়াবে, নাওয়াবে, নিয়ে শোবে—আর—আর ঘেন্না করলে ছেলে মানুষ করা যায় না গো—সমস্ত করতে হবে। আর শুনে নাও ভাল করে। পটুর সর্দি কসেছে, ওর ভাত বন্ধ—যদ্দিন না সারে, দুধ-সাগু। টাবাণ পেটরোগা, ওর দুধে জল মিশিয়ে দিও। নন্দর একবেলা ভাত, একবেলা খই। মাছ-টাছ গুচ্ছেরখানেক কেউ যেন

না খায়—বায়না ধরলে খুব কসে তাড়া দিও। সমস্ত মনে থাকবে তো? কি বল?

ত্রিলোচন মহা উৎসাহে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, খুব খুব! এ আর বেশি কথা কি? হারাণের দুধ-খই, নন্দর দুধ-সাগু, পটু মাছ খাবে না সে সব ঠিক আছে, কিছু ভেব না বউ। কিন্তু রাত পোহালে তোমার বাড়িতে আরও খানপঞ্চাশেক পাতা পড়ে, তাদেরও কি ঐ রকম ব্যবস্থা?

ফুলকুমারী হাসি চাপিয়া বলিল, ঠিক ঐ রকম। যাক দুর্ভাবনা ঘুচল আমার।

ত্রিলোচন কহিল, কিন্তু আমার ঘুচবে না। আমায় ফেলে গেলে রাত-দিন বসে বসে ভাবব—পথ তো মোটে সুবিধের নয় কিনা। খাল দিয়ে, গাঙ দিয়ে, রেলগাড়ি দিয়ে—বিচ্ছিরি।

মুখ ঘুরাইয়া বধূ বলিল, ওঃ, ভাবনার কি পার আছে! গাঙের পথ স্টেশন অবধি। আর রেলগাড়িতে পুরো একটা বেলাও লাগে না—

ত্রিলোচন বলিতে লাগিল, আহা, খবর তো রাখ না। দুধমতীতে নতুন পুল হয়েছে—গুমগুম করে গাড়ি তার ওপর দিয়ে চলে যাবে। ঝুপ করে তোমার গাড়িখানা যদি ছিঁড়ে পড়ে গাঙের জলে! কিংবা ধর, তুমিই যদি গাড়ির জানলা দিয়ে যাও পড়ে—

বধূ কিন্তু ভয় পায় না, ফিক করিয়া হাসিয়া ফেলে। বলে মুশকিল তা হলে তোমার বটে! আবার ছাঁদনাতলায় গিয়ে নতুন শালী শালাজের ঠোনা খেতে হবে। না?

বলিয়া তাকাইয়া থাকে। আবার বলিয়া ওঠে, সে ভয় নেই গো। পড়ি তো ডুবব না কিছুতে, ভেসে উঠব। দুধমতী মেয়েমানুষ—আমিও। সে আসবে মেয়েমানুষের সঙ্গে লাগতে—ভয় নেই মনে মনে?

একটা মজার গল্প এ অঞ্চলের ঝি-বউ বলা-কওয়া করিয়া থাকে। গল্পটা নদীর ঐ পুলের সম্বন্ধে। সত্য হইলে, মেয়েমানুষ সম্পর্কে দুধমতীর ভয় থাকিবার কথাই বটে! লোহালক্কড়ের জালে আবদ্ধ নদী

বুকের উপর সেতুর জগদ্দল পাথর লইয়া এই বছরখানেকের মধ্যেই তার উদ্দাম তরঙ্গ বেশ শান্ত ও ভদ্রতাসঙ্গত হইয়া উঠিয়াছে। ঐ জলের বেগ কমাইতে কোম্পানি বাহাদুর জলের মতো টাকা ঢালিয়াছেন। কত লোকজন আসিয়াছিল, এপার ওপার ছাউনি করিয়াছিল, ছোট সাহেব বড়সাহেব কত আসিল, তাদের ক্লান্তিহীন অবিরাম চেষ্টা ভুধমতী বুদ্বুদের মতো একটি কলমি-ডগার মতো তীরবর্তী অসহায় বাবলা-শিশুগুলার মতো অবহেলায় ডুবাইয়া ভাসাইয়া লইয়া যাইত। শেষে তো কোম্পানি রাগিয়া খুন সাহেবের চাকরি থাকে না এমনি গতিক। হঠাৎ একদিন মেমসাহেব আসিয়া হাজির। গাছ-কোমর বাঁধিয়া মেমসাহেব নদীর পাড়ে কোন্দল করিতে আসিল, দেখি ভুধমতী, তোর আস্পর্ধা কেমন। আমার বরের চাকরি খাবি? মেমসাহেব নিজে সাহেবের পাশে থাকিয়া লোহালক্কড় বসাইতে লাগিল। ভুধমতী সেই হইতে এতটুকু। গাঙ বাঁধা হইয়া গেল। মেয়েমানুষকে পুরুষে জব্দ ··ব করিতে পারিয়াছে? মেয়ে নইলে হয় না ওসব।

রওনা হইবার আগের দিন খুব রাগ করিয়া আসিয়া ফুলকুমারী বলিল, ডিঙি তোমার কে ঠিক করতে বলেছে শুনি?

নির্বিকার কণ্ঠে ত্রিলোচন বলিল, ভেবেছিলাম, সত্যি সত্যি যাবে বুঝি। না যাও তো বল, মানা করে পাঠাই—

ফুলকুমারী কহিল, হ্যাঁ, ডিঙি মানা করে বড় দেখে পানসি ভাড়া কর গে। নন্দ যাবে, পটু যাবে, হারাণও যাবে...শোন একটা মজার কথা—কাল ন-পিসি এমনি একবার হারাণকে বলেছে, তোকে নিয়ে যাবে না কলকাতায়—ছেলের সেই থেকে মুখের ভাব যদি দেখ! কিছুতে শান্ত করতে পারি নে—

তিনু, টুনি, সন্তু —ওরাই বা দোষ করল কি বউ? ওদের নেবে না?

মুখখানি বিমর্ষ করিয়া বধূ কহিল, তাই তো ভাবছি। রাতদিন যা করে বেড়ায়—আমি টিকটিক করে মরি। না নিয়ে গেলে দেখবে কে? তোমার হাতে দিয়ে যাব ভেবেছ?

ত্রিলোচন হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, আমিও তাই বলি বউ, হয় দলশুদ্ধ

রওনা হও—নয় তো আর দিনকতক সবুর কর, ছেলেপিলে তোমার বড় হোক। কিন্তু যে রকম সব শান্তশিষ্ট—দলসুদ্ধ নিয়ে পথে ঘাটে সামলাতে পারবে তো?

ফুলকুমারী রাগিয়া উঠিল। বলিল, আমার বয়ে গেছে। আমি যাব তীর্থ করতে, সঙ্গে পল্টন নিয়ে যাব! ভারি আমার ইয়েরা কিনা! একটাকেও নেব না।

দ্রুত সে চলিয়া গেল। রাত্রে ত্রিলোচন আসিয়া খবর দিল, এই মস্ত বড় পানসি, চার টাকা আগাম দিয়ে এলাম। তোমাদের সবাইকে স্বচ্ছন্দে ধরে যাবে বউ—

ফুলকুমারীর তবু আপত্তি। বলে, উমাপদর সঙ্গে যাচ্ছি না তা বলে। ছেলেপিলে নিয়ে···ও বলে নিজেই এক ছেলেমানুষ। তোমাকে যেতে হবে।

ত্রিলোচন স্বীকার করিল, আচ্ছা।

ফুলকুমারী তবু ভাবিতে লাগিল। বলিল, সকালে উঠে তিনু-সন্তুকে গরম মুড়ি ভেজে দিই। নন্দ মুড়ি খায় না, খালি দুধ। তোমার কলকাতায় দুধ-মুড়ি পাওয়া যায় তো?

ত্রিলোচন কহিল, যায় বোধ হয়।

ফুলকুমারী কহিল, আন্দাজি বললে ছেলেপিলে নিয়ে যাই কোন ভরসায়? তুমি একটু খবরও নিতে পার নি? আবার মুশকিল এমনি, পটুটার সর্দি কিছুতে যাচ্ছে না। রাস্তাঘাটে ঠাণ্ডা না লাগে।

ত্রিলোচন বলিল, গরম কাপড় গায়ে থাকবে। আর ঠাণ্ডা একটু-আধটু লাগলেই বা কি হচ্ছে? সমস্ত ঠিকঠাক, পানসির চার টাকা বায়নাও দেওয়া হয়ে গেছে—

ফুলকুমারী আগুন হইয়া উঠিল। টাকা দেওয়া হয়েছে তো কি হয়েছে? টাকার জন্যে ছেলেপিলে বিসর্জন দিয়ে আসতে পারি নে। পানসি মানা করে লোক পাঠাও—যায় টাকা, যাক গে।

ত্রিলোচন ইতস্তত করিয়া কহিল, সেটা কি ঠিক হবে বউ? বিবেচনা করে দেখ—চার-চারটে টাকা। ও তো ফেরত দেবে না।

আরও অধীর হইয়া ফুলকুমারী বলিল, টাকা আমি হাতের বাউটি

বেচে দেব। আমি যাব না, মানা করে পাঠাও। তুমি না পার তো বল, গোবিন্দকে পাঠিয়ে দিচ্ছি—

গোবিন্দ খুঁজে পাবে না।

কেন? ঘাটে গিয়ে জিজ্ঞাসা করবে।

ত্রিলোচন মাথা চুলকাইয়া বলিল, ঘাটে পানসি একখানাও নেই—

ফুলকুমারী কহিল, তাই বলি! পানসি হয়েছে—হেনো হয়েছে, তেনো হয়েছে—মিছিমিছি আমায় শাসিয়ে আসছ। আমি যাব, আর পয়সা খরচ করে তুমি করবে পানসি-ভাড়া? আ আমার কপাল! তোমার পরাণ-জেলের ঐ নড়বড়ে বিনি-পয়সার ডিঙি বলে রেখেছে নিশ্চয়। ওতে আমি যাব না, কখ্খনো যাব না—এই বলে দিলাম।

অপরাধীর ভাবে ত্রিলোচন কহিল, তা-ও হয়ে ওঠে নি বউ। পরাণ মাছ ধরতে নাবালে চলে গেছে।

জানি—জানি। এবার বধূ রাগিয়া উঠিল, আমি কোথাও যাই, সে কি তোমার ইচ্ছে? আষ্টেপিষ্টে বেঁধে রেখেছ।

ত্রিলোচন বলিল, তোমাকেও জানি তো! বায়না দিয়ে অনর্থক টাকা নষ্ট করব কেন? বেশ তো বউ, গঙ্গা শুকিয়ে যাচ্ছে না—ছেলেপিলে বড় হোক, তখন আমরা পুণ্যি করতে যাব।

নিশ্বাস ফেলিয়া বধূ কহিল, সে আর পোড়া অদৃষ্টে আছে! পায়ের এক-শ গণ্ডা বেড়ি। আমিও এই বললাম, মরুক বাঁচুক—মারামারি করে মরে যদি সবগুলো, আমি আজ থেকে তাকিয়েও দেখব না। সবাই সগ্গে বাতি দেবেন কি না!

বাড়ির দক্ষিণে পুকুর ও নারিকেল-বাগান, তারপর ডিস্ট্রিক্ট-বোর্ডের রাস্তা, তার ওদিকে দিগন্তবিসারী বিল। ঐ বিলের মধ্যে ত্রিলোচনের জোতজমি সমস্ত। বিলের এক দিকে মধুমতী, আর এক দিকে খাল। বেশ চলিতেছিল, হঠাৎ ঐ খালের গতিকে সব উল্টা হইয়া দাঁড়াইল। খালের কি হইল, মানুষের সঙ্গে যেন আড়ি দিতে লাগিয়া গেল। আষাঢ়-শ্রাবণে ধান দেখিয়া চক্ষু জুড়ায়, শ্যামল চিক্কণ বড় বড় গোছা…

যেদিকে তাকাও বিলের কোনখানে ফাঁক নাই। কোটালের মুখে হঠাৎ এক সাংঘাতিক খবর পাওয়া গেল, খালের জল অসম্ভব রকম বাড়িয়াছে, সেদিকের বাঁধ কিছুতে রাখা যাইতেছে না। খালের পার্শ্বে পেরেক-আঁটা জারুল কাঠের প্রকাণ্ড কবাট ফেলা থাকে, বর্ষার জলে বিল বেশি ভরিয়া গেলে ভাঁটার সময় কবাট তুলিয়া দেওয়া হয়। বাড়তি জল সরিয়া বিলের জল ভুধমতীতে বহিয়া দিতেছে। হঠাৎ সে যে মাথা চাড়া দিয়া উঠিয়া বিদ্রোহ করিয়া বসিবে, এ অঞ্চলের দশটা গ্রামের লোক এমন কথা কোন দিন স্বপ্নেও ভাবে নাই।

ত্রিলোচন ছুটিয়া জমিদারের কাছারি চলিল। প্রজাপাটক সকলেই ছুটাছুটি লাগাইয়াছে। খবর মিথ্যা নয়। নায়েব কাছারিতে নাই, খালের ধারে দাঁড়াইয়া থাকিয়া বাঁধে মাটি ফেলার তদারক করিতেছেন। এদিকে বিলের জল ওদিকে খালের জল বাঁধের গায়ে ছলছল করিয়া আঘাত করিতেছে, সুবিপুল জলরাশির মধ্যে সামান্য একটি রেখার মাত্র ব্যবধান। কাছাকাছি মাটি কোথাও নাই, অনেক দূর গ্রামের দিক হইতে মাটি কাটিয়া নৌকা বোঝাই করিয়া বাঁধে ফেলা হইতেছে। দিনভর জলকাদার মধ্যে নায়েবের সঙ্গে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ত্রিলোচন বাড়ি ফিরিল। গভীর ঘুম আসিয়াছিল, রাত্রের খবর কিছুই জানে না। সকালে উঠিয়া দেখে, নারিকেল-বাগানে জল। পুকুর ডুবাইয়া ডিষ্ট্রিক্ট-বোর্ডের রাস্তার উপর দিয়া জলস্রোত একেবারে বাহিরের উঠান অবধি ধাওয়া করিয়াছে। বাঁধের কোথাও চিহ্নমাত্র নাই, বন্যার জলে সমস্ত একাকার।

ক্ষেতে সে বছর এক চিটাও মিলিল না। বছর ঘুরিতে পঞ্চম গোলাটার তলা অবধি নিঃশেষ হইল। জমিদারের তরফ হইতে চেষ্টার ত্রুটি নাই। খাল হইতে রশি দুই সরিয়া আসিয়া পর পর দুই সারি নূতন করিয়া বাঁধ দেওয়া হইল। ফসলও হইয়াছে মন্দ নয়। কিন্তু বর্ষার মাঝামাঝি আবার সেই বিপদ। বাঁধ ভাসিয়া ক্ষেতের মধ্যে নোনাজলের তুফান ওঠে। তারপর জল সরিতে আরম্ভ করে, ধানের চারাও লাল হইয়া মাটিতে পড়িয়া যায়। নায়েব নিশ্বাস ফেলিয়া বলেন, সমস্ত কলিকালের ফল রে বাবা—বামুন কায়েত কৈবর্ত সব এক মানুষে বলে

হুঁকো টানছে—এক বেঞ্চিতে রেলগাড়ি চেপে কাঁহা-কাঁহা মুলুক করে বেড়াচ্ছে—হবে না ? আরও কত হবে !

তা বলিয়া খাজনা মাপ হয় না—নায়েব হাঁ-হাঁ করিয়া ওঠেন। ও কথা বোলো না বাবারা, ও কি একটা কথার মতো কথা ? মালেকের মাল খাজনা—বলি, বিঘেয় যখন তিন কাহন করে ফলত, খাজনা কি তখন বেশি দিতে ? বরঞ্চ দু-দশ দিনের সময় ··কিন্তু তা-ও তো —

ঐ কিন্তুটিও বড় সহজ নহে, কিন্তুর সমস্যা মিটাইতে সিকি বছরের খাজনা চলিয়া যায়। তাই করিয়া কেহ কেহ কিছু সময় লইল। ত্রিলোচনের গোলার তলায় তখনও ধান আছে। রাগে রাগে বাড়ি ফিরিয়া গিয়া ব্যাপারি ডাকিয়া সে গোলার চাবি খুলিয়া দিল। খাজনা শোধ হইল এক রকম।

বনবিবিতলা বাঁধের ভিতর দিকে। ভারি জাগ্রত দেবতা। গ্রামসুদ্ধ সকলে মিলিয়া বনবিবির পূজা দিল, ঢাকঢোল বাজিল, অনেক পাঁঠা পড়িল। কিন্তু বনবিবি ঠেকাইতে পারিলেন না। খাল একেবারে ক্ষেপিয়া গিয়াছে। মানুষে গাঙ বাঁধিয়া ফেলিয়াছে, দুধমতী বিশীর্ণ হইয়া যাইতেছে দিন দিন। ওদিকে পারিল না—খাল এখন সেই আক্রোশে কূল ভাঙিয়া, ধানবন ডুবাইয়া প্রমত্ত তরঙ্গাঘাতে এই দিক দিয়া প্রতিহিংসা লইতে লাগিয়াছে। পরের কোটালে দেখা গেল বনবিবিতলাতেই নৌকা চলিবার মতো হইয়াছে, টিলার উপরে হাতখানেক জলের কম নয়, দেবতার স্থান বলিয়াও খাল একটু খাতির রাখে নাই।

স্বয়ং বুড়া জমিদার চলিয়া আসিলেন। সঙ্গে সাহেবি পোষাক-পরা একজন লোক। লোকটি গাঙের ধারে ধারে ক-দিন খুব ঘোরাঘুরি করিল। শেষে ঘাড় নাড়িয়া রায় দিল, উপায় নাই। পুলে দুধমতীর স্রোত আটকাইয়াছে, স্রোত এখন খালের মুখে চলিয়াছে, খাল বড় নদী হইয়া যাইবে।

কর্তা বলিলেন, কোন উপায় নেই ?

সাহেব ভাবিয়া-চিন্তিয়া কহিল, খালের মুখে বাঁধ দিয়ে একদম খাল

বন্ধ করে দিতে পারলে হয়। তা হলে ওপারে শুঁটকির খালের দিক দিয়ে স্রোত ঘুরে যেতে পারে।

সে কি সহজ কথা?

সাহেব ঘাড় নাড়িয়া কহিল, সহজ মোটেই নয়। কাঁচা বাঁধ দিয়ে আগে জল আটকাতে হবে। শেষে চাই কি—বিশ-ত্রিশটা জয়েস্ট বসিয়ে একদম সিমেন্টের গাঁথনি…তা-ও এখন নয়, এখন ঠিক করে বলাও যাচ্ছে না কিছু। শীতকালের দিকে জল খুব কমে যাবে, তখনকার কথা—

সে যে লাখ টাকার ফের। প্রজাপাটক নিশ্বাস নিরুদ্ধ করিয়া আলোচনা শুনিতেছিল, তাহাদের দিকে ফিরিয়া হতাশ ভাবে কর্তা বলিলেন, শুনলে তো সকলে? উপায় নেই।

সন্ধ্যা গড়াইয়া গেল। একে একে সকলেই চলিয়া গিয়াছে, আছে একা ত্রিলোচন। ত্রিলোচন নাছোড়বান্দা হইয়া বলিল, উপায় আমার একটা করে দিতেই হবে। কর্তার পা ধরিতে যায়। মাতব্বর প্রজা বলিয়া সকলেই তাকে জানে, এ অঞ্চলের মধ্যে কত বড় মানী ঘর! কর্তা ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। ত্রিলোচন বলিতে লাগিল, আপনার এলাকায় আমার তিনপুরুষে দু-শ, বিঘে খামার জমি; তার উপর নিজে সে-বার আঠাশ-শ দিয়ে আঠাশ বিঘে নিয়েছি।…আপনার জমি আপনার থাকুক কর্তা, আর পারছি নে—আমি এবার অব্যাহতি চাই। গোলা খা-খা করছে, গাঁটের পয়সা গুণে কাঁহাতক খাজনা টেনে বেড়াই?

আট-দশ দিন ঘোরাঘুরি করিয়া সমস্ত জমাজমি ইস্তফা দিয়া ত্রিলোচন নির্ঝঞ্ঝাট হইয়া বসিল। বাড়িতে ইদানীং মানুষজনের ভিড় নাই, রাণী ও-বছর শ্বশুরবাড়ি গিয়াছে, তার ছেলেমেয়ে সব গিয়াছে, সেই হইতে খবরবাদও সে বিশেষ কিছু দেয় না…গোলাপি গিয়াছে, টুনিরাও গিয়াছে। অতগুলা ঘর, সমস্ত মাকড়শার জাল আর ইঁদুরের গর্তে ভর্তি, দিন অন্তর সব ঘরে একবার করিয়া ঝাঁটা দিবারও লোক নাই। বাহিরের লোকের মধ্যে রহিয়াছে এক মোক্ষদা। ত্রিলোচন বাড়ি আসিয়া চুপচাপ দাওয়ায় পা ঝুলাইয়া বসিল।

হঠাৎ মোক্ষদাকে দেখিয়া এক ধরনের হাসি হাসিয়া বলিল, সবাই সরে পড়ল। তুমি যে বড় এখনও রয়ে গেছ মোক্ষদা-দিদি, তোমায় নিতে আসবে কবে?

ম্লানমুখে মোক্ষদা কহিল, কোন্ চুলোয় কে আছে যে নিতে আসবে? যদ্দিন আছি, আমায় আশ্রয় দিয়ে রেখো—আমার ঠাঁই নেই।

ঘাড় নাড়িয়া ত্রিলোচন কহিল, বেশ, বেশ! কিন্তু একাদশী মাসে আর দুটোয় চলবে না দিদি, তা বলে দিচ্ছি। আমরাও আরম্ভ করব। পাল্লা দিয়ে এবার একাদশী চলবে।

কোথায় ছিল পটেশ্বরী, সাড়া পাইয়া বাবা—বলিয়া ঝাঁপাইয়া আসিয়া পড়িল। আদুরে মেয়ে। বলিল, তামাক খাবি বাবা?

ত্রিলোচন হাসিয়া কহিল, আন দিকি কেমন।

মেয়ে বলিল, আচ্ছা।

ঘরের মধ্যে গেল, আবার ফিরিয়া বলিল, এই নে। খালি হাত। হাসিয়া ত্রিলোচন তার হাত হইতে মিছামিছি হুঁকা লইল।

পটেশ্বরী কহিল, আর কি নিবি?

এবারে তেল আন খুকু। নাইতে যাব।

এই নাও। হাত উপুড় করিয়া খুকী বাপের হাতের উপর রাখিল। বলিল, মাখিয়ে দিই?

কচি কচি হাত দু'খানি বাপের বুকে-পিঠে বুলায়। ফুলের মতো নরম হাত। ত্রিলোচন আদর করিয়া মেয়েকে কোলে তুলিয়া লইল। ফুলকুমারী কলকেয় ফুঁ দিতে দিতে আসিল। সত্যকার ধোঁয়া উড়িতেছে, খুকীর মতো মিছামিছি নয়—ত্রিলোচন চোখ বুজিয়া তামাক টানিতে লাগিল। হাসিমুখে ফুলকুমারী বাপের কোলে মেয়ে দেখিতে লাগিল।

পটেশ্বরী বলিল, আমায় দিবি নে বাবা?

যেন চমক ভাঙিয়া ত্রিলোচন চোখ খুলিল। বলিল, কি দেব মা? তামাক?

মেয়ে মুখ বাঁকাইয়া বলিল, উঁহু! তামাক বুঝি ভাল—তামাক ছাই। হাত পাতিয়া ধরিয়া বলিল, তুই ভাত দে, ডাল দে—এই এখানে।

ত্রিলোচন ফোঁস করিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, সে দেওয়ার দিন যে ফুরিয়ে এল মা! ফুলকুমারী দেখিল, স্বামীর দু-চোখ দিয়া অশ্রুর ধারা গড়াইয়া পড়িতেছে। হঠাৎ ত্রিলোচন তার দিকে চাহিয়া বলিল, শুনেছ বউ, জমি দিয়ে এলাম—

কাকে?

দুধমতীকে, এত আক্রোশ হয়েছে যার। তারপর কান্নারই মতো হাসি হাসিয়া বলিল, মোক্ষদা-দিদির কাছে একাদশীর খবর নিচ্ছিলাম। তুমি সধবামানুষ, স্বামীর সঙ্গে মিলে মিশে একাদশী করলে খুব পুণ্যি হবে। পাঁজিতে আছে দেখো। এবারে পান্না দিয়ে পুণ্যি করা যাবে। ধান তোমার আর ক-খুঁচি আছে বউ?

বধূ ঝঙ্কার দিয়া উঠিল। ইঃ, আমার ঘরসংসারের কুচ্ছো করতে আসেন। ভয়ানক ঝগড়া হয়ে যাবে কিন্তু। বলি, চান-টান করবে না আজ? বেলা হয় না? আমারই যে খিদে পেয়ে গেল।

ফুলকুমারীর কিন্তু মনে মনে ভয় হইয়া গেল। এতটা বয়স খাটিয়া-খুটিয়া যা-কিছু করিয়াছিল, সর্বস্ব দিয়া ও বছর আঠাশ বিঘা জমি লইয়াছে। সেই নূতন জমি এবং পৈতৃক খামার-জমি—এ সব লইয়া ত্রিলোচনের আশা-ভরসার অন্ত ছিল না, সমস্ত চুকাইয়া দিয়া সে যেন এক এক দিনে দশ বৎসর বুড়া হইয়া যাইতে লাগিল। সমস্ত দিন বসিয়া বসিয়া তামাক টানে; আর বেড়াইতে যায় তো খালের ধারে—লোকালয়ের ত্রিসীমানায় নয়। গতিক দেখিয়া ফুলকুমারী কহিল, নিত্যি নিত্যি খালে গিয়ে কি হয়?

পা ধুতে যাই।

এই এক কোশ পথ হেঁটে পা ধোওয়া, পায়ের তো শখ কম নয়। কেন, গ্রামের মধ্যে কি জল মেলে না?

ত্রিলোচন বলে, বউ, দু একটা কথাবার্তাও হয় খালের সঙ্গে। বলি—রাক্ষুসী, সর্বস্ব গ্রাস করে তো আছিস,—কবে ফিরিয়ে দিবি, তাই বল। তারপর রাগ হয়ে যায়। খালের মুখে লাথি মেরে ফিরে আসি।

একদিন বধূ বড় ধরিয়া বসিল, দেখ এক কাজ করলে হয়—

উঁহু, কিছু করব না। ফুলকুমারী চুপ করিয়া গেল, ত্রিলোচন কিন্তু সপ্তমে চড়িয়া উঠিল। বলিতে লাগিল, কেন কাজ করব? চিরটা কাল কেবল কাজ আর কাজ! আর কিছু পারব না। বয়স বাড়ছে না কমছে?

হারাণ উঠানের উপর পেয়ারাতলায় হামাগুড়ি দিতে দিতে থাবা ভরিয়া পেয়ারা-পাতা মুখে পুরিল। ত্রিলোচন কহিল, দেখ, দেখ—কি খায় আবার···দেখ না গো—

খোকা কি সহজ ধন! আঁকিয়া বাঁকিয়া পলাইতে চেষ্টা করে। তারপর হাতে-নাতে ত্রিলোচন ধরিয়া ফেলিল তো মাথা নাড়িয়া কিছুতে মুখে হাত দিতে দিবে না।

বও দুষ্টু ছেলে মুখ খোল্—এই খোকা খোল মুখ, দেখি—

দুষ্ট ছেলে মিটিমিটি হাসে। তার পরে হাসিমুখে দাঁতে দাঁত চাপিয়া মুখ ঘুরায় আর বলে, নেই···নেই, নেই—

সংসার চলে। কি করিয়া চলে, সে জানেন অন্তর্যামী। আর জানে ফুলকুমারী। সে যে কোথা দিয়া কি করে—তার সংসারের খবর সে কাহাকেও বলিবে না। বছর ঘুরিয়া আসিল, অগ্রহায়ণ মাস। উঠান ফাঁকা, ধানের গাদা নাই, গোটা গ্রামের মধ্যেই ধান-পোয়ালের সম্পর্ক নাই। ত্রিলোচন দাওয়ায় বসিয়া বসিয়া তামাক খায় আর ভাবে। এই সময়ে একদিন ফুলকুমারী বলিল, দেখ, আমার কথা শোন, গোলা খা-খা করছে—ধান নিয়ে এস দিকি কতগুলো—

ঠাট্টা করিতেছে নাকি? খোঁচাইয়া পুরাণো স্মৃতি জাগাইয়া তুলিয়া তার লাভ কি? স্ত্রীর দিকে সে চাহিয়া দেখিল। চাহিলে আজকাল বড় কষ্ট হয় মনে। সর্বাঙ্গ নিরাভরণ, চোখে কালির রেখা পড়িয়াছে, মুখের হাসি কিন্তু নিভে নাই। ফুলকুমারী বলিতে লাগিল, উপায় আমি বলে দিচ্ছি। কিছু খাটনি নেই। শোন আমার কথা—

ত্রিলোচন ধরা-গলায় কহিল, খাটনি কি আমি ভয় করি বউ, না করেছি কোন দিন?

ফুলকুমারী কহিল, পান-সুপারি কিনে গামালে বেরোও—ঐ রূপগঞ্জের দিকে।

দু-জনে অনেক পরামর্শ হইল। কথাটা মন্দ নয়। রূপগঞ্জের দিকে শনির দৃষ্টি পড়ে নাই, সেখানকার আবাদে লক্ষ্মী অফুরন্ত ভাণ্ডার খুলিয়া বসিয়াছেন। এখন শীতকালে সচ্ছল গৃহস্থের ঘরে ঘরে আনন্দের বন্যা। চাষীরা যখন ক্ষেত-খামারে কাজে লাগিয়া থাকে, তখন ডালা ভরিয়া পান-সুপারি, পুঁথির মালা, ঘুনসি, কাঠের চিরুনি ও আর দশটা শৌখিন জিনিষ গ্রামের মধ্যে ফিরি করিয়া বেড়াইবার সময়। চাষা-বউরা স্বামী-শ্বশুরদের লুকাইয়া এটা-সেটা কিনিবেই। নগদ পয়সার কারবার নয়, হাতে কারও পয়সা নাই—চুরি করিয়া আঁচল ভরিয়া ধান চাল আনিয়া ফেরিওয়ালার ডালায় ঢালিয়া দিবে। এই করিয়া মোটামুটি অনেকের সংসার চলিয়া যায়।

কিন্তু ইহার মূলধনও চাই তিন-চার টাকা। ফুলকুমারী অভয় দিয়া কহিল, সে ঠিক হয়ে যাবে।

ত্রিলোচন বলিল, তা হবে। তোমার হাতে রূপোর বাউটিজোড়া আছে এখনও—

ফুলকুমারী চটিয়া কহিল, ঠিকই তো—রূপোর বাউটি আমি আর পরব না তো। ও উঠে গেছে—কেউ পরে না। আমায় তুমি সোনার বাউটি গড়িয়ে দিও, তাই পরব।

পরিবে না বলিয়াই বোধ করি সে বাউটি খুলিয়া ত্রিলোচনের কাছে ছুঁড়িয়া দিল। হাতে শাঁখা দু'টি সম্বল রহিল।

পটেশ্বরী পুতুল খেলিতেছিল। সে-ও রোখে রোখে পুতুল আনিয়া বাপের কোলে ফেলিয়া দিল। বলিল, পুতুল বেচে ফেল বাবা। আমি সোনার পুতুল খেলব।

ত্রিলোচন আর্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, বউ, তোরা মা-মেয়ে এমন শত্রুতা সাধতে লাগলি! সত্যি সত্যি আমার চোখের জল ফেলিয়ে ছাড়লি তোরা!

চলিতে লাগিল মন্দ নয়। কাজটায় লাভ আছে, আর সে অনুপাতে

খাটনি সামান্যই। দুপুরে ফিরিবার সময় ধানচালের ভারে ত্রিলোচনের কাঁধ বাঁকিয়া যায়। অনেক দিনের পরে মুখ ভরিয়া সকলের হাসি ফুটিল।

বাড়ির এককশি তফাতে থাকিতেই পটেশ্বরী কেমন করিয়া জানিতে পারে, বাবা বাবা—করিয়া দু-হাত বাড়াইয়া ছুটিয়া আগাইয়া আসে। ত্রিলোচনের রৌদ্র-কাতর মুখ পলকের মধ্যে হাসিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠে। তাড়াতাড়ি দাওয়ার উপর বোঝা নামাইয়া বলে, আয় খুকী, কোলে আয়—আসবি? খুকীর আপত্তি নাই—কিন্তু রান্নাঘর হইতে ফুলকুমারী বাহির হইয়া সব মাটি করিয়া দেয়। মেয়েকে তাড়া দিয়া বলে, সোহাগ থাক এখন। থতমত খাইয়া মেয়ে থামিয়া যায়।

ত্রিলোচন ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠে, ঐ রে—গন্ধ বেরুচ্ছে কেমন বউ, তোমার লাউয়ের ঘণ্ট ধরে গেল বুঝি! শিগ্‌গির যাও।

ফুলকুমারী ফিক করিয়া হাসিয়া ফেলে। বলে, তা যাচ্ছি, কিন্তু মেয়েকেও নিয়ে যাচ্ছি। নাওয়াতে হবে এখন—

ত্রিলোচন বলে, আমি নাওয়াব। হঠাৎ সে গম্ভীর হইয়া যায়। বলে, তোমার বড্ড কষ্ট হচ্ছে বউ, একজনের উপর সমস্ত···দু-খানা হাতের এক তিল জিরোন নেই। যা পারি, দাও না আমায় কিছু কিছু করতে। তাতে ক্ষয়ে যাব না।

ফুলকুমারী কহিল, একজন কেন? মোক্ষদা-দিদি তো আছেন। আর একা হই, যা-ই হই—তোমার কাছে তো কোনদিন নাকে কাঁদতে যাই নি কর্তামশাই? আমার সংসারে কেন তুমি কথা বলতে আসবে? কেন? ভয়ানক ঝগড়া হয়ে যাবে একদিন।

খাল আর বিল একঢালা হইয়া আছে আজকাল। কাছারির চাল ঝড়ে উড়াইয়া লইয়া গিয়াছে, নায়েব বরকন্দাজ কেহই সেখানে নাই, থাকিবার প্রয়োজনও নাই। জোয়ারের বেলা খালের জল ধাওয়া করিয়া ডিষ্ট্রিক্ট-বোর্ডের রাস্তা অবধি আসে, কোটালের মুখে কখন কখন রাস্তা ছাপাইয়া যায়। রৌদ্রালোকে অবাধ নোনাজল ঝক-ঝক করিতে থাকে, রাস্তায় দাঁড়াইয়া এখানে-সেখানে জাল ফেলিয়া পাড়ার লোক মাছ ধরিয়া থাকে। ত্রিলোচন এসব দিকে তাকাইয়াও দেখে না। সদর রাস্তা দিয়া গতায়াত ইদানীং সে এক রকম ছাড়িয়াই দিয়াছে।

পুকুর-ধারে গাবগাছের তলায় কালীঘর, পাড়ার ছেলে-মেয়েরা জুটিয়াছে, মহা সমারোহে কালীপূজার আয়োজন চলিতেছে। পটেশ্বরী হইয়াছে স্বয়ং কালী-ঠাকরুন—জিভ মেলিয়া চুপচাপ দাঁড়াইয়া আছে। পাশের বাড়ির সোনা কামার হইয়া তালের বাগুড়ায় খাঁড়া লইয়া হাড়িকাঠের সামনে প্রস্তুত, এখন একটা-কোন পাঁঠা পাইলে হয়। সমস্ত দুপুর পাঁচ-ছয় জনে মিলিয়া মাঠে ছুটাছুটি করিয়াও সত্যকার পাঁঠা ধরিতে পারে নাই। হারাণ এমনি সময়ে থপ-থপ করিতে করিতে আসিল।

দিদি, দিদি গো—

কামার চঞ্চল হইয়া উঠিল, ঐ ঐ ·· হারাণ হবে পাঁঠা—

হারাণ খুব খুশি, ঘাড় নাড়িয়া রাজি হইল। পটেশ্বরীর প্রস্তাব ভাল লাগে না। অমন সোনার মতো ভাই—পৈতা পরিয়া পুরুত হইলে বরঞ্চ মানাইত তাকে, পাঁঠা হইতে সে যাইবে কেন? ভেড়াং করিয়া গলায় কোপ মারিবে, জোরে যদি মারে তার কত ব্যথা লাগিবে·· কিন্তু মুশকিল হইয়াছে, কালী হইয়া এখন সে কথা বলে কি করিয়া? তারপর সিঁদুরের অভাবে কাদার ফোঁটা দিয়া পুরুত যখন সত্য সত্যই পাঁঠা উৎসর্গের আয়োজন করিতে লাগিল, কালীর পক্ষে আর জিভ মেলিয়া দাঁড়াইয়া থাকা চলিল না। ভাইকে লইয়া একছুটে চলিয়া গেল। আর সবাই হতভম্ব, খেলা ঐ পর্যন্ত।

সেদিন শেষ-রাত্রে আকাশ ভরিয়া তারা ঝিলমিল করিতেছে। হঠাৎ খোকা মা মা—করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। সারাদিনের শ্রমক্লান্ত ফুলকুমারী সর্বাঙ্গ এলাইয়া অঘোর ঘুম ঘুমাইতেছে, সে জাগিল না। খোকা রহিয়া রহিয়া কাঁদিতেছে। ও ঘরে মোক্ষদা জাগিয়া উঠিয়া ডাকিতে লাগিল, ও বউ, বউ! দেখ তো ত্রিলোচন, খোকা কাঁদছে কেন এত?

সকালবেলা ছেলে নীলবর্ণ হইয়া গিয়াছে, চক্ষু হইয়াছে আগুনের ভাঁটা। ক্রমশ সে ঝিমাইয়া আসিতে লাগিল, ক্ষীণ জড়িত কণ্ঠে এক-একবার বলে—জল!

মোক্ষদা হাউ-হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, কি সর্বনাশ হল রে!

বউ, খোকাকে কি খাইয়েছিলে ? কি বিষ হাতে তুলে দিয়েছিলে কালকে ?

পটেশ্বরী মুখ চুণ করিয়া ঘুরিতে লাগিল ; বাপের হাঁটু ঝাঁকাইয়া কহিল, বাবা, দাদুধন অমন করে রইল কেন ? ডাকলাম, তা উত্তর দেয় না।

এ দরজা দিয়া হারাণকে বাহির করা হইল, ওদিকে মা-মেয়ে দু-জনেই সেই বিছানা লইল। পাড়ার মানুষ-জন উঠানে দাঁড়াইয়া ত্রিলোচনকে খুব সাহস দিয়া এখন যে যার মতো সরিয়া পড়িয়াছে। আছে একলা হরিপদ। প্রবীণেরা যাইবার মুখে চোখ ঠারিয়া তাহাকেও সাবধান করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু সে গোঁয়ার-গোবিন্দ মানুষ—ফুলকুমারীর বাপের বাড়ির কি-একটা সম্পর্কও যেন ছিল, তাহাকে দিদি—বলিয়া ডাকে, কাহারও হিত কথা না মানিয়া ওলাওঠার মধ্যে সে রহিয়া গেল। পাঁচ-সাতগ্রামের মধ্যে আছে এক হোমিওপ্যাথি ডাক্তার, তিনি একবার দেখিয়া এক ফোঁটা করিয়া ঔষধ দিয়া গিয়াছেন। দিন সাতেকের মধ্যে আর ঔষধের আবশ্যক হইবে না, সাত-দিনের পর খবর দিতে বলিয়াছেন। মোক্ষদা বাহির হইতে হাতছানি দিয়া ডাকিল, হরিপদ উঠিয়া গেল।

মোক্ষদা কহিল, ভাসুরপোরা নাছোড়বান্দা—কি করি বল, তাদের সংসার অচল। আর এ অবস্থায় ত্রিলোচনকেই বা বলি কি করে ? সব সেরে-সুরে উঠুক, জিজ্ঞাসা করলে বোলো, আমি চৌগাছায় চলে গেছি।

তিক্ত কণ্ঠে হরিপদ বলিল, যাও দিদি, শিগ্‌গির চলে যাও—চৌগাছার পথ যম তো চেনে না। বিরক্ত মুখে রোগীর পাশে আসিয়া সে বসিল। ত্রিলোচন দুই হাঁটুতে মুখ গুঁজিয়া চুপচাপ বসিয়া থাকে।

দুপুরের দিকে খুব মেঘ করিয়া বৃষ্টি নামিল। ফুটা চালে ঝরঝর করিয়া জল পড়িতেছে। ত্রিলোচনের যেন সম্বিৎ নাই, উবু হইয়া এক জায়গায় বসিয়া বসিয়া ভিজিতে লাগিল। আর হরিপদ বিছানা সমেত রোগীদের সমস্ত ঘর টানিয়া টানিয়া বেড়ায়। যেখানে যায়, সেইখানেই জল। আবার সরাইয়া লইতে হয়।

বাহিরে ঢেঁকিশালের কাছে শিশুর শব পড়িয়া পড়িয়া ভিজিতেছে, আগলাইবার একটা লোক নাই।

কাঁধে ঝাঁকি দিয়া ত্রিলোচনকে হরিপদ ডাকিল, ও দাদা, শোন একটা কথা। ওঠ। উঠোনে ওটা পড়ে পড়ে ভিজছে—একটা গতি করে আসা যাক।·· তুমি এদিকে একটু নজর রাখ—আমি আসি গে—

ত্রিলোচন হরিপদর হাত আঁটিয়া ধরিয়া বলিল, একটুখানি সবুর কর ভাই। সবসুদ্ধ এক চিতেয় হয়ে যাবে। বার বার টানাটানি করতে হবে না।

ঘটিলও তাই। মানুষ-জন ডাকিয়া কাঠকুটার জোগাড় করিয়া তিনটি শব খালের ধারে শ্মশানে লইয়া যাইতে পরদিন বেলা দুপুর হইয়া গেল। ত্রিলোচন শান্তভাবে শেষ কাজ সারিয়া বাড়ি ফিরিল। খালের জলে জমি ভাসাইয়া একদিন যেমন ঘরে ফিরিয়াছিল তেমনি।

হরিপদর সাধাসাধিতে সন্ধ্যার সময় তার বাড়িতে গিয়া চারিটি ফ্যানসা ভাতও মুখে দিয়া আসিল।

মাসখানেক কাটিয়া গেল। আবার ত্রিলোচন ফিরি করিতে শুরু করিয়াছে।

পান নেবে গো, চিকি-গুয়ো?

রূপগঞ্জের দিকে যায় বটে, কিন্তু পাড়ার মধ্যে বেশিক্ষণ থাকিতে পারে না। খাল তাহাকে টানিতে থাকে। কোন-গতিকে দু-চার পয়সার বিক্রি হইলেই, পাড়া ছাড়িয়া সে খালের ধারে আসে। কূলে কূলে জোর গলায় হাঁকিয়া যায়। জলতরঙ্গ যেন তার খরিদ্দার। নিস্তব্ধ দুপুরে সমস্ত গ্রাম যখন ঝিমাইয়া পড়ে, বহু দূরের খালধার হইতে ত্রিলোচনের কণ্ঠ অস্পষ্ট ভাসিয়া আসে—

ঘুনসি চাই, আয়না চাই, পুতুল চাই, রাঙা রাঙা—আ—আ—

হরিপদ মাঝে মাঝে বলে, দাদা ওখানে হাঁক পেড়ে কাদের শোনাও?

ত্রিলোচন হাসিয়া ব্যাপারটা বুঝাইয়া দেয়। নৌকো করে

দেশ বিদেশের মানুষ যায়, জানিস ? পথ-চলতি মানুষ—তাদের কাছে দর-দাম নেই, এক পয়সার মাল চার পয়সা—বড্ড লাভের কাজ—

অবিশ্বাসের ভাবে মাথা নাড়িয়া হরিপদ বলে, ক'টাই বা যায় নৌকো ! এ্যাদ্দিনে কত বেচেছ, বল তো শুনি ?

ত্রিলোচন বলে, তুই তার জানবি কি ! ব্যবসা ধর্ আগে, তখন বুঝবি কোথায় কি মজা।

আর এক কাণ্ড হইল। হঠাৎ একদিন দেখা গেল, ত্রিলোচন লোকজন ডাকিয়া ঢেঁকিশালের চাল নামাইয়া চারিদিকের বেড়া খুলিয়া হৈ-হৈ করিয়া খালের পাড়ে চরের উপর আনিয়া ফেলিতেছে। ঝাড়ের বাঁশ কাটিয়া বুড়া একলাই দশ-বারোটা খুঁটি পুঁতিয়া ফেলিল। শুনিয়া হরিপদ আসিল। আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, গ্রাম ছেড়ে এখানে এসে কুঁড়ে বাঁধছ, মতলবটা কি বল তো দাদা ?

শোন্, তবে তোকেই বলি—। কানের কাছে মুখ আনিয়া ফিসফিস করিয়া ত্রিলোচন বলে, কাউকে বলবি নে কিন্তু। ফিরি করে বেড়িয়ে আর তেমন জুত হচ্ছে না। নতুন ব্যবসা ধরব ভাবছি। রাত্রে মাছের নৌকো খাল দিয়ে যায়, সস্তায় মাছ কিনে রাখব—সকালের বাজারে বিক্রি হবে। তুই জানিস নে হরিপদ, বড্ড লাভ এতে।

হরিপদ বলিল, এই শ্মশান ঘাটের উপরে বসে রাত্তিরে মাছের নৌকোর খোঁজ করবে ? ভূত-পেত্নীতে কোন্ দিন ঘাড় ভাঙবে তোমার।

হাসিয়া হাসিয়া বুড়া বলে, ভূত আমার পুত, পেত্নী আমার ঝি— রাম-লক্ষ্মণ মাথার উপর, করবে আমার কি ? জানিস হরিপদ, আমার কত কষ্টের জমি এই সব—ধান হয় না আজকাল, চর পড়ে গেছে। আর কিছু না হোক চরের উপর শুয়ে বসে তবু তো উশুল হবে খানিক—

হাস্যোজ্জ্বল কণ্ঠস্বর অকস্মাৎ বিষণ্ণ ও উদাস হইয়া উঠে।

চরের উপরে ত্রিলোচন পাকাপাকি বসবাস শুরু করিল। মাছের নৌকা সম্পর্কীয় কথাটা মিথ্যা নয়। দশানি বউ-মারির বিল প্রভৃতি অঞ্চলে মাছের আবাদ। মাছ-বোঝাই বিস্তর নৌকা রাত্রের জোয়ারে উজান বাহিয়া খাল দিয়া বাহির-গাঙে পড়ে, গঞ্জে সকালের বাজারে সেই মাছ বিক্রি হয়। রাত্রে ঝুড়ি হিসাবে তার কতক কিনিয়া রাখিয়া

খুচরা বেচিতে পারিলে লাভের কথাই বটে। কিন্তু তা-ও বড় সুবিধা হইল না। মাছের নৌকা সোরগোল করিয়া খাল দিয়া যখন চলিয়া যায়, ত্রিলোচনের সাড়াশব্দ পাওয়া যায় না।

ঠিক দুপুরে মণ্ডলপাড়ার গণশার বউ রাঙা শাড়ি পরিয়া ভাইয়ের সঙ্গে খালপার দিয়া বাপের বাড়ি চলিয়াছে। বউটি অল্পবয়সি—স্বভাব বড় চঞ্চল, বাপের বাড়ি চলিয়াছে, তা যেন নাচিয়া নাচিয়া চলিয়াছে। ত্রিলোচন তখন দাওয়ার খুঁটি ঠেস দিয়া মহানন্দে গোপীযন্ত্র বাজাইতেছে।

বউ একটু থমকিয়া দাঁড়াইল। উঁকি দিয়া দেখিয়া চিনিতে পারিল—সে উহার একজন খরিদ্দার। রাস্তা হইতে জিজ্ঞাসা করিল, ও বুড়ো, পান-সুপারি বেচ না আজকাল?

উঁহুঁ—বলিয়া ত্রিলোচন বাজনা রাখিয়া চট করিয়া রাস্তার উপর আসিয়া দাঁড়াইল।

বউটি বলিল, তাই দেখতে পাই নে। তা বেচ না কেন?

আর মা, সে কি হবার জো আছে? হাতের ইসারায় সে ঘরের দিকে দেখাইয়া দিল। বলিতে লাগিল, বল কেন মা, পঙ্গপালের দল—খেয়ে-দেয়ে ফেলে ঝেলে সমস্ত একাকার। সব পুঁজি খোয়া গেছে—

বউটি অত শত জানে না। অতি জীর্ণ নিঃশব্দ কুড়েখানির দিকে চাহিয়া চাহিয়া বলিল, কই, ছেলেপিলে কাউকে দেখছি না তো?

বুড়াও এদিক ওদিক চাহিয়া বলিল, ছিল সব এইখানে। কোন্‌দিকে গেছে হয়তো। একদণ্ড স্থির হয়ে থাকবার জো আছে? বল কেন মা কর্মভোগ। হঠাৎ ফিক করিয়া হাসিয়া বলিল, একটা পান দিতে পার গো ভালমানুষের মেয়ে? সঙ্গে আছে টাছে নাকি? কদ্দিন যে খাই নি সব নিয়ে পালিয়ে চলে যায়—

সধবা মানুষ—একবেলার পথ যাইতেছে, আঁচলে বাঁধা পান চুন-সুপারি সমস্তই ছিল। বউটির ইচ্ছা হইতেছিল, ঐখানে বসিয়া একটা পান সাজিয়া দেয়। সঙ্গের ভাই কিন্তু তাড়া দিয়া উঠিল, নে নে—চল্। যেতে হবে কদ্দুর, হুঁস আছে?

ত্রিলোচনের বিশুষ্ক মুখের দিকে চাহিয়া মণ্ডলপাড়ার বউটি—কী, আর তোমার খাওয়া হয়েছে বুড়ো ? হয় নি এখনও—না ?

আচ্ছা বোকা তো ! পান চাচ্ছি কেন তবে ? পেটে ভর না থাকলে ফুর্তি আসে এত ? বলিয়া ফুর্তির চোটে ত্রিলোচন একেবারে অট্টহাসি হাসিতে শুরু করিল।

রাত্রে এক-এক দিন সত্য সত্যই ভারি ফুর্তি জমিয়া আসে। ত্রিলোচনের ঘরের পাশে অনেকখানি জুড়িয়া বালুচর। জোয়ারের বেগে জল খলখল করিয়া চরের উপর লুটাইয়া পড়ে। ত্রিলোচন তখন ঘরের মধ্য হইতে হাঁকিতে থাকে, এই ! এইও ! হঠাৎ বা চিৎকার করিয়া গালি দিয়া ওঠে, ওরে হারামজাদারা ঘুমুতে দিবি নে আজ ? জলতরঙ্গ থামে না। তারপর বড় অসহ্য হইয়া উঠিলে লাঠি লইয়া বাহির হয়, উন্মাদের মতো চরের উপর জলে জলে তাড়া করিয়া বেড়ায়, যেদিকে জলোচ্ছ্বাস প্রবল হয়—লাঠি লইয়া ছুটে, আবার হি হি করিয়া হাসিতে হাসিতে লাঠি ফেলিয়া বালুর উপর লুটাইয়া পড়ে। হয়তো বা এমনি সময় দূরে মানুষের কথাবার্তা শোনা যায়, মাছের নৌকা সব আসিতেছে, কখন বা ঝুপঝাপ দাঁড় পড়ে, কখন বা গুণ টানিয়া আনায় গুণ-টানা মানুষের হাতে হেরিকেনের আলো দুলিয়া দুলিয়া চলে। ত্রিলোচন অমনি ভালমানুষ হইয়া দাওয়ায় আসিয়া বসে, হুঁকা কলিকা লইয়া তামাক সাজিতে বসে, আপন মনে গজগজ করে, চিনটা কাল এক ভাবে গেল। শুয়ে শান্তি নেই বেটারা সব জ্বালায়। দুপুর রাতেও জড়াজড়ি করে মরছে, ঘুম নেই একটু চোখে। চুপ করতে পারিস নে ওরে হারামজাদারা ?

নৌকাগুলি সরিয়া গেলে, আবার গলা চড়াইয়া চিৎকার করিয়া ওঠে, র'—জব্দ করছি ; কালই যাব রূপগঞ্জের দিকে। বলছিল তো নেত্য মোড়ল—জায়গা দিচ্ছি, এস, ঘর বাঁধ। যেমন কুকুর তেমনি মুগুর হবে তা হলে। দেখি, তখন কারে জ্বালাতন করিস ? কেঁদে পথ পাবি নে—হ্যাঁ।

জোরে জোরে টানিয়া তামাক শেষ করিয়া বিরক্ত মুখে অবশেষে বুড়া শুইয়া পড়ে। কিন্তু ঘুম আসে না।

একদিন সকালবেলা একদল পশ্চিমি কুলি অনেক ঝুড়ি-কোদাল লইয়া আসিল। সঙ্গে নায়েব-মশায় আসিয়াছেন। অনেক দিনের পর দেখা, ব্রাহ্মণ মানুষ—ত্রিলোচন গিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিল।

নায়েব বলিলেন, খবর ভাল ত্রিলোচন? আরে আরে—এ কি চেহারা হয়েছে তোমার? আবার এইখানে এসে কুঁড়ে বেঁধেছ—বলি, বাড়ির সঙ্গে বচসা হয়েছে বুঝি?

ত্রিলোচন কাঁদ-কাঁদ হইয়া বলিল, খেতে পাচ্ছি না নায়েব-মশায়।

নায়েবের মনে বড লাগিল। মনে তো আছে, এই মাতব্বর প্রজার কি প্রতাপ ছিল একদিন। সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, আর দুঃখ থাকবে না বাপু। কর্তাবাবুকে জপিয়ে-জাপিয়ে রাজি করেছি। মঞ্জুর হয়ে গেছে, খাল বাঁধা হয়ে লক-গেট হবে এখানে। আজকে ভাঁটা কখন রে?

হিসাব করিয়া দেখা গেল, ভাঁটা পড়িতে প্রায় সন্ধ্যা হইয়া যাইবে। নায়েব সঙ্গের লোকজনকে হুকুম দিলেন, বাঁশগুলো এখানে এনে জমায়েত কর্। আজকের দিনটে খোঁটা পুঁততেই যাবে। মাটি পড়বে কাল থেকে।

এদিকে নদীর পথে চুণ সুরকি ও লোহালক্কড় বোঝাই নৌকা আসিয়া জমিতে লাগিল। নৌকা খালের মধ্যে আনিয়া বাবলাগাছে বাঁধা হইল। মাটির বাঁধ দেওয়া হইয়া গেলে এসব তারপর লাগিবে।

নায়েব বলিলেন, আর ভাবনা কি ত্রিলোচন? যার যে জমি ছিল, সব জরিপ-আলবন্দি করে দেওয়া হবে। এক ছটাক এদিক-ওদিক হবে না। বাবু আমাদের সদাশিব। তিনি একেবারে লিখিত হুকুম দিয়েছেন। এই ধরো—পাঁচ-সাত মাস, তারপর লেগে যাও সবাই চাষবাসে।

চোখের উপর সে নিরম্বু খাখারি হইয়া গেল, একবাড়ি মানুষ একে একে সব মরিয়া গেল—ত্রিলোচন নিজনে কি করিত কে জানে, কিন্তু মানুষের সামনে কেহ তার চোখে এক ফোঁটা জল দেখে নাই। এতদিন পরে কি হইল—নায়েবের সামনে একেবারে সে ডুকরাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। বলিল, চাষ করব নায়েব-মশায়—খাবে কে? রাক্ষসি গাঙ জমি ফিরিয়ে দেবে, মানুষ তো ফিরিয়ে দেবে না আর।

একটা-একটা করিয়া সমস্ত কাহিনী সে বলিয়া গেল। নায়েব তামাক খাইতে খাইতে নিশ্বাস ফেলিলেন। বলিলেন, ভগবানের মার,

তুমি আমি করব কি? যাই হোক—কুছ পরোয়া নেই। খরচটা আর কি তোমায়! চল্লিশ পেরোয় নি—বিয়ে-থাওয়া কর আবার। আমি তোমার বিয়ে দিয়ে দেব। টাকা না থাকে, বিঘে দুই জমি ছেড়ে দিও। হু হু করে জমির দাম বেড়ে যাবে এখন।

ত্রিলোচন হাঁ-না—কিছু বলিল না। কাছারি-ঘরের খড় উড়িয়া গিয়াছে, বেড়া খসাইয়া লোকে ভাঙিয়া লইয়া গিয়াছে, নূতন ঘর না বাঁধা পর্যন্ত কাছারিতে গিয়া দাঁড়াইবার উপায় নাই। ত্রিলোচনের কথায় নায়েব সেই বেলাটা তার ঘরে রান্নাবান্না করিলেন। বিকালে তিনি রূপগঞ্জের এক কুটুম্বের বাড়ি চলিলেন, রাত্রিটা সেখানে কাটাইবেন। বলিলেন, এক কাজ কর ত্রিলোচন। কাছারি-টাছারি হবার তো দেরি আছে—যে ক'দিন না হচ্ছে, আমায় ছুটোছুটি করতে হবে এই রকম। দু' বেটা বরকন্দাজ এনেছি, কিচ্ছু বোঝে না—নোনা দেশে এই তারা প্রথম এল। কাজকর্ম সমস্ত তুমি দেখাশুনো কর। আমি এ সম্বন্ধে ব্যবস্থা করব।

কৃতার্থ হইয়া ত্রিলোচন ঘাড় নাড়িল।

এখন গাঙে টান বেশি নাই। ত্রিলোচন শুইয়া শুইয়া অনেক দিনের পরে আশার স্বপ্ন দেখিতে লাগিল। নাকে কেমন যেন ধানের জোলো গন্ধ আসে। ঘরের পাশে বালুচরের উপর নৈশবাতাসে ধানের পাতার শির-শির শব্দ ভাসিয়া আসে। শুইয়া শুইয়া দৃষ্টির সম্মুখে দেখে, ঘননীল ধানের সমুদ্র আবার দিগন্ত অবধি চলিয়াছে। ঠক-ঠক করিয়া তার মধ্য দিয়া তীব্র-গতিতে তাদের ডোঙা ছুটিয়াছে, কত সাপলা ফুটিয়াছে, কত কলমিফুল, শোলার ঝাড়—আ'লের উপরে ঝির-ঝির করিয়া জল যায়, খলসে-পুঁটি খলবল করিয়া উজাইয়া উঠে।... উঠান ঢাকিয়া ফেলিয়া আবার ঘর উঠিয়াছে, গোলা উঠিয়াছে। রূপার খাড়ু পায়ে বউ এঘর ওঘর করিতেছে, ন-পিসি, রাণী, তারিণী, ফুলি যে যেখানে ছিল সব আসিয়াছে, ছেলেপিলের চিৎকারে গণ্ডগোলে ঘুমাইবার আর জো থাকিল না। লাঠি-হাতে এক লাফে ত্রিলোচন ঘরের দাওয়ায় নামিয়া চেঁচাইয়া উঠিল, ওরে হারামজাদারা!

সব হারামজাদারা ভয়ে পলাইয়া গিয়াছে, নিঃশব্দ নির্জন খালের ধারে অপরূপ বিজনতায় শেষ-রাত্রি থম-থম করিতেছে। জলেরও টান নাই, কেমন যেন চুপচাপ ভাব। ত্রিলোচন হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, বড্ড যে জ্বালাতন করে মারিস, ওরে হারামজাদারা! এখনও হয়েছে কি! বাঁধ আগে হয়ে যাক, টের পাবি তখন—

কাঁচা বাঁধ শেষ হইতে হইতে আবার কোটাল আসিয়া গেল। বিকালবেলা দেখিয়া শুনিয়া নায়েব খুশি মুখে বায় দিয়া গেলেন, নাঃ—আর ভয় নেই। কাজ বাকি থাকলে ভয়ের কথা ছিল বটে! কোটালে মাটি ভাসিয়ে নিয়ে যেত। তোমার জন্যেই হল ত্রিলোচন। দিন-রাত খেটেছ, লোক খাটিয়েছ, তবেই হয়েছে। নিজের একটু ইয়ে না থাকলে, ভাড়াটে লোক দিয়ে হয় এ-সমস্ত? বাবুকে আমি লিখে দেব তোমার কথা।

বাঁধ নদীর একেবারে মোহানার কাছে। পূর্ণিমায় সেদিন নদী বড় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। সন্ধ্যাবেলা ত্রিলোচন নূতন বাঁধের উপর দিয়া ঘরে ফিরিতেছিল বাঁধের গায়ে জলতরঙ্গ কখন অপরূপ নৃত্য আরম্ভ করিয়াছে। লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি সাগরপারের শিশু-জীবন্ত, প্রাণচঞ্চল—হাসিয়া নাচিয়া বহুরূপে তাহার মন ভুলাইতে চায়। ত্রিলোচন অন্যমনস্ক হইয়া চলিয়াছিল, ঢেউ আসিয়া হঠাৎ পা ভিজাইয়া পরনের কাপড় ভিজাইয়া দিয়া খলখল করিয়া পলাইয়া গেল। ত্রিলোচন ঘাড় বাঁকাইয়া দেখিয়া হাসিতে হাসিতে বলিতে লাগিল, কেমন রে? কেমন জব্দ এবার বল দিকি, ওরে হারামজাদারা!

সে রাত্রে ত্রিলোচনের ঘুম নাই। রাত্রি বাড়িতে লাগিল, চাঁদ মাথার উপরে, চারিদিকে অতল নিঃশব্দতা—সেই অনেকদিন আগেকার পিসির বাড়ির মতো। পৃথিবীর বুকের শেষ স্পন্দনটুকুও যেন এ রাত্রে থামিয়া গিয়াছে। তার মনে কিন্তু আনন্দের পার নাই। আনন্দভরা মনে বার-বার ভাবিতেছিল—আর কি, আর তো কোন অসুবিধা রহিল না। ধানে ধানে ক্ষেত ভর্তি, গোলা ভর্তি, মানুষে মানুষে বাড়ি ভর্তি। আর ভাবনা কি? ...তারপর উঠিয়া তামাক সাজিয়া লইল, ফড়-ফড় করিয়া তামাক খাইতে লাগিল, সে কলিকা শেষ হইয়া গেল।

পায়ে পায়ে সে খালের ধারে আসিল। হো-হো করিয়া হাসিয়া গাঙ-পার অবধি শুনাইয়া শুনাইয়া সে চেঁচাইয়া বলিল, ওরে হারামজাদার দল, ভূত যে জ্বালিয়ে মারলি! থাক্ আটকা পড়ে ঐদিকে।

ঠাণ্ডা হাওয়ার শেষে শীত ধরিয়া যায়। ঘরে আসিয়া কাঁথা মুড়ি দিয়া পড়িল। মানুষ-জন নাই, হাওয়া নাই, জলের কলধ্বনি নাই— এমনি রাত্রে তো ঘুমের সুবিধা! কিন্তু ঘুম আজ কোথায় উড়িয়া গিয়াছে। সমস্ত রাত্রি ত্রিলোচন একবার ঘর—একবার খালধার করিয়া বেড়াইতে লাগিল। নিশি-পাওয়া লোকের মতো চাঁদের আলোয় খালের ধার দিয়া অনেক দূর অবধি চলিয়া যায়, আবার ফিরিয়া আসে।

তারপর হঠাৎ কি হইয়া গেল—হাওয়া ছিল না, হঠাৎ কোথা হইতে এক ঝাপট হাওয়া বহিয়া গেল, খালের জল ছল-ছল করিয়া নাচিয়া উঠিল, বাদুড়ের ঝাঁক কালো ছায়া ফেলিয়া মাথার উপর উড়িতে লাগিল। চমক ভাঙিয়া ত্রিলোচন সেই মুহূর্তে শুনিল - হু হু হু-হু— অনেক দূরের বিরামবিহীন একটা একটানা শব্দ। ঘুমের দেশে কোথায় বিপ্লব বাধিয়া গেছে, শত সহস্র মিলিয়া মাথা খোঁড়াখুঁড়ি করিতেছে— বাতাসে চাঁদের আলোয় ক্ষীণতম করুণতম কান্না। গ্রহ গ্রহান্তরের কোটি কোটি ক্রোশ পার হইয়া আসা কান্না,—নিশীথ রাত্রি নিরালা পৃথিবী মেঘহীন আকাশ একসঙ্গে গলা মিলাইয়া কাঁদিতে বসিয়াছে— মৃত্যুপুরীর কঠিন কালো কপাটের ফাঁক হইতে কান্না অনেক কষ্টে গলিয়া গলিয়া যেন বাহির হইয়া আসিতেছে। ··যে রাত্রে চাঁদ বড় উজ্জ্বল হইয়া মাথায় জাগিয়া থাকে, কিছুতে কোন রকমে চোখের পাতা এক হইতে চায় না—অনন্ত-আয়তন সৌরজগতের মধ্যে ক্লান্ত শ্লথচরণ নিঃসঙ্গ পৃথিবীর একটি মাত্র অধিবাসী—সেই ইহা শুনিতে পায় কখনও কখনও। ত্রিলোচন শুনিতে লাগিল, সমস্ত ইন্দ্রিয় উন্মুখ করিয়া অর্থ বুঝিবার চেষ্টা করিল। মাঠের পারে গাঙের ধারে কারা আসিয়া জমিয়াছে, কেউ করুণ শান্ত চোখে তাকাইয়া থাকে, কেউ মাথা নাড়িয়া ইসারা করে, কেউ হাততালি দেয়, কেউ বা অস্পষ্ট ক্ষীণ কণ্ঠে অথচ প্রাণপণ বলে ডাকাডাকি করে—

বাবা—বা-বা-গো-ও-ও-ও—

যাই।

স্বপ্নাচ্ছন্নের মতো ত্রিলোচন ছুটিল। ছুটিয়া নদীতীরে নূতন বাঁধের ধারে আসিল। জোয়ার আসিয়াছে। ভরা পূর্ণিমার প্রমত্তবেগ জোয়ার। জলতরঙ্গ অধীর আবেগে বাঁধের গায়ে মাথা ভাঙিতেছে। জনভূমি হইতে দূরে নিস্তব্ধ নদীকূলে ভয় পাইয়া তারা খালের পথে গ্রামে গিয়া ঢুকিতে চায়। কঠিন মাটি পথ দিবে না। ছুটিয়া আসিয়া লাফাইয়া এক-এক বার বাঁধ পার হইতে চায়—উঁচু বাঁধ কিছুতে পার হওয়া যায় না। বাঁধের একেবারে উপরে গিয়া ত্রিলোচন দাঁড়াইল। থালার মতো চাঁদ পশ্চিমে চলিয়াছে। অনেক বার সে ইতস্তত করিল, অনেকক্ষণ বাঁধের এপার-ওপার ঘুরিয়া বেড়াইল। তারপর এদিক-ওদিক চাহিয়া একটি মাটির চাঁই তুলিয়া ছুঁড়িয়া ফেলিল। ফিসফিস করিয়া কহিল, আয়, গুঁড়ি মেরে আয়—ওরে হারামজাদারা। সাবধান—বাঁধ ভাঙে না যেন। পারলি নে? আয়—আয়—

আর একটা—তারপর আবার, আরও—আরও—। বিশ-ত্রিশটা চাঁই ফেলিয়া দিতে আর তাহাকে কষ্ট করিতে হইল না, জলধারা পথ পাইয়া গেল। অসীম শ্রমে এতদিন ধরিয়া এত লোকে মিলিয়া বাঁধ দিয়াছে, বাঁধ ভাঙিল, গোটা অঞ্চলটা জুড়িয়া মানুষের আশা ভাঙিল, ধান বাড়ি-ঘর-দোরের সমস্ত স্বপ্ন জলস্রোতে নিঃশেষ হইয়া গেল। তারপর সে এক অদ্ভুত ব্যাপার—নন্দ আসিল, পটেশ্বরী আসিল, হারাণ তিনু টুনি সকলে আসিল, অনন্ত কাল ধরিয়া তিনু-টুনির মতো যত খোকা-খুকু নদীর জলে গিয়া রহিয়াছে—তিনুর হাত ধরাধরি করিয়া শ্মশানঘাটা হইতে তারাও সব উঠিয়া আসিল। অতল জলতল… পাতালপুরী…সাপের মাথার মাণিক চুরি গিয়াছে, তাই আলো নাই… হাজার শিশু আসিয়া হাজার হাজার বাহু দিয়া স্নেহ-বুভুক্ষু বুড়াকে চাপিয়া ধরিয়াছে, কেহ ধরিয়াছে গলা, কেহ হাত, কেহ পা…জলতরঙ্গ নাগপাশের মতো বেড়িয়া ধরিয়াছে।

ওরে হারামজাদারা, ছাড়্ ছাড়্—লাগে—

কে কার কথা শোনে? বিপুল আনন্দ-বন্যায় জলোচ্ছ্বাসে ফুটার মতো তারা বুড়াকে ভাসাইয়া লইয়া গেল।

লাল চুল

ছ' মাস ধরিয়া বিয়ের দিনই সাব্যস্ত হয় না। তারপর দিন ঠিক হইল তো গোল বাধিল জায়গা লইয়া। মোটে তখন দিন পনের বাকি, হঠাৎ নীলমাধবের চিঠি আসিল, কাজিডাঙা অবধি যাওয়া কিছুতেই হইতে পারে না, তাঁহারা বড় জোর খুলনায় আসিয়া শুভকর্ম করিয়া যাইতে পারেন।

বিয়ের ঘটক শীতলচন্দ্র বিশ্বাস। চিঠি লইয়া সে-ই আসিয়াছিল। ভিড় সরিয়া গেলে আসল কারণটা সে শেষকালে ব্যক্ত করিল। প্রতিপক্ষ চৌধুরিদের সীমানা কাজিডাঙার ক্রোশ তিনেকের মধ্যে। বলা তো যায় না, তিন ক্রোশ দূর হইতে কয়েক শত লাঠিও যদি আচমকা বিয়ের নিমন্ত্রণে চলিয়া আসে। তাহারা বরাসন হইতে বর তুলিয়া রাত্রির অন্ধকারে পাড় পাড়ি দিয়া বসিলে অজ পাড়াগাঁয়ে জল-জঙ্গলের মধ্যে কেবল নিজেদের হাত কামড়ানো ছাড়া করিবার কিছু থাকিবে না।

পাত্র জমিদারের ছেলে। জমিদারের ছেলে ঐ একটিমাত্র। অতএব এই ছ'মাস ধরিয়া যে জমিদার-বাড়ি শুভকর্মের গুরুতর আয়োজন চলিতেছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। সেই আয়োজনের সত্যকার চেহারাটা সহসা উপলব্ধি করিয়া আনন্দে মেয়ের বাপের হৃৎকম্প উপস্থিত হইল।

অথচ মিনুর মা আড় হইয়া পড়িলেন। ঐ তেইশে মেয়ের বিয়ে আমি দেবই—বার বার এই রকম গোছগাছ করে শেষকালে যে না হয় তুমি সেই বি. এ-ফেল ছেলের সঙ্গে সম্বন্ধ ঠিক করে ফেল।

কিন্তু অত বড় ঘর ও বরের লোভ ছাড়িয়া দেওয়া সোজা নয়। শেষ পর্যন্ত আবশ্যকও হইল না। শহরের প্রান্ত-সীমায় ভৈরব নদীর ধারে সেরেস্তাদার বাবু এক নূতন বাড়ি তুলিতেছিলেন। বাড়িটা তিনি কয়েক দিনের জন্য ছাড়িয়া দিতে রাজি হইলেন। সামনের ফাঁকা জমির ইট-কাঠ সরাইয়া সেখানে সামিয়ানা খাটাইয়া বরযাত্রী বসিবার

জায়গা হইল। পিছনে খাওয়ার জায়গা। যদি দৈবাৎ বৃষ্টি চাপিয়া পড়ে, তাহা হইলে দোতলার দরদালানে সত্তর-আশি জন করিয়া বসাইয়া দেওয়ার ব্যবস্থাও আছে।

বিকালে পাঁচখানা গরুর গাড়ি বোঝাই আরও অনেক আত্মীয় কুটুম্ব আসিয়া পড়িল। লগ্ন সাড়ে-আটটায়।

রাণী বলিল, মাসিমা, হিরণের বিয়ের বেলা আপনি বড্ড অন্যায় করেছিলেন। সবাইকে তাড়িয়ে দিয়ে আপনি যে জামাই নিয়ে খাওয়াতে বসবেন—সে হবে না কিন্তু।

মিনুর মা হাসিলেন।

না, সে হবে না মাসিমা। সমস্ত রাত আমরা বাসর জাগব, কোন কথা শুনব না, বলে দিচ্ছি। নয় তো বলুন, এক্ষুণি ফের গাড়িতে উঠে বসি।

রসুই-ঘরের দিকে হঠাৎ তুমুল গণ্ডগোল। বেড়ার উপরে কে জলন্ত কাঠ ঠেস দিয়া রাখিনাছিল, একটা অগ্নিকাণ্ড হইতে হইতে বাঁচিয়া গিয়াছে। সকলের বিশ্বাস, 'কাজটা বামুন ঠাকুরের।' তাই রাগ করিয়া কে তার গাঁজার কলিকা ভাঙিয়া দিয়াছে। পৈতা হাতে বারম্বার ব্রাহ্মণ-সন্তান দিব্য করিতেছিল, বিনা অপরাধে তাহার গুরু দণ্ড হইয়া গেল, অগ্নিকাণ্ডে কলিকার দোষ নাই। তিন দিনের মধ্যে কলিকা মোটে সে হাতে লয় নাই।

বেলা ডুবিয়া যাইতে শীতল ঘটক আসিয়া উঠানে দাঁড়াইল।

খবর কি? খবর কি?

শীতল কহিল, খবর ভাল। বর বরযাত্রীরা ওঁদের বাসাবাড়ি পৌঁছে গেছেন। জজবাবুর বড় মোটর এনে সাজানো হচ্ছে। ঘণ্টা-খানেকের মধ্যে এসে পড়বেন।

তারপর হাসিয়া গলা খাটো করিয়া কহিতে লাগিল, একশ' বরকন্দাজ ঘাট আগলাচ্ছে। কি জানি, কিছু বলা যায় না। আমাদের কর্তাবাবু একবিন্দু খুঁত রেখে কাজ করেন না।

মোটরের আওয়াজ উঠিতেই ধুপধাপ করিয়া আট-দশটা মেয়ে

ছুটিল তেতলার ছাতে। সকলের পিছন হইতে নিরু বলিল, যাওয়া ভাই অনর্থক। ছাত থেকে কিছু দেখা যাবে না। তার চেয়ে গোলকুঠুরির জানলা দিয়ে—

কৌতূহল চোখ-মুখ দিয়া যেন ছিটকাইয়া পড়িতেছে। ঠাট্টা-তামাশা—ছুটাছুটি—মাঝে মাঝে হাসির তরঙ্গ। তার মধ্যে যুক্তি-বিবেচনার কথা কে শুনিবে?

রাণী সকলের আগেভাগে ঝুঁকিয়া পড়িয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে আঙুল দিয়া দেখাইল, ঐ, ঐ বর—দেখ—

মরবি যে এক্ষুণি পড়ে—ছাতের এখনো আলসে হয় নি দেখছিস? বলিয়া আর একটি মেয়ে রাণীকে পিছে ঠেলিয়া নিজে আগে আসিল। যেন সে মোটেই পড়িয়া মরিতে পারে না। জিজ্ঞাসা করিল, কই? ও রাণী, বর দেখলি কোন দিকে?

গলায় ফুলের মালা—ঐ যে। দেখতে পাও না—তুমি যেন কি রকম সেজদি!

সেজদি বলিল, মালা না তোর মুণ্ডু। ও যে এক বুড়ো—সাদা চাদর কাঁধে। থুখ্‌ড়ে মাগো, তিন কালের বুড়ো—ও বরের ঠাকুরদাদা। বর এতক্ষণ কোন কালে আসনে গিয়ে বসেছে।

ছাতের উপর হইতে বরাসনে নজর চলে না, দেখা যায় কেবল সামিয়ানা।

নিরু বলিল, বলেছি তো অনর্থক। তার চেয়ে নিচে গোলকুঠুরির জানলা দিয়ে দেখিগে চল্।

চল্, চল্—

অন্ধকারে নদী মৃদুতম গানের সুর তুলিয়া বহিয়া যাইতেছে। ওপারেও যেন কিসের উৎসব—অনেকগুলা আলো, ঢাকের বাজনা।… সহসা এক ঝলক স্নিগ্ধ বাতাস উহাদের রঙিন শাড়ি কেশ-বেশের সুগন্ধ উচ্ছল কলহাস্যের টুকরাগুলি উড়াইয়া ছড়াইয়া বহিয়া গেল।

ঘুমিয়ে কে রে? মিনু? ওমা—মাগো, যার বিয়ে তার মনে নেই, পালিয়ে এসে চিলেকোঠায় ঘুমোনো হচ্ছে!

রাণী হাত ধরিয়া নাড়া দিতে মিনু একবার চাহিয়া চোখ বুজিল।

নিরু বলিল, আহা সারাদিন না খেয়ে নেতিয়ে পড়েছে। ঘুমোক না একটু—আমরা নিচে যাই—

সেজদি ঝঙ্কার দিয়া উঠিল, গিন্নিপনা রাখ্‌ দিকি। আমরাও না খেয়ে ছিলাম একদিন। ঘুমোনোর দফা শেষ আজকের দিন থেকে। কি বলিস রে রাণী?

বিশেষ করিয়া রাণীকেই জিজ্ঞাসা করিবার একটা অর্থ আছে। কথাটা গোপনীয়, কেবল সেজদি আড়ি দিতে গিয়া দৈবাৎ জানিয়া ফেলিয়াছিল। রাণী মুখ টিপিয়া হাসিল, দুই হাতে ঘুমন্ত মিনুর গলা জড়াইয়া ধরিয়া চুমু খাইতে লাগিল।

মিনু ভাই, জাগো—আজকে রাতে ঘুমোতে আছে? উঠে বর দেখসে এসে।

তারপর মিনুর এলোচুলে হাত পড়িতে শিহরিয়া উঠিল।

দেখেছ? সন্ধ্যেবেলায় আবার নেয়ে মরেছে হতভাগী। শুয়ে শুয়ে চুল শুকোনো হচ্ছে। ভিজে চুল নিয়ে এখন উপায়? এই রাশ বাঁধতে কি সময় লাগবে কম?

নিচে উলুধ্বনি উঠিল। পিসিমা নন্দরাণী শুভা ওদের সব গলা।

চল্‌, চল্‌—

চুল বাঁধতে ওঠ্‌ মিনু, শিগগির উঠে আয়—বলিয়া মিনুর এলোচুল ধরিয়া জোরে এক টান দিয়া রাণী ছুটিয়া দলে মিশিল। সিঁড়িতে আবার সমবেত পদধ্বনি।

ধড়মড় করিয়া মিনু উঠিয়া বসিল। তখন রাণীরা নামিয়া গিয়াছে, ছাতে কেহ নাই।

ঘুমচোখে প্রথমটা ভাবিল, এটা যেন তাদের কাজিডাঙার বাড়ির দক্ষিণের চাতাল। আকাশ ভরিয়া তারা উঠিয়াছে। ছাতে ঝাপসা ঝাপসা আলো। ওদিকে ভয়ানক গণ্ডগোল উঠিতেছে। সব কথা মিনুর মনে পড়িল—আজ তার বিয়ে, সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, সকলে ডাকাডাকি লাগাইয়াছে। হঠাৎ নিচের দিকে কোথায় দপ করিয়া সুতীব্র আলো জ্বলিয়া অনেকখানি রশ্মি আসিয়া পড়িল ছাতের

উপর। তাড়াতাড়ি আগাইয়া সিঁড়ি ভাবিয়া যেই সে পা নামাইয়া দিয়াছে—

চারিদিকে তুমুল হৈ-হৈ পড়িয়া গেল। আসর ভাঙিয়া সকলে ছুটিল। হারমোনিয়াম বাজাইয়া গান চলিতেছিল, পায়ের আঘাতে আঘাতে সেটা যে কোথায় চলিয়া গেল, তার ঠিকানা রহিল না। একেবারে একতলার বারান্দায় পড়িয়া মিন্টু নিশ্চেতন।

জল, জল মোটর আনো···ভিড় করবেন না মশাই, সরুন—ফাঁক করে দিন আহা-হা কি কর, মোটরে তোল শিগগির·

গামছা কাঁধে কোন দিক হইতে কন্যার বাপ ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া আছাড় খাইয়া পড়িলেন।

জজবাবুর সেই মোটরে চড়িয়া মিন্টু হাসপাতালে চলিল। বড় রাস্তায় রশি দুই পথ গিয়া মোটর ফিরিয়া আসিল, আর যাইতে হইল না।

রসুনচৌকি থামিয়া গিয়াছে। দরজার পূর্বদিকে ছোট লাল চাদরের নিচে চারিটা কলাগাছ পুঁতিয়া বিয়ের জায়গা হইয়াছিল। সেইখানে শব নামাইয়া রাখা হইল।

কাঁচা-হলুদের মতো রং, তার উপর নূতন গহনা পরিয়া যেন রাজরাজেশ্বরী হইয়া শুইয়া আছে। কনে-চন্দন আঁকা শুভ্র কপাল ফাটিয়া চাপ চাপ জমা রক্ত লেপিয়া রহিয়াছে, নাক ও গালের পাশ বহিয়া রক্ত গড়াইয়াছে—মেঘের মতো খোলা চুলের রাশি এখানে সেখানে রক্তের ছোপে ডগমগে লাল।

ভিতরে-বাহিরে নিদারুণ স্তব্ধতা। বাড়িতে যেন একটা লোক নাই। শবের মাথার উপরে একটি খরজ্যোতিঃ গ্যাস জ্বলিতেছে। ব ..া মধ্য হইতে স্তব্ধতা চিরিয়া হঠাৎ একবার আর্তনাদ আসিল, ও মা, ও মাগো আমার—ও আমার লক্ষ্মীমাণিক রাজরাণী মা—

নীলমাধব সকলের দিকে চাহিয়া ধমক দিয়া উঠিলেন, হাত-পা গুটিয়ে বসে আছ যে?

বরশয্যার প্রকাণ্ড মেহগ্নি-পালিশ খাট ক'জনে টানিয়া নামাইয়া আনিল।

এতক্ষণ বেণুধরকে লক্ষ্য হয় নাই। এইবার ভিড় ঠেলিয়া আসিয়া শবের পায়ের কাছে খাটের বাজুতে ভর দিয়া সে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল। হাতের মুঠায় কাজললতা তেমনি ধরা আছে। কাচের মতো স্বচ্ছ অচঞ্চল আধ-নিমীলিত দু'টি দৃষ্টি। মৃতার সেই স্তিমিত চোখ দু'টির দিকে নিষ্পলক চাহিয়া বেণুধর দাঁড়াইয়া রহিল।

বাপ ঝুঁকিয়া পড়িয়া পাগলের মতো আর্তনাদ করিয়া উঠিলেন, একবার ভাল করে চা' দিকি। চোখ তুলে চা' ও খুকি—

নীলমাধব ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার হাত ধরিয়া ফেলিলেন। কিন্তু তিনি থামিলেন না, সজল চোখে বারম্বার বলিতে লাগিলেন, ও বেয়াই, বিনি দোষে মাকে আমার কত গালমন্দ করেছি—কোন সম্বন্ধ এগুতে চায় না, তার সমস্ত অপরাধ দিনরাত মা ঘাড় পেতে নিয়েছে, একবার মুখ তুলে একটা কথা বলে নি। ও খুকি, আর বকব না—চোখ তুলে চা একটি বার—

ভিড় জমিয়া গিয়াছিল। নীলমাধব ক্রুদ্ধ কণ্ঠে চিৎকার করিয়া উঠিলেন, কতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই দেখবে তোমরা? আটটা বেজে গেছে, রওনা হও।

সাড়ে-আটটায় লগ্ন ছিল। বেণুধরের বুকের মধ্যে কাঁপিয়া উঠিল। যেন শুভলগ্নে তাহাদের শুভদৃষ্টি হইতেছে, লজ্জানত বালিকা চোখ তুলিয়া চাহিতে পারিতেছে না, বাপ তাই মেয়েকে সাহস দিতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন।

ফুল ও দেবদারু-পাতা দিয়া গেট হইয়াছিল, সমস্ত ফুল ছিঁড়িয়া আনিয়া সকলে শবের উপর ঢালিয়া দিল। বেণুধর গলার মালা ছিঁড়িয়া সেই ফুলের গাদায় ছুড়িয়া দ্রুতবেগে ভিড়ের মধ্য দিয়া পলাইয়া গেল।

ছুটিতে ছুটিতে রাস্তা অবধি আসিল। সর্বাঙ্গ দিয়া ঘামের ধারা বহিতেছে, পা টলিতেছে, নিশ্বাস বন্ধ হইয়া যাইতেছে। মোটরের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া উন্মত্তের মতো সে বলিয়া উঠিল, চালাও এক্ষুনি—

গাড়ি চলিতে লাগিলে হুঁশ হইল, তখনো আগাগোড়া তাহার

বরের সাজ। একবোঝা কোট-কামিজ, তার উপর শৌখিন ফুলকাটা চাদর—বিয়ের উপলক্ষে পছন্দ করিয়া সমস্ত কেনা। একটা একটা করিয়া খুলিয়া সে পাশে স্তূপাকার করিতে লাগিল।

তবু কি অসহ্য গরম! বেণুর মনে হইল, সর্বদেহ ফুলিয়া ফাটিয়া এবার বুঝি ঘামের বদলে রক্ত বাহির হইবে। ক্রমাগত বলিতে লাগিল, চালাও—খুব জোরে চালাও গাড়ি—

সোফার জিজ্ঞাসা করিল, কোথায়?

যেখানে খুশি। ফাঁকায়—গ্রামের দিকে—

তীব্রবেগে গাড়ি ছুটিল। চোখ বুজিয়া চেতনাহীনের মতো বেণুধর পড়িয়া রহিল।

সূচিমুখ-আঁধার রাত্রি, তার উপর মেঘ করিয়া আরও আঁধার জমিয়াছে। জনবিরল পথের উপর মিটমিটে কেরোসিনের আলো যেন প্রেতপুরীর পাহারাদার। একবার চোখ চাহিয়া বাহিরের দিকে তাকাইয়া বেণু শিহরিয়া উঠিল। এমন নিবিড় অন্ধকার সে জীবনে দেখে নাই। দু-ধারের বাড়িগুলির দরজা-জানলা বন্ধ, ছোট শহর ইহারই মধ্যে নিশুতি হইয়া উঠিয়াছে। মধ্যে মধ্যে আম-কাঁঠালের বড় বাগিচা।...সহসা কোথায় কোন দিক দিয়া উচ্ছল হাসির শব্দ বাজিয়া উঠিল, অতি অস্পষ্ট কৌতুক-চঞ্চল অনেকগুলা কণ্ঠস্বর—

বউ দেখিয়ে যাও, বউ দেখিয়ে যাও, বউ দেখিয়ে যাও গো!

আশপাশের সারি সারি ঘুমন্ত বাড়িগুলির ছাতের উপর, আম-বাগিচার এখানে-ওখানে, ল্যাম্পপোস্টের আবছায়ায় নানা বয়সের কত মেয়ে কৌতূহলভরা চোখে ভিড় করিয়া বউ দেখিতে দাঁড়াইয়া আছে!

তারপর গাড়ির মধ্যে দৃষ্টি ফিরাইয়া এক পলকে যেন তাহার গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিল।

বধূ তাহার পাশে রহিয়াছে···সত্যই একটি বউমানুষ ঘোমটার মধ্যে জড়সড় হইয়া মাথা নোয়াইয়া একেবারে গদির সঙ্গে মিশিয়া বসিয়া আছে, গায়ে ছোঁয়া লাগিলে যেন সে লজ্জায় মরিয়া যাইবে। তারপর খেয়াল হইল, সে তার পরিত্যক্ত জামা-চাদরের বোঝা—মানবী নয়। এই গাড়িতেই মেয়েটিকে হাসপাতালে লইয়া চলিয়াছিল। সে বসিয়া

নাই, তার দেহের দু-এক ফোঁটা রক্ত গাড়ির গদিতে লাগিয়া থাকিতে পারে।

শহর ছাড়িয়া নদীর ধারে ধারে গাড়ি ক্রমে মাঠের মধ্যে আসিল। হেডলাইট জ্বালিয়া গাড়ি ছুটিতেছে। চারিদিকের নিঃশব্দতাকে পিশিয়া ভাঙিয়া-চুরিয়া খোয়া-তোলা রাস্তার উপর চাকার পেষণে কর্কশ সুকরুণ আর্তনাদ উঠিতেছে। একটি পল্লী-কিশোরীর এই দিনকার সকল সাধ-বাসনা বেণুধরের বুকের মধ্যে কাঁদিয়া বেড়াইতে লাগিল। চাকার সামনে সে যেন বুক পাতিয়া দিয়াছে। বাহিরে ঘন তিমিরাচ্ছন্ন রাত্রি—জনশূন্য মাঠ—কোন দিকে আলোর কণিকা নাই। সৃষ্টির আদি-যুগের অন্ধকারলিপ্ত নীহারিকামণ্ডলীর মধ্য দিয়া বেণুধর যেন বিদ্যুতের গতিতে ছুটিয়া বেড়াইতেছে, আর পাশে পাশে পাল্লা দিয়া ছুটিয়া মরিতেছে নিঃশব্দচারিণী মৃত্যুরূপা তার বধূ। লাল বেনারসিতে রূপের রাশি মুড়িয়া লজ্জায় ভাঙিয়া শতখান হইয়া এখানে এক কোণে তার বসিবার স্থান ছিল, কিন্তু একটি মুহূর্তের ঘটনার পরে এখন তার পথ হইয়াছে সীমাহীন বিপুল শূন্যতা—রাত্রির অন্ধকার মথিত করিয়া বাতাসের বেগে ফরফর শব্দে তার পরনের কালো কাপড় উড়ে, পায়ের আঘাতে জোনাকি ছিটকাইয়া যায়, গতির বেগে সামনে ঝুঁকিয়া-পড়া ঘন চুল-ভরা মাথাটি—মাথার চাঁদি পাশ দিয়া রক্তের ধারা গড়াইয়া গড়াইয়া বৃষ্টি বহিয়া যায়, এলোচুল উড়ে—দিগন্তব্যাপী ডগমগে লাল চুল!

দুই হাতে মাথা টিপিয়া চোখ বুজিয়া বেণুধর পড়িয়া রহিল। গাড়ি চলিতে লাগিল। খানিক পরে পথের ধারে এক বটতলায় থামিয়া হাটুরে-চালার মধ্যে বাঁশের মাচায় অনেকক্ষণ মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া থাকিয়া অবশেষে মন কিছু শান্ত হইলে বাসাবাড়িতে ফিরিয়া আসিল।

নীলুমাধব প্রভৃতি অনেকক্ষণ আসিয়াছেন। বরযাত্রীরা অনেকে মেল-ট্রেন ধরিতে সোজা স্টেশনে গিয়াছে। কেবল কয়েকজন মাত্র—যাঁরা খুব নিকট-আত্মীয়—বৈঠকখানার পাশের ঘরে বালিশ কাঁথা পুঁটুলি বই যা হয় একটা-কিছু মাথায় দিয়া যে যার মতো শুইয়া

পড়িয়াছেন। অনেক রাত্রি। হেরিকেনের আলো মিটমিট করিয়া জ্বলিতেছে।

আলোর সামনে ঠিক মুখোমুখি নির্বাক নিস্তব্ধ গম্ভীর মুখে বসিয়া নীলমাধব ও শীতল ঘটক।

বেণুকে দেখিয়া নীলমাধব উঠিয়া আসিলেন। বলিলেন, কাউকে কিছু না বলে বেরিয়ে পড়লে—মোটর নিয়ে গিয়েছ শুনে ভাবলাম, বাসাতেই এসেছ। এখানে এসে দেখি তা নয়। ভারি ব্যস্ত হয়েছিলাম। জজ বাবুর বাড়ি বিজয় গিয়ে বসে আছে এখনো।

বেণুধর বলিল, বড্ড মাথা ধরল, ফাঁকায় তাই খানিকটে ঘুরে এলাম।

বলে যাওয়া উচিত ছিল—বলিয়া নীলমাধব চুপ করিলেন। ছেলে নিশ্চল দাঁড়াইয়া আছে দেখিয়া পুনরায় বলিলেন, তোমার খাওয়া হয় নি। দক্ষিণের কোঠায় খাবার ঢাকা আছে, বিছানা করা আছে, খেয়ে-দেয়ে শুয়ে পড়—রাত জাগবার দরকার নেই।

ঘরে গিয়া নীলমাধবের ভয়ে ঢাকা খুলিয়া খাবার খানিকটা সে নাড়াচাড়া করিল, মুখে তুলিতে পারিল না।

দালানের পিছনে কোথায় কি ফুল ফুটিয়াছে, একটা উগ্র মিষ্ট গন্ধের আমেজ। মিটমিটে আলোয় রহস্যাচ্ছন্ন আধ-অন্ধকারে চারিদিক চাহিয়া চাহিয়া মনে হইল, ঘর ভরিয়া কে-একজন বসিয়া আছে, তাহাকে ধরিবার জো নাই—অথচ তাহার স্নিগ্ধ লাবণ্য বন্যার মতো ঘর ছাপাইয়া যাইতেছে, কোণের দিকে দলিল-পত্র ভরা সেকেলে বড় ছাপবাক্সর আবডালে নিবিড় কালো বড় বড় দুটি চোখে অভুক্ত খাবারের দিকে বেদনাহত ভাবে চাহিয়া নীরব দৃষ্টিতে তাহাকে সাধা-সাধি করিতেছে। আলো নিভাইতেই সেই দেহাতীত ইন্দ্রিয়াতীত সৌন্দর্য অকস্মাৎ বেণুধরকে কঠিন ভাবে বেষ্টন করিয়া ধরিল।

বাহিরের বৈঠকখানায় কথাবার্তা আরম্ভ হইল। শীতল ঘটক নিশ্বাস ফেলিয়া বলিয়া উঠিল, পোড়াকপালি আজ কার মুখ দেখে উঠেছিল!

তারপর চুপ। অনেকক্ষণ আর কথা নাই।

শীতল আবার বলিতে লাগিল, বুদ্ধিশ্রী ছিল মেয়েটার। মনে আছে কর্তাবাবু, সেই পাকা দেখতে গিয়ে আপনি বললেন, আমার মা নেই, একজন মা খুঁজতে এসেছি। আপনার কথা শুনে মেয়েটি কেমন ঘাড় নিচু করে রইল!

নীলমাধব গম্ভীর কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, থাম শীতল।

একেবারেই কথা বন্ধ হইল, দু'জনে চুপচাপ। আলো জ্বলিতে লাগিল। আর ঘরের মধ্যে বেণুধরের দুই চক্ষু জলে ভরিয়া গেল। জীবনকালের মধ্যে কোন দিন যাহাকে দেখে নাই, মৃত্যুপথবর্তিনী সেই কিশোরী মেয়ের ছোট ছোট আশা আকাঙ্ক্ষাগুলি হঠাৎ যেন মাঠ বাড়ি বাগিচা ও এত রাস্তা পার হইয়া জানলা গলিয়া অন্ধকার ঘরখানির মধ্যে তাহার পদতলে মাথা খুঁড়িয়া মরিতে লাগিল।

তারপর কখন বেণু ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। জানলা খোলা, শেষ রাতে পূর্বদিগন্তে চাঁদ উঠিয়া ঘর জ্যোৎস্নায় প্লাবিত করিয়া দিয়াছে, দিগন্তবিসারী ভৈরব শান্ত জ্যোৎস্নার সমুদ্রে ডুবিয়া রহিয়াছে। হঠাৎ তাহার ঘুম ভাঙিল। সঙ্গে সঙ্গে মনে হইল, কি একটা ভারি ভুল হইয়া যাইতেছে· হঠাৎ বড় ঘুম আসিয়া পড়িয়াছিল, কে আসিয়া কতবার তাহাকে ডাকাডাকি করিয়া বেড়াইতেছে। ঘুমের আলস্য তখনও বেণুধরের সর্বাঙ্গে জড়াইয়া আছে। তাহার তন্দ্রাবিবশ মনের কল্পনা ভাসিয়া চলিল—

ঠক—ঠক —ঠক—

খিল আঁটা কাঠের কবাটের ওপাশে দাঁড়াইয়া চুপি চুপি এখনো যে ক্ষীণ আঘাত করিতেছে, বেণুধর তাহাকে স্পষ্ট দেখিতে পায়।

হাতের চুড়িগুলি গোড়ার দিকে টানিয়া আনা, চুড়ি বাজিতেছে না। শেষ প্রহর অবধি জাগিয়া জাগিয়া তাহার শ্রান্ত দেহ আর বশ মানে না। চোখের কোণে কান্না জমিয়াছে। একটু আদরের কথা কহিলে একবার নাম ধরিয়া ডাকিলে এখনি কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিবে। ফিস-ফিস করিয়া বধূ বলিতেছে, দুয়োর খুলে দাও গো, পায়ে পড়ি—

উঠিয়া তাহাকে ডাকিয়া আনা দরকার। কিন্তু মনে যতই তাড়া, দেহ আর উঠিয়া গিয়া কিছুতেই কষ্টটুকু স্বীকার করিতে রাজি নয়।

বেণুধর দেখিতে লাগিল, বাতাস লাগিয়া গাছের উপরের লতা যেমন পড়িয়া যায়, ঝুপ করিয়া তেমনি দোর-গোড়ায় বধূ পড়িয়া গেল। সমস্ত পিঠ ঢাকিয়া পা অবধি তাহার নিবিড় তিমিরাবৃত চুলের রাশি এলাইয়া পড়িয়াছে।...বেণুধর দেখিতে লাগিল।

ক্রমে ফর্শা হইয়া আসে। আম-বাগানের ডালে ডালে সন্ত-ঘুমভাঙা পাখীর কলরব। ও-ঘর হইতে কে কাসিয়া কাসিয়া উঠিতেছে। দিনের আলোর সঙ্গে মানুষের গতিবিধি স্পষ্ট ও প্রখর হইতে লাগিল। বেণুধর উঠিয়া পড়িল।

সকালের দিকে সুবিধা মতো একটা ট্রেন আছে। অথচ নীলমাধব নিশ্চিন্তে পরম গম্ভীরভাবে গড়গড়া টানিতেছিলেন।

বেণু গিয়া কহিল, সাতটা বাজে—

বিনাবাক্যে নীলমাধব দু'টা টাকা বাহির করিয়া দিলেন। বলিলেন, চা-টা তোমরা দোকান থেকে খেয়ে নাও।

বাড়ি যাওয়া হবে না?

না—

বলিয়া তিনি গড়গড়ার নল রাখিয়া কি কাজে বাহিরে যাইবার উদ্যোগে উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

বেণুধর ব্যাকুল কণ্ঠে পিছন হইতে প্রশ্ন করিল, কবে যাওয়া হবে? এখানে কতদিন থাকতে হবে আমাদের?

মুখ ফিরাইয়া নীলমাধব ছেলের মুখের দিকে চাহিলেন।

সে মুখে কি দেখিলেন, তিনিই জানেন—ক্ষণকাল মুখ দিয়া তাঁহার কথা সরিল না। শেষে আস্তে আস্তে বলিলেন, শীতল ঘটক ফিরে না এলে তো বলা যাচ্ছে না।

অনতিপরেই বৃত্তান্ত জানিতে বাকি রহিল না। শীতল ঘটক গিয়াছে তাহিরপুরে। গ্রামটা নদীর আড়পারে ক্রোশখানেকের মধ্যেই। ওখানে কিছুদিন একটা কথাবার্তা চলিয়াছিল। খুব বনিয়াদি গৃহস্থ-ঘরের মেয়ে। কিন্তু ইদানীং কৌলীন্যটুকু ছাড়া সে পক্ষের অন্য বিশেষ-কিছু সম্বল নাই। অতএব নীলমাধব নিজেই পিছাইয়া আসিয়াছিলেন।

বিজয়কে আড়ালে ডাকিয়া সকল আক্রোশ বেণু তাহারই উপর মিটাইল। কহিল, কশাই তোমরা সব।

অথচ সে একেবারেই নিরপরাধ। কিন্তু সে তর্ক না করিয়া বিজয় সান্ত্বনা দিয়া কহিল, ভয় নেই ভাই, ও কিচ্ছু হবে না দেখো। ওঠ্ ছুঁড়ি তোর বিয়ে, সে কি হয় কখনো? কাকার যেমন কাণ্ড!

কিন্তু একটু পরেই দেখা গেল, ঘটক হাসিমুখে হন-হন করিয়া ফিরিয়া আসিতেছে। সামনে পাইয়া সুসংবাদটা তাহাদেরই সর্বাগ্রে দিল।

পাকাপাকি করে এলাম ছোটবাবু—

তবু বিজয় বিশ্বাস করিতে পারিল না। বলিল, পাকাপাকি করে এলে কি রকম? এই ঘণ্টা দুই-তিন আগে বেরুলে—আগে কোন খবরাখবর দেওয়া ছিল না। এর মধ্যে ঠিক হয়ে গেল?

শীতল সগর্বে নিজের অস্তিনার বুকের উপর একটা থাবা মারিয়া কহিল, এর নাম শীতল ঘটক, বুঝলেন বিজয় বাবু, চল্লিশ বছরের পেশা এই আমার। কিছুতে রাজি হয় না—হেনো তেনো কত কি আপত্তি। ফুস-মন্ত্রে সমস্ত জল করে দিয়ে এলাম।

বলিয়া শূন্যে মুখ তুলিয়া ফুৎকার দিয়া মন্ত্রটার স্বরূপ বুঝাইয়া দিল।

বেণুধর কহিল, আমি বিয়ে করব না।

শীতল অবাক হইয়া গেল। সে কেবল অপর দিকের কথাটাই ভাবিয়া রাখিয়াছিল। একবার ভাবিল বেণুধর পরিহাস করিতেছে।

তাহার মুখের দিকে চাহিয়া এদিক ওদিক বার দুই ঘাড় নাড়িয়া সন্দিগ্ধ স্বরে বলিতে লাগিল, তাই কখনো হয় ছোটবাবু? লক্ষ্মী-ঠাকরুনের মতো মেয়ে। ছবি নিয়ে এসেছি, মিলিয়ে দেখুন। কালকের ও মেয়ে এর দাসী-বাঁদীর যুগ্যি ছিল না।

বেণুধর কঠোর স্বরে বলিয়া উঠিল, কিন্তু আমি যা বলবার বলে দিইছি শীতল। তুমি বাবাকে আমার কথা বোলো।

বলিয়া আর উত্তর-প্রত্যুত্তরের অপেক্ষা না রাখিয়া সে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল।

ক্ষণপরে তাহার ডাক পড়িল।

নীলমাধব বলিলেন, শুনলাম, বিয়েয় তুমি অনিচ্ছুক?

বেণু মাথা হেঁট করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

নীলমাধব বলিতে লাগিলেন, তা হলে আমাকে আত্মহত্যা করতে বল?

কোন প্রকারে মরীয়া হইয়া বেণুধর বলিয়া উঠিল, কালকের সর্বনেশে কাণ্ডে আমার মন কি রকম হয়ে গেছে বাবা, আমি পাগল হয়ে যাব। আর কিছু দিন সময় দিন আমায়—

বলিতে বলিতে স্বর কাঁপিতে লাগিল। এক মুহূর্ত সামলাইয়া লইয়া বলিল, মরা মানুষ আমার পিছু নিয়েছে।

ভ্রূ বাঁকাইয়া নীলমাধব ছেলের দিকে চাহিলেন। একটুখানি নরম হইয়া বলিতে লাগিলেন, আর এদিকের সর্বনাশটা ভাব একবার। বাড়িসুদ্ধ কুটুম্ব গিস-গিস করছে, সতের গ্রাম নেমন্তন্ন। বউ দেখবে বলে সবাই হাঁ করে বসে আছে। যেমন তেমন ব্যাপার নয়, এত বড় জেদাজেদির বিয়ে। আর চৌধুরিদের মেজকর্তা আসবেন—

অপমানের ছবিগুলি চকিতে নীলমাধবের মনের মধ্যে খেলিয়া গেল। চৌধুরিদের মেজকর্তা অত্যন্ত ধার্মিক ব্যক্তি, তিলার্ধ দেরি না করিয়া জপের মালা হাতে লইয়াই খড়ম খট খট করিতে করিতে সমবেদনা জানাইতে আসিবেন—আসিয়া নিতান্ত নিরীহ মুখে উচ্চ কণ্ঠে একহাট লোকের মধ্যে বৃদ্ধ অতি গোপনে জিজ্ঞাসা করিবেন, বলি ও নীলমাধব, আসল কথাটা বল্ দিকি, বিয়ে এবারও ভাঙল—মেয়ে কি তারা অন্য জায়গায় বিয়ে দেবে?···

ভাবিতে ভাবিতে নীলমাধব ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন। বলিলেন, না বেণুধর, বউ না নিয়ে বাড়ি ফেরা হবে না। পরশুর আগে দিন নেই। তুমি সময় চাচ্ছিলে—বেশ তো, মাঝের এই দুটো দিন থাকল। এর মধ্যে নিশ্চয় মন ভাল হয়ে যাবে।···

বারোয়ারির মাঠে যাত্রা আসিয়াছে। বিকাল হইতে গাওনা শুরু। বেণুধর সমবয়সি জন দুই-তিনকে পাকড়াইয়া বলিল, চল যাই।

বিজয় বলিল, আমার যাওয়া হবে না তো। বিস্তর জিনিযপত্তোর বাঁধাছাঁদা করতে হবে। রাত্রে ফিরে যাচ্ছি।

কেন ?

গ্রামে গিয়ে খবর দিতে হবে বউভাতের তারিখ দুটো দিন পিছিয়ে গেল। কাকা বললেন, তুমিই চলে যাও বিজয়।

গাড়ি তো সেই রাত দুপুরে—আমরা থাকব বড় জোর এক ঘণ্টা কি দেড় ঘণ্টা। চল চল—

বেণুধর ছাড়িল না, ধরিয়া লইয়া গেল।

পথের মধ্যে বিজয়কে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিল, বিয়ে পরশুদিন ঠিক হল ?

হ্যাঁ—

পরশু রাত্রে ?

তা ছাড়া কি—

চুপ করিয়া খানিক কি ভাবিয়া বেণুধর করুণ ভাবে হাসিয়া উঠিল। বলিল, রাত্রি আসছে, আর আমার ভয় হচ্ছে। তুমি বিশ্বাস করবে না বিজয়, ঐ অপঘাতে-মরা মেয়েটা কাল সমস্ত রাত আমায় জ্বালাতন করেছে।

আবার একটু স্তব্ধ থাকিয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে সে বলিতে লাগিল, মরা ব্যাপারটা আর আমি বিশ্বাস করছি নে। এত সাধ-আহ্লাদ-ভালবাসা পলক ফেলতে না ফেলতে উড়িয়ে-পুড়িয়ে চলে যাবে—সে কি হতে পারে ? মিছে কথা। এ আমার অনুমানের কথা নয় বিজয়, কাল থেকে স্পষ্ট করে জেনেছি।

বিজয় ব্যাকুল হইয়া বলিল, তুমি এসব কথা আর বোলো না ভাই, আমাদেরও শুনলে ভয় করে।

ভয় করে ? তবে বলব না।

বলিয়া বেণু টিপি-টিপি হাসিতে লাগিল। বলিল, কিন্তু যাই বল, এই শহরে পড়ে থাকা আমাদের উচিত হয় নি—দূরে পালানো উচিত ছিল। এই আধক্রোশের মধ্যেই কাণ্ডটা ঘটল তো !

যাত্রা দেখিয়া বেণু অতিরিক্ত রকম খুশি হইল। ফিরিবার পথে কথায় কথায় এমন হাসি-রহস্য—যেন সে মাটি দিয়া পথ চলিতেছে না। তখন সন্ধ্যা গড়াইয়া গিয়াছে। পথের উপর

অজস্র কামিনীফুল ফুটিয়াছে। ডালপালাসুদ্ধ তাহার অনেকগুলি ভাঙিয়া লইল।

বলিল, খাসা গন্ধ! বিছানায় ছড়িয়ে দেব।

একজন ঠাট্টা করিয়া বলিল, ফুলশয্যার দেরি আছে তো—

কোথায়? বলিয়া বেণু প্রচুর হাসিতে লাগিল। বলিল, এ-পক্ষের দিন রয়েছে তো কাল। আর তাহিরপুরেরটার—ও বিজয়, তোমাদের নতুন সম্বন্ধের ফুলশয্যার দিন করেছে কবে?

বিজয় রীতিমতো রাগিয়া উঠিল, ফের ঐ কথা? এ-পক্ষ ও-পক্ষ – বিয়ে তোমার ক'টা হয়েছে শুনি?

আপাতত একটা। কাল যেটা হয়ে গেল—। আর একটার আশায় আছি।

বিজয়ের কাঁধ ধরিয়া ঝাঁকি দিয়া বেণু বলিতে লাগিল, ও বিজয়, ভয় পেলে নাকি? ভয় নেই, আজ সে আসবে না। আজকে কালরাত্রি—বউয়ের দেখা করবার নিয়ম নেই।

খাওয়া-দাওয়ার পর বেশ প্রফুল্ল ভাবে বেণুধর শুইয়া পড়িল। কিন্তু ঘুম আসে না। আলো নিভাইয়া দিল। কিছুতে ঘুম আসে না। পাশে কোন বাড়িতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঘড়ি বাজিয়া যাইতেছে। চারিদিক নিশুতি। অনেকক্ষণ ধরিয়া ঘুমের সাধনা করিয়া কাহার উপর রাগ হইতে লাগিল। রাগ করিয়া গায়ের কম্বল ছুঁড়িয়া ফেলিয়া কাহাকে শুনাইয়া শুনাইয়া জোরে জোরে বাহিরে পায়চারি করিতে লাগিল। খণ্ড-চাঁদ ক্রমশ আম-বাগানের মাথায় আসিয়া ঠেকিয়াছে।··· আবার সে ঘরে ঢুকিল। বিছানার পাশে গিয়া মনে হইল, ফোঁস করিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া লঘুপায়ে কে কোথায় পলাইয়া গেল। বাতাসে বাগিচার গাছপালা খস-খস করিতেছে। বেণুধর ভাবিতে লাগিল, নূতন কোরা-কাপড় পরিয়া খস-খস করিতে করিতে এক অদৃশ্যচারিণী বনপথে বাতাসে বাতাসে দ্রুতবেগে মিলাইয়া গেল।

পরদিন তাহিরপুরের পাত্রীপক্ষ আশীর্বাদ করিতে আসিলেন। হাসিমুখেই আশীর্বাদের আংটি সে হাত পাতিয়া লইল। মনে মনে

বাপের বহুদর্শিতার কথা ভাবিল। নীলমাধব সত্যই বলিয়াছিলেন, এই দু'টা দিন সময়ের মধ্যেই মন তাহার আশ্চর্য রকম ভাল হইয়া উঠিয়াছে। চুরি করিয়া এক ফাঁকে বাপের ঘর হইতে পাত্রীর ছবিটা লইয়া আসিল। মেয়ে সুন্দরী বটে। প্রতিমার মতো নিখুঁত নিটোল গড়ন।

সেদিন একখানা বই পড়িতে পড়িতে অনেক রাত হইয়া গেল। শিয়রে তেপায়ার উপর ভাবী বধূর ছবিখানি। ম্লান দীপালোকিত চুণকাম-খসা উঁচু দেয়াল, গম্বুজের মতো খিলান-করা সেকেলে ছাত— তাহারই মধ্যে মিলনোৎকণ্ঠিত নায়ক-নায়িকার সুখ-দুঃখের সহগামী হইয়া অনেক রাত্রি অবধি সে বই পড়িতে লাগিল।

একবার কি রকমে মুখ ফিরাইয়া বেণুধর স্তম্ভিত হইয়া গেল, স্পষ্ট দেখিতে পাইল, একেবারে স্পষ্ট প্রত্যক্ষ—তাহার মধ্যে এক বিন্দু সন্দেহ করিবার কিছু নাই—জানলার শিকের মধ্য দিয়া হাত গলাইয়া চাঁপার কলির মতো পাঁচটি আঙুল লীলায়িত ভঙ্গিতে হাতছানি দিয়া তাহাকে ডাকিতেছে। ভাল করিয়া তাকাইতেই বাহিরের নিকষকালো অন্ধকারে হাত ডুবিয়া গেল। সে উঠিয়া জানলায় আসিল। আর কিছুই নাই, নৈশ বাতাসে লতাপাতা দুলিতেছে। সজোরে সে জানলার খিল আঁটিয়া দিল।

আলোর জোর বাড়াইয়া দিয়া বেণুধর পাশ ফিরিয়া শুইল। চটা-ওঠা দেয়ালের উপর কালের দেবতা কত কি নক্সা আঁকিয়া গিয়াছে! উল্টা-করা তালের গাছ···একটা মুখের আধখানা···ঝুঁটিওয়ালা অদ্ভুত আকারের জানোয়ার আর একটা কিসের টুঁটি চাপিয়া ধরিয়া আছে··· ঝুল কালি ও মাকড়শা-জালের বন্দীশালায় কালো কালো শিকের আড়ালে কত লোক যেন আটক হইয়া রহিয়াছে···

চোখ বুজিয়া সে দেখিতে লাগিল—

অনেক দূরে মাঠের ওপারে কালো কাপড় মুড়ি-দেওয়া সারি সারি মানুষ চলিয়াছে—পিঁপড়ার সারির মতো মানুষের অনন্ত শ্রেণী। লোকালয়ের সীমানায় আসিয়া কে-একজন হাত উঁচু করিয়া কি বলিল।

মুহূর্তকাল সব স্থির। আবার কি সঙ্কেত হইল। অমনি দল ভাঙিয়া নানাজনে নানাদিকে পথ-বিপথ ঝোপ-জঙ্গল আনাচ-কানাচ না মানিয়া ছুটিতে ছুটিতে অদৃশ্য হইয়া গেল।· ·

এই রাত্রে আঙিনার ধূলায় কোথায় এক পরম দুঃখিনী এলাইয়া পড়িয়া থাকিয়া দাপাদাপি করিতেছে—

ওমা—মাগো আমার—ও আমাব লক্ষ্মীমাণিক বাজরাণী মা।

অন্ধকারেব আবছায়ে ছোট ঘুলঘুলির পাশে তন্বী কিশোরীটি নিশ্বাস বন্ধ করিয়া আড়ি পাতিয়া বসিয়া আছে। শিয়রে নূতন বধূ চুপটি করিয়া বাসর জাগে। বব বুঝি ঘুমাইল।

বেণুধর উঠিয়া বসিয়া পবম স্নেহে স্মিতমুখে শিযরে তেপায়ার উপরের ছবিখানিব দিকে তাকাইল। কাল সাবারাত্রি তাহারা জাগিযা কাটাইবে।

রুদ্ধ জানলায় সহসা মৃদু মৃদু করাঘাত শুনিযা বেণুধর চমকিয়া উঠিল। শুনিতে পাইল ভযার্ত চাপা গলায ডাকিয়া ডাকিয়া কে যেন কি বলিতেছে। একটি অসহায় প্রীতিমতী বালিকা বাপ মা এবং চেনা-জানা সকল আত্মীয়-পরিজন ছাড়িবা আসিযা ঐ জানলার বাহিরে পাগল হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। আজ বেণুধর তিলার্ধ দেরি কবিল না। দুয়াব খুলিয়া দেখে, ইতিমধ্যে বাতাস বাড়িযা ঝড বহিতে শুরু হইয়াছে। সন-সন করিযা ঝড দালানেব গায়ে পাক খাইয়া ফিরিয়া যাইতেছে।

এসো—

উঁহু।

এসো—

না।

বাতাসে দড়াম করিয়া দরজা বন্ধ হইয়া গেল। বেণুধর নির্ণিরীক্ষ্য অন্ধকারের মধ্যে অদৃশ্য পলায়নপরার পিছনে ছুটিল। ঝোড়ো হাওয়ায় কথা না ফুটিতে কথা উড়াইয়া লইয়া যায়। তবু সে যুক্তকরে বারম্বার

এক অভিমানিনীর উদ্দেশে কহিতে লাগিল, মিছে কথা, আমি বিয়ে করব না, আমি যাব না কাল। তুমি এসো—ফিরে এসো—

নিশীথ রাত্রি। মেঘ-ভরা আকাশে বিদ্যুৎ চমকাইতেছে। ভৈরবের বুকেও যেন প্রলয়ের জোয়ার লাগিয়াছে। ডাক ছাড়িয়া কূল ছাপাইয়া জল ছুটিয়াছে। বেণুধর নদীর কূলে কূলে ডাকিয়া বেড়াইতে লাগিল। মৃত্যু ও জীবনের সীমারেখা এই পরম মুহূর্তে প্রলয়-তরঙ্গে লেপিয়া মুছিয়া গিয়াছে। পৃথিবীতে এই ক্ষণ প্রতিদিন আসিয়া থাকে। দিনের অবসানে সন্ধ্যা—তারপর রাত্রি—পলে পলে রাত্রির বক্ষস্পন্দন বাড়ে—তারপর অনেক, অনেক—অনেক ক্ষণ পরে মধ্যআকাশ হইতে একটি নক্ষত্র বিদ্যুৎগতিতে খসিয়া পড়ে, ঝন-ঝন করিয়া মৃত্যুপুরীর সিংহদ্বার খুলিয়া যায়, পৃথিবীর মানুষের শিয়রে ওপারের লোক দলে দলে আসিয়া বসে, ভালবাসে, আদর করে, স্বপ্নের মধ্য দিয়া কত কথা কহিয়া যায়—

আজ স্বপ্নলোকের মধ্যে নয়, জাগ্রত দুই চক্ষু দিয়া মৃত্যুলোক-বাসিনীকে সে দেখিতে পাইয়াছে। দু'টি হাত নিবিড় করিয়া ধরিয়া তাহাকে ফিরাইয়া আনিবে। দিগন্তব্যাপ্ত মেঘবরণ চুলের উপর ডগমগে লাল কয়েকটি রক্তবিন্দু প্রলয়ান্ধকারের মধ্যে আলেয়ার মতো বেণুধরকে দূর হইতে দূরে ছুটাইয়া লইয়া চলিল।

ফার্স্ট বুক ও চিত্রাঙ্গদা

রামোত্তম রায় মশায়ের সেজছেলে ননী তিন বছরে তেরখানা ফার্স্ট বুক ছিঁড়িল, কিন্তু ঘোড়ার গল্প ছাড়াইতে পারিল না।

ব্যাপারটা আর কোনক্রমে অবহেলা করা চলে না। অতএব পশু-মাস্টারের ডাক পড়িল।

পশুপতির নামডাক যেমন বেশি, দরও তেমনি কিছু বেশি। তা হউক। ছেলে আকাটমূর্খ হইয়া থাকে, সে জায়গায় দু-একটা টাকার কম-বেশি এমন কিছু বড় কথা নয়।

সাব্যস্ত হইল, আট টাকা মাহিনা, তা ছাড়া রায় মশায়ের বাড়িতেই পশুপতি খাইবে থাকিবে। পড়াইতে হইবে ফার্স্ট বুক, শিশুশিক্ষা, সরল পাটিগণিত—সকালে একঘণ্টা, সন্ধ্যার পর দু'ঘণ্টা মাত্র।

বাহিরবাড়ির কাছারিঘরের পাশে ছোট্ট সঙ্কীর্ণ ঘরখানিতে চুন ও সুরকি বোঝাই থাকিত, উহা পরিষ্কৃত হইয়া একপাশে পড়িল তক্তাপোশ আর একপাশে একটি টেবিল ও ছোট বেঞ্চি একখানি।

পড়াশুনা বিপুল বেগে আরম্ভ হইল।

লোকে যে বলে, পশু-মাস্টার গাধা পিটাইয়া ঘোড়া করিতে পারে—তাহা মোটেই মিথ্যা নয়। ছয় মাস না যাইতেই ননী শিশুশিক্ষা ছাড়াইয়া বোধোদয় ধরিল, পাটিগণিতের ত্রৈরাশিক শুরু হইয়া গিয়াছে, ফার্স্ট বুকও শেষ হইবার বড় বেশি দেরি নাই।

আশ্বিন মাস। দেবীপক্ষের দ্বিতীয়া তিথি।

অন্যান্য বার মহালয়ার সঙ্গেই ইস্কুল বন্ধ হইয়া যায়। এবার বছর বড় খারাপ, ছেলেরা মাহিনাপত্র মোটে দিতেছে না, তাই দেরি পড়িয়া যাইতেছে।

সকাল হইতে আকাশ মেঘলা। স্নান সম্বন্ধে বারমাসই পশুপতি একটু বেশি সাবধান হইয়া চলে; এমন বাদলার দিনে তো আরোই।

খাওয়া-দাওয়া সারিয়া ইস্কুলের পথে পা বাড়াইয়াছে, এমন সময়ে পিওন একখানা চিঠি দিয়া গেল।

খামের চিঠি হইলে কি হয়, ইস্কুলমাস্টারের নামে আসিয়াছে—অতএব ভিতরে এমন কিছু থাকিতে পারে না, যাহা না পড়া পর্যন্ত প্রাণ আছাড়িপিছাড়ি খাইতে থাকে। এমনই আঁকাবাঁকা অক্ষরে ঠিকানা লেখা খাম পশুপতির নামে বহুকাল ধরিয়া আসিতেছে। বিবাহের পর প্রথম বছর তিন-চারের কথা ছাড়িয়া দিলে পরবর্তী সকল চিঠির সুর একটিমাত্র। খাম না ছিঁড়িয়া পত্রের মর্ম স্বচ্ছন্দে আগে হইতে বলিয়া দেওয়া যায়, প্রভাসিনী সংসার-খরচের টাকা চাহিয়াছে।

ইস্কুলে গিয়া স্থির হইয়া বসিতে না বসিতে ঘণ্টা বাজিল।

প্রথমে অঙ্কের ক্লাস। ক্লাসে ঢুকিয়াই প্রকাণ্ড একটা জটিল ভগ্নাংশ বোর্ডে লিখিয়া পশুপতি হুঙ্কার দিল, খাতা বের কর্—টুকে নে। বলাটা অধিকন্তু, সকল ছেলে ইহা জানে এবং প্রস্তুত হইয়াই ছিল। তারপর বোর্ডের উপর নক্ষত্রগতিতে অঙ্কের ঘোড়দৌড় আরম্ভ হইল। পশুপতি কষিয়া যাইতেছে, মুছিতেছে, আবার কষিতেছে। জোর কদমে-চলা ঘোড়ার খুরের মতো খটাখট ক্রমাগত খড়ির আওয়াজ, তা ছাড়া সমস্ত ক্লাস নিস্তব্ধ। ক্লাসের মধ্যে যেন কোন ছেলে নাই, কিংবা থাকিলেও হয়তো একেবারে মরিয়া আছে। প্রকাণ্ড খড়ির তাল দেখিতে দেখিতে জ্যামিতিক বিন্দুতে পরিণত হইয়া গেল। ছেলেরা একটা অঙ্কের মাঝামাঝি লিখিতে লিখিতে তাকাইয়া দেখে কোন্ ফাঁকে সেটা শেষ হইয়া আর একটি শুরু হইয়াছে; দ্বিতীয়টি না লিখিতে সেটা মুছিয়া তৃতীয় একটা আরম্ভ হয় এবং সেটা ধরিবার উপক্রম করিতে করিতে পরেরটি শেষ হইয়া যায়। গায়ে তাহার নীল খদ্দরের জামা। ইহারই মধ্যে যখন একটু ফাঁক পায়, পকেট হইতে নস্যের শামুক বাহির করিয়া এক টিপ নাকে গুঁজিয়া দেয়, তারপর নাকের বাহিরের নস্য ঝাড়িয়া হাতখানা জামার উপর ঘষিয়া সাফ করিয়া আরম্ভ করে, শেষ হল? ফের দিচ্ছি আর গোটা আষ্টেক—

এমনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা। লোকের মুখে পশু-মাস্টারের এং নামডাক শুধু-শুধু হয় নাই, সে তিলার্ধ ফাঁকি দেয় না।

চারিটা ক্লাস পড়াইবার পর টিফিনের ঘণ্টা বাজিলে পশুপতি বাহির হইয়া আসিল। তখন নস্য ও খড়ির গুঁড়ায় জামার নীল রঙ ধূসর হইয়া গিয়াছে।

সিঁড়ির নিচে জানলাহীন ঘরখানিতে ক্লাস বসান যায় না। ইনস্পেক্টর মানা করিয়া গিয়াছে, সেখানে বসিলে ছেলেদের স্বাস্থ্য খারাপ হইয়া যাইবে। সেইটি মাস্টারদের বসিবার-ঘর। ইতিমধ্যেই সকলে আসিয়া জুটিয়াছেন। হুঁকা গোটা পাঁচ-সাত—কোনটার গলায় কড়ি-বাঁধা, কোনটায় কেবলমাত্র রাঙা সুতা, একটির মলচের উপর আবার ছুরি দিয়া গর্ত করিয়া লেখা হইয়াছে—'মা' অর্থাৎ মাহিষ্যের হুঁকা। নিজ নিজ জাতি বিবেচনা করিয়া মাস্টাররা উহার এক একটি তুলিয়া লইলেন। যাঁহাদের ভাগ্যে হুঁকা জোটে নাই, তাঁহারা অন্তকল্পে বিড়ি ধরাইলেন। ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় ছোট ঘরখানি অন্ধকার। রসালাপ ও প্রচণ্ড হাসি ক্রমশ জমিয়া আসিল। ক্ষণে ক্ষণে আশঙ্কা হয়, বুঝি-বা অত আনন্দের ধাক্কা সহিতে না পারিয়া বহুকালের পুরানো ছাদ ভাঙিয়া-চুরিয়া সকলের ঘাড়ে আসিয়া পড়িবে।

কিন্তু ইস্কুলের জন্মকাল হইতে এমনি আটত্রিশ বছর চলিয়া আসিতেছে, ছাদ ভাঙিয়া পড়ে নাই।

উহারই মধ্যে একটা কোণে বসিয়া পশুপতি খামখানা খুলিল। খুলিতেই আসল চিঠিখানা ছাড়া আর এক টুকরা কাগজ উড়িয়া মেজেয় গিয়া পড়িল। তুলিয়া দেখে—অবাক কাণ্ড! ইহা হইল কি করিয়া?

এই সেদিন মাত্র সে খোকাকে ধরিয়া ধরিয়া অ-আ লেখাইয়া বাড়ি হইতে আসিয়াছে, এরই মধ্যে ছেলে নিজের হাতে পত্র লিখিয়াছে। কাহাকে দিয়া কাগজের উপর পেন্সিলের দাগ কাটিয়া লইয়াছে, সেই ফাঁকের মধ্যে বড় বড় করিয়া লিখিয়াছে—

বাবা, আমি পড়িতে ও লিখিতে শিখিয়াছি। ছবির বই আনিবে। ইতি—কমল।

একবার, দুইবার, তিনবার সে পড়িল। লেখা যেমনই হউক, অক্ষরের ছাঁদ কিন্তু বেশ। বড় হইলে খোকার হাতের লেখা ভারি সুন্দর হইবে। পশুপতি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিল। এই ছেলে আবার বড় হইবে, তাহার দুঃখ ঘুচাইবে, বিশ্বাস তো হয় না। পর পর আরও

তিনটি এমনি বয়সে ফাঁকি দিয়া চলিয়া গিয়াছে।···ভাবিতে ভাবিতে সে কেমন একটু উন্মনা হইয়া পড়িল।

পরক্ষণে খোকার চিঠি খামে পুরিয়া বাহির করিল প্রভাসিনী যেখানা লিখিয়াছে।

ছোট ছোট অক্ষরের সারি চলিয়াছে যেন সারবন্দি পিপীলিকা। বিস্তর দরকারি কথা—সাংসারিক অনটন, 'ধানচালের বাজার-দর, গোয়ালের ফুটা চাল দিয়া জল পড়িতেছে, তারিণী মুখুয্যে বাস্তভিটার খাজনার জন্য রোজ একবার তাগাদা করিয়া যায়—ইত্যাদি সমাপ্ত করিয়া শেষকালে আসিয়া ঠেকিয়াছে কয়েকটি অত্যাবশ্যক জিনিষের ফর্দ—ছুটিতে বাড়ি যাইবার মুখে খুলনা হইতে অতি অবশ্য সেগুলি কিনিয়া লইয়া যাইতে হইবে, ভুল না হয়।

পশুপতি ফর্দখানির উপর আর একবার চোখ বুলাইয়া, তারপর পকেট হইতে পেন্সিল লইয়া পাশে পাশে দাম ধরিতে লাগিল।

কি ভাগ্য যে এতক্ষণ এদিকে কাহারও নজর পড়ে নাই। এইবার রসিক পণ্ডিত দেখিতে পাইল এবং ইসারা করিয়া সকলকে কাণ্ডটা দেখাইল। তারপর হঠাৎ ভারি ব্যস্ত হইয়া বলিতে লাগিল, পশুভায়া, করেছ কি? হাটের মধ্যে প্রেমপত্তোর বের করতে হয়? ঢাকো—শিগগীর ঢাকো, সব দেখে নিল—

পশুপতি আপনার মনে ছিল, তাড়াতাড়ি চিঠি চাপা দিয়া : তুলিল।

হাসি চাপিয়া অত্যন্ত ভালমানুষের মতো রসিক কহিল, নকুড়চন্দোর বাবুর কাণ্ড, আড়চোখে দেখছিলেন।

নকুড়চন্দ্র বসিয়াছিলেন ঘরের বিপরীত কোণে। বুড়ামানুষ কাহারও স্ত্রীর চিঠি চুরি করিয়া দেখিবার বয়স তাঁহার নাই। পশুপ বুঝিল, ইহাদের সুদৃষ্টি যখন পড়িয়াছে এখানে বসিয়া আর কিছু হই না। উঠিয়া পড়িল।

মন্মথ গরাই অত্যন্ত সহানুভূতি দেখাইয়া বলিল, মিছে ক পশুপতিবাবু, কেউ দেখছে না। আপনি বসুন, বসুন। পণ্ডিত মশায়ে অন্যায়, ভদ্রলোকের পাঠে বাধা দিলেন। আপনি এই আযার পা

এসে বস্থন।···গিন্নি কি পাঠ দিয়েছেন সেইটে একবার পড়ে শোনাতে হবে কিন্তু—

পশুপতি কোনদিন এই সব রসিকতায় যোগ দেয় না। আজ তাহার কি হইয়াছে, বলিল, এই কথা? তা শুহুন না—বলিয়া চিঠির উপর দৃষ্টি দিয়া মিছামিছি বলিতে লাগিল, প্রাণবল্লভ, প্রাণেশ্বর, হৃদয়রঞ্জন—আর সব ও-পাতায় আছে, হল তো! পথ ছাড়ুন মন্মথবাবু—

বলিয়া হাসিতে হাসিতে বাহির হইয়া গেল।

রসিক কহিতে লাগিল, দেখলে? তোমরা তর্ক করতে, পশুপতি হাসতে জানে না—দেখলে তো? অন্য দিন বাড়ির চিঠি পেলে মাথায় হাত দিয়ে বসে, আজ যেন নবযৌবন পেয়েছে। ওহে মন্মথ, আজকের চিঠিতে কি আছে একবার দেখতে পার চুরি-চামারি করে?

ঘরের বাহির হইয়াই কিন্তু পশুপতির হাসি নিবিয়া গিয়া ভাবনা ধরিল—পাঁচ টাকা দু আনার মধ্যে প্রভাসিনীর শাড়ি, খোকার জামা, জিরামরিচ, পানে খাইবার চুন দু-সের, এক কৌটা বার্লি, বালতি এবং ছবির বই—এতগুলি কি করিয়া কুলাইয়া উঠে?

তখন ছেলের দল হাসিয়া খেলিয়া চেঁচাইয়া লাফাইয়া ইস্কুলের উঠানটি মাত করিয়া ফেলিয়াছে। পশু-মাস্টারকে দেখিয়া সকলে সন্ত্রস্তভাবে পথ ছাড়িয়া দিতে লাগিল।

কিন্তু পশুপতির কোন দিকে নজর নাই, সে ভাবিতেছে—

ইস্কুলে পঁচিশ টাকা বলিয়া তাহাকে সহি করিতে হয়, কিন্তু আসল মাহিনা পনর টাকা। চিঠিতে ঐ যে তারিণী মুখুয্যের তাগাদার কথা লিখিয়াছে, এবার বাড়ি গিয়া মুখুয্যের খাজনা অন্তত টাকা তিন-চার না দিলে রক্ষা নাই। আবার অগ্রহায়ণে নূতন ধান-চাল উঠিবে, চাষীদের সহিত ঠিকঠাক করিয়া এখনই অগ্রিম কিছু দিয়া আসিতে হইবে, না হইলে পরে দেখিয়া শুনিয়া কে কিনিয়া দিবে? অতএব ইস্কুলের মাহিনার এক পয়সা খরচ করিলে হইবে না। ভরসা কেবল রামোত্তমের বাড়ির আটটি টাকা। তাহা হইতে বাড়ি যাইবার রেল-স্টিমারের ভাড়া দুই টাকা চৌদ্দ আনা বাদ দিলে দাঁড়ায়

পাঁচ টাকা দু-আনা। সমস্ত পূজার বাজার ঐ পাঁচ টাকা দু-আনার মধ্যে।

হেডমাস্টার কোন দিক দিয়া হঠাৎ কাছে আসিয়া ফিশ-ফিশ করিয়া কহিলেন, সেক্রেটারির অর্ডার এসেছে, বন্ধ শনিবারে। ছেলেদের এখন কিছু বলবেন না, খালি ভয় দেখাবেন—কালকের মধ্যে যদি মাইনে সব শোধ না করে তবে একদম ছুটি হবে না। মাইনে-পত্তোর আদায় যদি না হয়, বুঝতে পারছেন তো?

ছুটির পর পশুপতি ও বুড়া নকুড়চন্দ্র পাকা-রাস্তার পথ ধরিল। নকুড় কহিলেন, বন্ধ তা হলে শনিবারে ঠিক? শনিবারেই রওনা হচ্ছ পশুবাবু?

সে কথার জবাব না দিয়া পশুপতি জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা নকুড়বাবু, ছবির এই একখানার দাম কত?

কি বই তা বল আগে। ছবির বই কি একরকম? দু-টাকার তিন টাকার আছে, আবার বিনি পয়সাতেও হয়।

পশুপতি কাছে আসিয়া আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিল, বিনি পয়সায় কি রকম? বিনি পয়সায় ছবির বই দেয় নাকি? কি বই?

নকুড় কহিলেন, ক্যাটালগ। ছেলে-ভুলানো ব্যাপার তো? এক-খানা কবিরাজি ক্যাটালগ নিয়ে যেও। এই সব, হাঁপানি-সংহারক তৈল—পাশে দিব্যি ছবি, একটা লোক ধুঁকছে—কোলের উপর বালিশ—বউ তেল মালিশ করছে। ছেলেকে দেখিয়ে দিও।

এ যুক্তি পশুপতির পছন্দ হইল না, হাসি পাইল। কমলকে দেখেন নাই তো! সে যে বানান করিয়া করিয়া পড়িতে শিখিয়াছে, তাহার কাছে চালাকি চলিবে না।

কহিল, না তাতে কাজ নেই। একখানা ছবির বই, সত্যি-সত্যি ছবির বইয়ের দাম কত পড়বে? দু-টাকা তিন টাকা ও-সব বড়মাহুষি কথা ছেড়ে দিন, খুব কমের মধ্যে—যার কমে আর হয় না, কত লাগবে?

নকুড় কহিলেন, বোধ হয় গণ্ডা চারেক পয়সা নেবে, কিনি নি

কখনও। মাস্টারির পয়সা—মুখে রক্ত-ওঠানো পয়সা। ও রকম বাজে খরচ করলে চলে?

পশুপতি তখন ফর্দ বাহির করিয়া আর একবার পড়িতে পড়িতে জিজ্ঞাসা করিল, আর, পাথুরে চুন দু-সের?

নকুড় কহিলেন, তিন আনা।

এবারে নকুড়ের হাতে কমলের চিঠিটুকু দিল। কহিল, দেখুন মশাই, ছেলে আবার চিঠি লিখেছে—ফরমায়েসটা দেখুন পড়ে একবার। বলিয়া হা-হা করিয়া হাসিতে লাগিল। তারপর বড় ফর্দখানি দেখাইয়া বলিল, বড় সমস্যায় পড়েছি, একটা সংযুক্তি দিন তো নকুড়বাবু। পুঁজি মোটে পাঁচ টাকা দু-আনা—ফর্দের কোন কোনটা বাদ দি?

দেখি—বলিয়া নকুড় চশমা বাহির করিয়া নাকের উপর পরিলেন। তারপর বিশেষ প্রণিধান করিয়া বলিলেন, ছেলেপেলের ঘর, দুধ মেলে না বোধ হয়—তাই বালির কথা লিখেছে। ওটা নিয়ে যেও। তা জিরেমরিচ চুন-টুন সব বাদ দাও। ছবির বই পয়সা দিয়ে কিনে কি হবে? যা বললাম, পার তো একখানা ক্যাটালগ নিয়ে যেও। তোমরা বোঝ না—ছেলেপিলে যখন আবদার করে, মোটে আস্কারা দিতে নেই। তাদের শিখিয়ে দিতে হয়, এক আধলাও যাতে বাজে খরচ না করে। গোড়া থেকে মিতব্যয়িতা শিখুক, তবে তো মানুষ হবে—

মনে কেমন কেমন লাগে বটে, কিন্তু মোটের উপর নকুড়ের কথাটা ঠিক। পশুপতির স্মরণ হইল, সে-ও ক্লাশের একখানি বাংলা বহিতে সেদিন পড়াইতেছিল—'অপব্যয় না করিলে অভাব হয় না। হে শিশুগণ, তোমরা মিতব্যয়ী হইতে অভ্যাস করিবে। তাহা হইলে জীবনে কদাপি দুঃখ-কষ্ট ভোগ করিতে হইবে না ...' এমনি অনেক ভাল ভাল কথা।

ছবির বই জিরামরিচ ও চুন কিনিয়া কাজ নাই তবে, বালতি বার্লি ও কাপড়-জামা কিনিয়া লইলেই চলিবে।

নকুড় কহিতে লাগিলেন, তিল কুড়িয়ে তাল! হিসেব করে দেখ ত ভায়া, ছেলেবেলা থেকে আজ পর্যন্ত আমরা কত পয়সা অপব্যয় করেছি। সেইগুলি যদি জমানো থাকত, তবে আজ দুঃখ কিসের? বাঙালি জাত দুঃখ পায় কি সাধে?

পশুপতি আর কথা না কহিয়া ভাবিতে ভাবিতে চলিল।

গ্রামের মধ্যে কয়েক বাড়ি দেবীর ঘটস্থাপনা হইয়াছে। বড় মধুর সানাই বাজিতেছে। পশুপতির কানে নূতন লাগিল, এমন বাজনা সে অনেক দিন শোনে নাই।

হঠাৎ সে হাসিয়া উঠিল। বলিল, কথা যা বললেন নকুড়বাবু, ঠিক কথা! আমরা কি হিসেব করে চলি? আমাকে আজ দেখছেন এই রকম—শখ করে আমিই একবার একখানা বই কিনি—সে-ও একরকম ছবির বই, ইস্কুল-কলেজে পড়ায় না। দাম পাঁচ টাকা পুরো।

নকুড় শিহরিয়া উঠিলেন, পাঁচ টাকার বাজে বই—বল কি?

হুঁ, পাঁচ টাকা। তখন কি আমার এই দশা! বাবা বেঁচে। পায় পাম্প-শু, মাথায় টেড়ি। কলকাতায় বোর্ডিংয়ে থেকে পড়তাম। মাসে মাসে টাকা আসে। ফুর্তি কত। বইখানার নাম চিত্রাঙ্গদা—সেই যে অর্জুন আর চিত্রাঙ্গদা—পড়েন নি?

নকুড় কহিলেন, পড়ি নি আবার, কতবার পড়েছি। বল যে মহাভারত। আজ সেই মহাভারত বিকুচ্ছে এগার সিকেয়।

পশুপতি কহিল, মহাভারত নয়, তাহলেও বুঝতাম বই পড়ে পরকালের কিছু কাজ হবে। এমনি একখানা পদ্যের বই, পাতায় পাতায় ছবি। রাতদিন তাই পড়ে পড়ে মুখস্থ করতাম। এখন একটা লাইনও মনে নেই।

পশুপতির নির্বুদ্ধিতার গল্প শুনিয়া নকুড় আর কথা বলিতে পারিলেন না। মহাভারত রামায়ণ নয়, মহামান্য ডিরেক্টর বাহাদুরের অনুমোদিত ইস্কুল-পাঠ্য বা কলেজের বই নয়, এমন বই লোক পাঁচ টাকা দিয়া কিনিয়া পড়ে।

সেই-সব দিনের অবিবেচনার কথা ভাবিয়া পশুপতিরও অনুতাপ হইতেছিল। বলিল—তা-ও কি বইটা আছে? জানা নেই, শোনা নেই—পরস্য পর একটা মেয়ে—নির্বিচারে দামি বইটা তার হাতে তুলে দিলাম। কি বোকাই যে ছিলাম তখন! ও—আপনি তো এসে পড়েছেন একেবারে—আচ্ছা—

নকুড় বামদিকের বাঁশতলার সরুপথে নামিয়া পড়িলেন। সামনেই

তাঁহার বাড়ি। কহিলেন, কাল আবার দেখা হবে। তাড়াতাড়ি চলে যাও পশুবাবু, চারিদিকে থমথমা খেয়ে আছে, বিষ্টি নামবে এক্ষুণি।

তখন সত্যসত্যই চারিদিক নিষ্কম্প, বাতাস আদৌ-নাই, গাছের পাতাটি নড়িতেছে না। মাথার উপরে অতি-ব্যস্ত আকাশ মেঘের উপর মেঘ সাজাইয়া নিঃশব্দে আয়োজন পরিপূর্ণ করিয়া তুলিতেছে।

আজ পাঁচ টাকার মধ্যে সমস্ত পূজা। বাজার সারিতে হইতেছে, আর বহু বৎসর পূর্বে একদিন ঐ দামের একখানি নূতন বই নিতান্ত শখ করিয়া বিসর্জন দিয়াছিল, একবিন্দু ক্ষোভ হয় নাই—চলিতে চলিতে বহুকাল পরে পশুপতির সেই কথা মনে পড়িতে লাগিল।

কলিকাতা হইতে সে বাড়ি ফিরিতেছিল [illegible] আশা ও উল্লাসে, হাতে চিত্রাঙ্গদা।

বনগাঁর পর দু-তিনটা স্টেশন ছাড়াইয়া—সে স্টেশনে ট্রেন থামিবার কথা নয়—[illegible] থামিল। ইঞ্জিনের [illegible] কি কল বিগড়াইয়া গিয়াছে। যাত্রীরা অনেকে নামিয়া পড়িল।

প্লাটফর্মের উপর দক্ষিণ দিকটায় জোড়া পাকুড়গাছ ছায়া করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, তাহার গোড়ায় স্টেশনের মরিচা-ধরা ওজনের কলটি। পাকুড়গাছের গুঁড়ি ঠেস দিয়া [illegible]। কলটির উপর বসিয়া পশুপতি চিত্রাঙ্গদা খুলিয়া পড়িতে বসিল। লাইনের ওপারে অনেক দূরে সূর্য অস্ত যায়-যায়। কুয়ায় কলসি ভরিয়া আল-পথে গ্রামে ফিরিতে ফিরিতে বৌ-ঝিরা তাকাইয়া তাকাইয়া রেলগাড়ি দেখিতেছিল।

পশুপতি একমনে পড়িয়া চলিয়াছে। ঠিক স্মরণে নাই, বোধকরি অর্জুনের সঙ্গে চিত্রাঙ্গদার প্রথম পরিচয়ের মুখটা—খাসা জমিয়া উঠিয়াছে। এমন সময়ে সে অনুভব করিল, জোড়াগাছের পিছনে কেহ আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। সেখানে চিত্রাঙ্গদার আসিবার তো সম্ভাবনা নাই। পশুপতি ভাবিল, হয় পানিপাঁড়ে কি পয়েণ্টস্‌ম্যান, নয় তো ছাগলে গাছের পাতা খাইতে আসিয়াছে। অতএব না ফিরিয়া পাতা উল্টাইতে যাইতেছে, এমন সময়ে কাচের চুড়ি বাজিয়া উঠিল।

তাকাইয়া দেখে, বছর আষ্টেকের একটি মেয়ে; মুখখানার চারিপাশে কালো কালো চুলগুলি ছড়াইয়া পড়িয়া আছে।

পশুপতি স্পষ্ট দেখিতে পাইল, মেয়েটির বড় বড় চোখ দু'টির উপর লেখা রহিয়াছে—সে ঐ পাতার ছবিগুলি ভাল করিয়া দেখিবে। আপিস-ঘরে টেলিগ্রাফের কল টক-টক করিয়া বাজিয়া যাইতেছিল এবং লাইনের উপরে ইঞ্জিন একটানা শব্দ করিতেছিল—ইস্‌-স্‌-স্‌। আজ পশুপতি ভাবিতেছে, সে-সব নিছক পাগলামি—সেদিন কিন্তু সত্যসত্যই তাহার মনের মধ্যে এরূপ একটা ভাবাবেশ জমিয়া আসিয়াছিল, যেন সুবিপুল ব্রহ্মাণ্ডও তাহার গতিবেগ থামাইয়া ম্লান অপরাহ্ন-আলোয় মেয়েটির লুব্ধ ভীরু চোখ দু'টিকে সমীহ করিয়া প্লাটফরমের ধারে চুপটি করিয়া দাঁড়াইয়া গেল। জিজ্ঞাসা করিল, খুকী, ছবি দেখবে? দেখ না কেমন খাসা খাসা সব ছবি।

অনুরোধের অপেক্ষামাত্র। তৎক্ষণাৎ মেয়েটি সেই মরিচা-ধরা ওজন-যন্ত্রের উপর বিনাদ্বিধায় পশুপতির পাশে বসিয়া পড়িল।

পশুপতি ছবির মানে বলিয়া দিতেছিল, সে নিজেও পশুপতির পাণ্ডিত্যের মর্যাদা না রাখিয়া সঙ্গে সঙ্গে বানান করিয়া পড়িতেছিল। এমন সময় ঘণ্টা দিল। ইঞ্জিন ঠিক হইয়াছে—এইবার ছাড়িবে। পশুপতির মনে হইল, অতিরিক্ত তাড়াতাড়ি করিয়া ইঞ্জিন ঠিক হইয়া গেল। মেয়েটির মুখখানিও হঠাৎ কেমন হইয়া গেল—তাহার ছবি দেখা তখনও শেষ হয় নাই, সে কথা মোটে না ভাবিয়া রেলগাড়ি তার সুদীর্ঘ জঠরে ছবির বই সমেত মানুষটিকে লইয়া এখনি গুড়গুড় করিয়া বিলের মধ্য দিয়া দৌড়াইবে—বোধ করি এইরূপ ভাবনায়। বইখানি মুড়িয়া নিজেই সে পশুপতির হাতে দিল, কোন কথা বলিল না।

পশুপতি সেই সময়ে করিয়া বসিল প্রকাণ্ড বে-হিসাবি কাজ। সেই চিত্রাঙ্গদা তাহার ডুরে—শাড়ির উপর রাখিয়া বলিল, এ বই তুমি রেখে দাও—ছবি দেখো, আর বড় হলে পড়ে দেখো—। নূতন বই—প্রায় আনকোরা, পাঁচ পাঁচটা টাকা দিয়া কিনিয়াছিল। কেবল নিজের নামটি ছাড়া কালির আঁচড় পড়ে নাই। কাহাকে দিল, তাহার পরিচয়ও জানে

না—হয়তো কোন রেলবাবুর মেয়ে কিংবা যাত্রীদের কেহ, অথবা নিকটবর্তী গ্রামবাসিনীও হইতে পারে।

*   *   *

রামোত্তম রায়ের বাড়ি বড় রাস্তার ঠিক পাশেই। রোয়াকে উঠিয়া পশুপতি ডাকিল, ও ননী, এক গ্লাস জল দিয়ে যা তো বাবা।

ননী জল দিয়া গেল। তাকের উপরে কাগজের ঠোঙায় এক পয়সার করিয়া বাতাসা কেনা থাকে। তাহার দুইখানি গালের মধ্যে ফেলিয়া ঢক-ঢক করিয়া সমস্ত জল খাইয়া পরম পরিতৃপ্তিতে পশুপতি কহিল, আঃ—

ইহাই নিত্যকার বৈকালিক জলযোগ। তারপর এক ছিলিম তামাক খাইয়া চোখ বুজিয়া সে অনেকক্ষণ বিছানার উপর পড়িয়া রহিল।

সন্ধ্যা হইতে-না হইতে প্রবলবেগে বৃষ্টি আসিল, সঙ্গে সঙ্গে বাতাস। রোয়াকের গোড়া হইতে একেবারে বড়রাস্তা অবধি উঠানের উপর দুই সারি সুপারিগাছ। গাছগুলি যেন মাথা ভাঙাভাঙি করিয়া মরিতেছে। জল গড়াইয়া উঠান ভাসাইয়া কলকল শব্দে রাস্তার নদামায় গিয়া পড়িতে লাগিল। কি মনে করিয়া পশুপতি তাড়াতাড়ি উঠিয়া জামার পকেট হইতে কমলের পত্র বাহির করিয়া পড়িতে লাগিল।

ক্রমে চারিদিক আরও আঁধার করিয়া আসিল, আর নজর চলে না।

রাস্তার ঠিক ওপার হইতে ধানভরা সবুজ সুবিস্তীর্ণ বিলের আরম্ভ হইয়াছে, তাহার পরপারে অতি অস্পষ্ট খেজুর ও নারিকেল-বন। সেইদিকে চাহিয়া পশুপতির মনটা হঠাৎ কেমন করিয়া উঠিল। ঐ নারিকেলগাছের ছায়ায় গ্রামের মধ্যে চাষীদের ঘরবাড়ি। বৃষ্টি ও অন্ধকারে বাড়ি দেখা যাইতেছে না, অতি ক্ষীণ এক একটা আলো কেবল নজরে পড়ে। গ্রামটি ছাড়াইলে তারপর হয়তো আবার বিল। এমনি কত গ্রাম, কত খালবিল, কত বাবোবেঁকি কাটিগাঙ্গা ও নাম-না-জানা বড় বড় গাঙ পার হইয়া শেষকালে আসিবে তাহার গ্রামের পাশের পশর নদী। ভাঁটা সরিয়া গেলে আজকাল চরের উপর বাঁধের ধারে ধারে শরতের মেঘভাঙা রৌদ্রে সেখানে বড় বড় কুমীর শুইয়া

থাকে। বাবলাগাছে হলদে-পাখী ডাকে। কমল মিহি সুরে অবিকল পাখীর ডাকের নকল করিতে পারে, বউ সরষে কোট্, বউ—

এমন দুষ্ট হইয়াছে কমলটা।

তাহাদের গ্রামের ঘাটে স্টিমার আসিয়া লাগে সন্ধ্যার পর। ঘাটের কাছেই বাড়ি, অন্ধকার সাবেক কালের আম-বাগান এবং নাটা ও বেতের ঝোপ-জঙ্গলের মধ্য দিয়া সরু পথ। তাহারই ফাঁকে ফাঁকে জোনাকিপোকার মতো একটি অতিশয় ছোট্ট আলো দূরে—বহুদূরে—পশুপতির স্তিমিত দৃষ্টির অগ্রে ঐ যেন ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে—আলো ছোট হইলে কি হয়, পশুপতি স্পষ্ট দেখিতে লাগিল। আচ্ছা, তাহাদের গ্রামেও কি এত রকম ঝড় বৃষ্টি হইতেছে? এই রকম অন্ধকার আকাশ, মেঘের ডাক...? হয়তো এসব কিছুই নয়। হয়তো সে-দেশে এখন আকাশ-ভরা তারা, এবং ঐ প্রাসিনী এতক্ষণ রান্নার জোগাড় করিতে করিতে আলো লইয়া এঘর-ওঘর করিতেছে। আর চারদিন পরে পশুপতি সেই অপূর্ব শীতল ছায়াচ্ছন্ন উঠানে গিয়া দাঁড়াইবে। খোকা?—সোনামাণিক খোকন তখন কি করিতেছে? পড়িতেছে বোধ হয়—

পশুপতি ভাবিতে লাগিল, সে যেন পদ্মার নদীর পারে তাহাদের চণ্ডীমণ্ডপে গিয়া উঠিয়াছে, কমল খোকার সঙ্গে প্রদীপের আলোয় পড়া মুখস্থ করিতেছিল, বাপের সাড়া পাইয়া উঠানের উপর দিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে ছুটিল। এমন ছুটিতেছে, বুঝি-বা পড়িয়া যায়।

আস্তে আয়, ওরে পাগলা একটু দেখে শুনে—অন্ধকারে হোঁচট খাবি, অত দৌড়স নি—

ঘনান্ধকার দুর্যোগের মধ্যে বহুদূর হইতে কমল আসিয়া যেন দুই হাত উঁচু করিয়া ক্লান্তদেহ অকালবৃদ্ধ ইস্কুল-মাস্টারের কোলে ঝাঁপ দিয়া পড়িল।···

রামোত্তম এতক্ষণ কাছারি-ঘরে কি কাজকর্ম করিতেছিলেন। এইবার বাড়ির মধ্যে চলিলেন। পশুপতিকে বলিলেন, মাস্টারমশায়, আপনিও চলুন—বাদলা-রাত্তিরে সকাল সকাল খেয়ে শুয়ে পড়ুন আর কি! এই বৃষ্টিতে আপনার ছাত্তোর আর আসবে না।

খাওয়া-দাওয়া সারিয়া পশুপতি সকাল সকাল শুইয়া পড়িল। আলো নিবাইয়া দিল।

শুইয়া শুইয়া শুনিতে লাগিল, ঝড় দালানের দেয়ালে যেন উন্মত্ত ঐরাবতের ন্যায় ছুটিয়া আসিয়া হুমড়ি খাইয়া পড়িতেছে, রুদ্ধ দরজা-জানলা খড়খড় করিয়া ঝাঁকাইতেছে, আকাশ চিরিয়া মেঘের ডাক, ছাদের নল হইতে ছড়-ছড় করিয়া জল পড়ার শব্দ -সমস্ত মিলিয়া ঝটিকাক্ষুব্ধ নিশীথিনীর একটানা অস্পষ্ট চাপা আর্তনাদের মতো শোনাইতেছে।

পশুপতি আরাম করিয়া কাঁথা টানিয়া গায়ে দিল।

সেই অবিরল বাতাস ও বৃষ্টিধ্বনির মধ্যে পশুপতি শুনিতে লাগিল, গুনগুন গুনগুন করিয়া কমল পড়া মুখস্থ করিতেছে। কণ্ঠ কখনও উচ্চে উঠিতেছে, কখনও ক্ষীণ—ক্ষীণতর—অস্ফুটতম হইয়া সুরের শেষটুকু মাত্র কাঁপিয়া কাঁপিয়া বাজিতেছে। তন্দ্রা-ঘোরে আঁধার আমবাগানের মধ্য দিয়া বাড়িমুখো যাইতে যাইতে সে শুনিতে লাগিল। মনে হইল, ঘরের দাওয়ায় বাজারের পুঁটুলি নামাইয়া সে যেন ডাকিতেছে, কই গো, কোথায় সব?

খোকা আসিয়া সবাগ্রে পুঁটুলি লইয়া খুলিয়া ফেলিল। জিনিসপত্র একটা একটা করিয়া সরাইয়া রাখিতেছে, কি খুঁজিতেছে পশুপতি তাহা জানে। ম্লানমুখে কমল প্রশ্ন করিল, বাবা, আমার ছবির বই?

পশুপতি উত্তর দিল, সোনামাণিক আমার, বই তো আনতে পারি নি। অপব্যয় করতে নেই — লক্ষ্মী খোকা, পয়সাকড়ি খুব বুঝেসুঝে খরচ করতে হয়। তা হলে পরে আর ভাত পাবি নে।

ছেলে ঠোঁট ফুলাইয়া সরিয়া বসিল। অবোধ বালকের অভিমানাহত মুখখানির স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে কতক্ষণ পরে পশুপতি ঘুমাইয়া পড়িল।

গভীর রাত্রিতে হঠাৎ জাগিয়া ধড়মড় করিয়া সে বিছানার উপর উঠিয়া বসিল। প্রাণপণ বলে বারংবার কে যেন দ্বারে ধাক্কা দিতেছে।

ঝড়ের বেগ আরও বাড়িয়াছে বুঝি। এ কি প্রলয়ঙ্কর কাণ্ড, দরজা সত্য সত্যই চুরমার করিয়া ফেলিবে না কি?

অন্ধকার ঘর। পশুপতির বোধ হইল, বাহির হইতে কে যেন ডাকিয়া ডাকিয়া খুন হইতেছে, দুয়োর খুলুন—দুয়োর খুলুন—

তখনও ঘুমের ঘোর কাটে নাই। তার সর্বদেহ শিহরিয়া উঠিল। ঝটিকামথিত দুর্যোগ আঁধার বর্ষা-নিশীথ। নির্জন সুখসুপ্ত গ্রামের একপাশে দিগন্তবিসারী বিলের প্রান্তে নারোত্তম বাবুর বাহির-বাড়ির দোয়ারে দাঁড়াইয়া কে অমন আতকণ্ঠে বারংবার দরজা খুলিয়া দিতে বলে।

শিকলের ঝনঝনানি শব্দ বাড়িয়া উঠিল। নিশ্চয় মানুষ। পশুপতি উঠিয়া খিল খুলিয়া দিতেই কবাট দুইখানি দড়াম করিয়া দেয়ালে লাগিল এবং ঝড়ের বেগেই যেন ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল একটি পুরুষ, পিছনে এক নারী।

মেয়েটির হাতের চুড়ি ঝিন ঝিন করিয়া উপরে বাজিয়া উঠিল এবং কাপড় চোপড় হইতে অতি কোমল মৃদু সুগন্ধ আসিয়া পশুপতি মাস্টারের ঘর ভরিয়া গেল।

পুরুষ লোকটি আগাইয়া আসিতে গিয়া তক্তপোষে ধাক্কা খাইল। পশুপতি কহিল, দাঁড়ান, আলো জ্বালি।

হেরিকেন জ্বালিয়া দেখে, স্বাস্থ্য ও যৌবন লাবণ্যে দুজনেই ঝলমল করিতেছে। মেয়েটি ঘরের মধ্যে আসে নাই, চৌকাঠের ওপারে ছাদের নলের নিচে দাঁড়াইয়া পরম শান্তভাবে ভিজিতেছিল, মুখভরা হাসি। দেখিয়া যুবক ব্যস্ত হইয়া কহিল, আ—ও কি হচ্ছে লীলা এ কি পাগলামি তোমার? ইচ্ছে করে ভিজছ দুপুর রাতে?

সেখান হইতে সরিয়া আসিয়া বধূ মুখ টিপিয়া টিপিয়া হাসিতে লাগিল।

যুবক আরও চটিয়া কহিল, বড্ড স্ফূর্তি—না? এই সেদিন অসুখ থেকে উঠলে, আমি যত মানা করি তুমি মজা পেয়ে যাও যেন।

আঙুল তুলিয়া লীলা চুপি চুপি তর্জন করিয়া কহিল, বাবারে বাবা, তোমার শাসনের জ্বালায় যাই কোথায়? সেই তো কাপড় ছাড়তে হবে,

তা একটুখানি নেয়ে নিলাম—বলিয়া আঁচল তুলিয়া মুখে দিল, বোধকরি তাহার হাসি পশুপতি দেখিতে না পায় সেইজন্য।

যাক গে—আর একটা কথাও বলব না, মরে গেলেও না—বলিয়া যুবক গুম হইয়া রহিল। পরক্ষণে বাহিরে মুখ বাড়াইয়া ডাকিল, তুই কতক্ষণ ট্রাঙ্ক ঘাড়ে করে ভিজবি? এখানে এনে রাখ।

উহাদের চাকর এতক্ষণ বাক্স মাথায় করিয়া রোয়াকের কোণে দাঁড়াইয়া ছিল, ঘরের মধ্যে আসিয়া বাক্স নামাইয়া দিল।

যুবক কহিল, যদি ইচ্ছে হয় তবে দয়া করে বাক্সটা খুলে শিগগির ভিজে কাপড়চোপড়গুলো বদলান হোক, আর ইচ্ছে যদি না হয় তবে এক্ষুনি ফিরে মোটরে যাওয়া যাব। আমি আর বাড়াবাড়ি কিছু বলছি নে।

মেয়েটির হাসিমুখ আঁধার হইল, হেঁট হইয়া বাক্স খুলিতে লাগিল।

বাপ্ত দেখিয়া পশুপতি একেবারে হতভম্ব হইয়া গিয়াছিল। হঠাৎ এতরাত্রে এই তরুণ দম্পতি কোথা হইতে আসিল এবং আসিয়া নিঃসঙ্কোচে পশুপতির ঘরের ভিতর ঢুকিয়াই অমনি রাগারাগি আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। এতক্ষণ ইহাদের মধ্যে কথা বলিবার ফাঁকই পাইতেছিল না—এইবার বলিল, আপনারা তবে কাপড় ছাড়ুন, আমি লোকটাকে নিয়ে কাছারিঘরে বসিগে।

যুবক যেন এইমাত্র পশুপতিকে দেখিতে পাইল। কহিল কাপড়টা ছেড়ে আমিও যাচ্ছি। বড্ড কষ্ট দিলাম আপনাকে। আমি এ বাড়িতে আরও অনেকবার এসেছি, রাধেশ্যাম বাবু আমার পিসেমশাই হন। আপনাকে এর আগে দেখি নি। একটু আলাপ-টালাপ করব—তা মশায়, বাপারটা দেখলেন তো? সেদিন অসুখ থেকে উঠেছে, কচি খুকি নয়—একটু যদি বুদ্ধি জ্ঞান থাকে! একেবারে আস্ত পাগল।

লীলা মুখ রাঙা করিয়া একবার স্বামীর দিকে তাকাইল। তারপর রাগ করিয়া খুব জোরে জোরে ট্রাঙ্ক হইতে কাপড়চোপড় নামাইয়া ছড়াইয়া মেজেয় রাখিতে লাগিল। কাপড়ের সঙ্গে আতরের শিশি ঠক করিয়া পড়িয়া চুরমার হইয়া গেল।

পশুপতি ও চাকরটি ততক্ষণ কাছারিঘরে গিয়া বসিয়াছে।

যুবক কহিল, গেছে তো? তক্ষুণি জানি। আস্ত শিশিটা—এক ফোঁটাও খরচ হয় নি।

ক্রুদ্ধকণ্ঠে লীলা কহিল, আর বোকো না। তোমার আতর আমি কিনে দেব—কালই। তারপর কথা যেন কান্নায় ভিজিয়া আসিল। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, অজানা জায়গায় এসে লোকজনের সামনে কেবলি বকাবকি—কেন? কিসের এত? আমি বিষ্টি লাগাব, খুব করব, অসুখ করে যাই মরে যাব—তোমার কি?

পাশাপাশি দু'টি ঘর। কলহের প্রতি কথাটি পশুপতির কানে যাইতেছিল।

স্বামী উত্তর দিল, আমার আর কি—আমি তো কারও কেউ নই। ঘাট হয়েছে—আর কোনদিন কিছু বলব না।

কিছুক্ষণ আর কথাবার্তা নাই। খুটখাট আওয়াজ, বাক্সের ভিতরের জিনিষপত্র নাড়াচাড়া হইতেছে।

লীলা বলিতে লাগিল, মোটরের জল উড়িয়ে যে ভিজিয়ে দিয়ে গেল, তাতে কিছু দোষ হয় না। আর আমি একটুখানি বাইরে দাঁড়িয়েছি, অমনি কত কথা—আমি পাগল—হেনো তেনো—কেন, কি জন্যে বলবে?

অন্য পক্ষের সাড়া নাই।

পুনরায় বধূর কণ্ঠস্বর ভিজতে আমার বড্ড আরাম লাগে। ছেলেবেলা এই নিয়ে মা'র কাছে কত বকুনি খেয়েছি। তা বকবে যদি, তুমি আমায় আড়ালে বকলে না কেন? অচেনা অজানা কোথাকার কে-একজন—তার সামনে... ওগো, তুমি কথা বলবে না আমার সঙ্গে?

স্বামী বলিল, না, বলব না তো। কেউ মরলে আমার কিছু আসে যায় না যখন—বেশ তো—আমি সরে পড়—

বধূ কহিল, কতদিন তো সাবধান হয়ে আছি। ছড়ছড় করে জল পড়ছে দেখে আজকে হঠাৎ কেমন ইচ্ছে হল। আমি আর করব না—কোনদিনও না। ওগো তুমি আমায় মাপ কর—সত্যি করব না।

স্বামীর কণ্ঠ অভিমানে কাঁপিতে লাগিল। বলিল, কথায় কথায় তুমি মরতে চাও—কেন? কি জন্য? আমি কি কাঁদছি তোমার?

বধূ কহিল, না, মরব না।

দিব্যি কর গা ছুঁয়ে যে কক্ষণো না—কোনদিনই না—

স্বামীকে খুশি করিতে বধূ দিব্য করিল, সে কোনদিন মরিবে না।

আরও খানিকক্ষণ পরে যুবক কাছারিঘরে ঢুকিল। পশুপতি কহিল, হয়ে গেছে? এবার চলুন বাড়ির মধ্যে, আমি আলো দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছি।

যুবক কহিল, আজ্ঞে না। এক্ষুণি চলে যাব। সকালে পিসে-মশাইকে বলবেন, জাঙ্গুলগাছির সুরেশ এসেছিল। থাকলাম না বলে চটে যাবেন—

পশুপতি কহিল, তবে যান কি! আত্মীয়ের বাড়ি এসে পড়েছেন যখন দয়া করে—

সুরেশ বলিল, দয়া করে নয় মশায়, দায়ে পড়ে। ফাল্গুন মাসে ওর টাইফয়েড হয়, একত্রিশ দিন যমে-মানুষে টানাটানি করে কোন গতিকে প্রাণটুকু নিয়ে চোঁচা পালিয়েছিলাম। সেই গেছলাম আর আজ এই ফিরছি। স্টেশনে নেমে বিষ্টি বাদলা দেখে বললাম—কাজ নেই লীলা, রাতটুকু ওয়েটিং-রুমে কাটান যাক। ও একেবারে নাছোড়বান্দা—বলে, মোটরে হুড দেওয়া রয়েছে—একটা ফোঁটা জল গায়ে লাগবে না, ঝড়-বাতাসের মধ্যে ছুটতে খুব আমোদ লাগে। শুনেছেন কখন মশায়, ভূ-ভারতে এমন বায়না? সেদেশের ট্যাক্সি—ফাঁকা মাঠের মধ্যে এসে বাতাসে হুড গেল উল্টে। ভিজে একেবারে জবজবে। এখানে উঠতে কি চায়? ভিজে কাপড় বদলাতে একরকম জোর করে নিয়ে এলাম।

পশুপতি কহিল, বেশ তো, ওদের সঙ্গে দেখাটেখা করে সমস্ত রাতটুকু কাটিয়ে কাল সকালেই চলে যাবেন।

সুরেশ বলিল, বলছেন কাকে? ওদিকে একেবারে তৈরি। এরই মধ্যে দু দু'বার দরজার উপর ঠকঠক হয়ে গেছে—শোনেন নি? বিষ্টি বোধ হয় ধরে গেল এইবার। আচ্ছা নমস্কার! খুব বিরক্ত করে গেলাম—

তরুণ-তরুণী পাশাপাশি গুঞ্জন করিতে করিতে এবং তাহাদের পিছনে চাকরটি ট্রাঙ্ক ঘাড়ে করিয়া রাস্তার উপরের মোটরে গিয়া উঠিল।

তারপরে সেই রাত্রে অনেকক্ষণ অবধি পশুপতি মাস্টার যার

ঘুমাইতে পারিল না। ঝড়বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছে, তারা উঠিয়াছে, আকাশ পরিষ্কার রমণীয়। শিশি ভাঙিয়া ঘরময় আতর ছড়াইয়া গিয়াছিল, তাহার উগ্র মধুর মাদক সুবাসে পশুপতির মাথার মধ্যে ঝিমঝিম করিয়া বাজনা বাজিতে লাগিল। এই ঘর তৈয়ারি হইবার পর বরাবর চুন-সুরকি পড়িয়া ছিল, এই প্রথম আতর পড়িয়াছে এবং বোধকরি দুর্যোগের রাত্রে বিপন্ন তরুণ-দম্পতি কয়েক মুহূর্তের জন্য আসিয়া আতরের সহিত তাহাদের কলহের গুঞ্জন রাখিয়া গিয়াছে।

হেরিকেনটা তুলিয়া লইয়া পশুপতি প্রভাসিনীর চিঠিখানা গভীর মনোযোগের সহিত আর একবার পড়িতে লাগিল। পড়িতে পড়িতে সমস্ত অন্তর করুণায় ভরিয়া উঠিল। একটা সোহাগের কথা নাই, অথচ সমস্ত চিঠি ভরিয়া সংসারের প্রতি ও তাহাদের সন্তানের প্রতি কতখানি মমতা ছড়ান রহিয়াছে। কোনদিন সে এমন ভাবিয়া দেখে নাই।

জানলা খুলিয়া দিয়া অনেকক্ষণ একাগ্রে বাহিরের অন্ধকারের দিকে চাহিয়া ভাবিতে ভাবিতে পশুপতির মন চলিয়া গেল আবার সেই বহু দূরবর্তী পশর নদীর পারে তাহার নিজের বাড়িতে। এবং সেখান হইতে চলিয়া গেল আরও দূরে, প্রায় বিশ বছরের ওপারে বিস্মৃতির দেশে—যেদিন প্রভাসিনীকে বিবাহ করিয়া গ্রামে ঢুকিয়া সর্বপ্রথমে ঠাকরুনতলায় জোড়ে প্রণাম করিয়াছিল…তারপর কত নির্জন নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নের মধুর স্মৃতি—ছায়াচ্ছন্ন সন্ধ্যাকালে চুরি করিয়া চোখোচোখি—স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নারাত্রি জাগিয়া জাগিয়া কাটানো—ভোর হইলে বউকে তুলিয়া দিয়া নিজে আবার পাশ ফিরিয়া শোওয়া।

এখন আর সে সব কথা কিছু মনে পড়ে না, পৃথিবীতে কিন্তু তেমনি দুপুর সন্ধ্যা ও রাত্রি আসিয়া থাকে। পৃথিবীর লোক গান গায়, কবিতা পড়ে, প্রেয়সীর কানে ভালবাসার কথা গুঞ্জন করে, আকাশে নক্ষত্র অচঞ্চল দীপ্তিতে ফুটিয়া থাকে, তারার আলোকে নারিকেল-পাতা ঝিলমিল করিয়া দোলে। পশুপতি সে সময় সংসারের অনটনের কথা ভাবে, জ্যামিতির আঁক কষে, নয় তো ঠাণ্ডা লাগিবার ভয়ে জানলা আঁটিয়া ঘুমাইয়া পড়ে।

অকস্মাৎ তাহার বোধ হইল, চিত্রাঙ্গদার ভুলিয়া-যাওয়া লাইনগুলি

তাহার যেন মনে পড়িতেছে। ছেলেমানুষের মতো মাথা দোলাইয়া দোলাইয়া সে গুন-গুন করিতে লাগিল। এখনও ঠিক মনে পড়ে নাই··· মনে হইল, এমনি করিয়া রাত্রি জাগিয়া আরো বহুক্ষণ অবধি যদি সে বসিয়া বসিয়া ভাবিতে পারে, সমস্ত কবিতাগুলি তাহার মনে পড়িয়া যাইবে।

তারপর হঠাৎ একটি অদ্ভুত রকমের বিশ্বাস তাহার মনে চাপিয়া বসিল। বহুকাল আগে একদিন স্টেশনে যে মেয়েটির হাতে সচিত্র চিত্রাঙ্গদা তুলিয়া দিয়াছিল, সে-ই আজ আসিয়াছিল—এই বধূটি···লীলা, এই যেন সেই মুখ। ইহা যে কত অসম্ভব, সেই মেয়ে বাঁচিয়া থাকিলে এতদিনে নিশ্চিত তার যৌবন পার হইয়া গিয়াছে, এসব কথা পশুপতি একবারও ভাবিতে পারিল না। বারম্বার তাহার মনে হইতে লাগিল, ট্রাঙ্কে এই বধূটির কাপড়চোপড় ছিল, সকলের নিচে ছিল সেই চিত্রাঙ্গদা —পাঁচ টাকা দামের। লীলা আতরের শিশি ভাঙিয়াছে, কে জানে হয়তো চিত্রাঙ্গদাও এই ঘরের মেঝেয় ফেলিয়া গিয়াছে। খুঁজিয়া দেখিলে এখনই পাওয়া যাইবে- কিংবা থাকগে এখন খোঁজাখুঁজি, কাল সকালে

পরদিন পশুপতির ঘুম ভাঙিতে বেলা হইয়া গেল। চোখ মেলিয়া দেখে ইতিমধ্যে ননী আসিয়াছে। বেঞ্চির উপর বসিয়া চেচাইয়া চেচাইয়া সে ফার্স্ট বুকের পড়া তৈয়ারি করিতেছে—

One night when the wind was high a small bird flew into my room

একদিন রাত্রিবেলা যখন বাতাস প্রবল হইয়াছিল, একটি ছোট পাখী আমার ঘরের মধ্যে উড়িয়া আসিয়াছিল···

শুনিতে শুনিতে পশুপতি আবার চোখ বুজিল। ঘরের মধ্যে উড়িয়া আসা ছোট্ট একটি পাখীর কল্পনা করিতে লাগিল। হঠাৎ মনে হইল, রোদ উঠিয়া গিয়াছে, পাখীর ভাবনা ভাবিবার সময় আর নাই। এখনই হয়তো রামোত্তম ছেলের পড়ার তদারক করিতে আসিবেন। উঠিয়া বসিয়া হুঙ্কার দিল, বানান করে করে পড়্—

অভিভাবক

লিখে দিয়েছে, বন্ধুটা সে হস্টেলেই কাটাবে, বাড়ি যাবে না— কলেজ খুললেই অমনি একজামিন ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু ষষ্ঠীর দিন অনেক দূরের কোন পুজো বাড়ি থেকে শানাইয়ের সুর আসতে লাগল, প্রীতিলতার মনটা কেমন করে উঠল। সমস্ত বাড়িটা খা-খা করছে। দোতলার দুটো ওয়ার্ডের মধ্যে কেবলমাত্র যূথী অণিমা আর আশা। নিচের তলায় জন আষ্টেক আছে বটে, তারা সব সেকেণ্ড-ইয়ারের মেয়ে —তাদের সঙ্গে তেমন ভাব-সাব নেই।

প্রীতি ম্লানমুখে যূথীর ঘরে এসে দাঁড়াল। বলল পড়ায় মোটে মন লাগে না। কি করা যায় বল তো যূথী?

যূথী বলল, আমারও না। বাড়ি চলে যাব ভাবছি।

প্রীতি বলল, আমিও।

এতক্ষণে মনে স্ফূর্তি এল। সোজা একেবারে সুপারিন্টেণ্ডেন্টের ঘরে। সুপারিন্টেণ্ডেন্ট কমলা সেন ভ্রূ কুঞ্চিত করে বললেন, যাবে কার সঙ্গে?

প্রীতি বলল, এখন তো কাকার বাড়ি যাচ্ছি। কাকিমারাও দেশে যাচ্ছেন। সবাই একসঙ্গে যাব।

প্রীতির দূর সম্পর্কীয় এক কাকা বড় এডভোকেট। কাকিমার সঙ্গে কমলা সেনের খুব মাখামাখি। ছুটি মঞ্জুর হয়ে গেল।

কিন্তু কাকার বাড়ি যেতে বয়ে গেছে প্রীতির। কাকিমা দেশে যাবেন না আরো-কিছু। সমস্ত মিথ্যা কথা—যা হোক বলে সে ছুটি নিয়েছে। প্রীতি সোজা শিয়ালদহে এল। আরও দু-একবার সে একা একা বাড়ি গিয়েছে। কিন্তু স্টেশনে এসে যে কাণ্ড দেখল, তাতে হৃৎপিণ্ড হিম হয়ে যায়।

ইঞ্চি পাঁচেক পরিমিত এক গর্ত, তার মধ্যে অন্তত-পক্ষে পঞ্চাশ খানা হাত ঢুকে আছে। আরও শ-দুই আন্দাজ লোক বাইরে প্রবল বিক্রমে মল্লযুদ্ধ চালাচ্ছে। জালের ও-ধারে টিকিট-বাবু টাকা-পয়সা

বাজিয়ে নিয়ে হিসাব করে মন্থর ভাবে এক-একখানা টিকিট দিচ্ছেন। খানিকটা দূরে এক পাহারাওয়ালা পরম আনন্দে এই রোমহর্ষক দৃশ্য উপভোগ করছে, আর মৃদু হেসে মাঝে মাঝে বলছে, আস্তে বাবুরা, পালা করে একের পর এক যান। প্রীতিলতা দেখল, এইভাবে চললে তার পালা আসবে বিজয়া-দশমীর আগে কিছুতে নয়।

একজন বয়স্ক গোছের ভদ্রলোক দেখে প্রীতি বলল, একখানা যশোরের টিকিট কিনে দেবেন দয়া করে?

সামনের কুরুক্ষেত্রের দিকে হতাশভাবে চেয়ে লোকটি বললেন, ওঁরা দয়া না করলে সাধ্য কি, মা। আমি নিজেই ঘণ্টা চারেক এখানে দাঁড়িয়ে আছি।

যশোরের টিকিট তো? আমি যশোর যাব, এক্ষুনি করে দিচ্ছি।

প্রীতিলতা পিছন ফিরে তাকাল,—খর্বাকার এক নর, এক হাতে কাগজে-মোড়া এক টোপর ঝুলিয়ে নিয়েছে, আর এক হাতে প্রকাণ্ড স্যুটকেশ, তাতে বড় বড় অক্ষরে লেখা আছে, অবিনাশচন্দ্র বাগ্‌চি। সঙ্গে এক মুটে, তার মাথায় ট্রাঙ্ক, ট্রাঙ্কের উপরে ঝুড়ি-ভর্তি নানা আয়তনের অসংখ্য জিনিসপত্র। মুটে ঘেমে গিয়েছে। বিরক্ত-কণ্ঠে বলে উঠল, খাঁটি কিলাস ইনাবমে কাঁহা?

যাচ্ছি বাবা, সবুর। প্রীতির দিকে চেয়ে অবিনাশ একটু হাসল। বলল, টাকা দিন, এক টাকা সাড়ে সাত আনা। আমার থার্ড ক্লাস আপনাকেও তাই যেতে হবে। কেন যাবেন না? মহাত্মা গান্ধী যান, আমরা কি এমন নবাব হলাম!

অবিনাশ মোটঘাট নামিয়ে এক জায়গায় জড় করল, দু-খানা টিকিটের দাম হিসাব করে পয়সা গুণতে লাগল। বলল, ভগবান আপনাকে মিলিয়ে দিলেন। ভাবনা হয়েছিল, এই ভিড়ের মধ্যে মুটে যদি জিনিষ-পত্তোর নিয়ে চম্পট দেয়। দাঁড়ান এখানে। হুঁশিয়ার কিন্তু। টোপরটা হাতে নিন। আহা, ভাল করে ধরুন না—চাপ লাগলে গুঁড়ো-গুঁড়ো হয়ে যাবে।

মালকোঁচা এঁটে অবিনাশ রণবেশে সজ্জিত হল। তারপর টোপর সম্বন্ধে প্রীতিকে আর একবার হুঁশিয়ার করে দিয়ে—ঐ তো মানুষ, সে

একটা দেখবার ব্যাপার বটে, না দেখলে অনুমান করা যায় না—অবিনাশ তিড়িং করে লাফিয়ে তিন-চারটে মানুষের মাথার উপর দিয়ে এসে বুকিং-অফিসের গরাদে এঁটে ধরল। পা তখন অবধি মাটিতে পৌঁছয় নি, ঝুলছে। তারপর টিকিট মুঠোর মধ্যে নিয়ে নিজেকে জনতার মধ্যে ছেড়ে দিল। ব্যস, তাকে নিয়ে খানিক যেন লোফালুফি চলল। সে গা এলিয়ে দিয়েছে। ঠেলাঠেলির চোটে আপনিই শেষে বাইরে এসে পড়ল।

টোপর ঠিক আছে তো? প্রীতির হাত থেকে টোপরটা নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ সে পরীক্ষা করল। বলল, আসুন।

দুই কনুই উদ্যত করে অবিনাশ ভিড়ের মধ্যে পথ করে চলল।

কামরার সামনেও সংগ্রাম চলছে। ভদ্রলোকেরা আস্তিন গুটিয়ে দ্বার রক্ষা করছেন—সূচ্যগ্র গলাতে দেবেন না, এই পণ। ইঞ্জিন অবধি তারা এগিয়ে গেল। সর্বত্র একই দশা। এক দরজায় প্রকাণ্ড টাকওয়ালা এক বুড়ো ভদ্রলোক। খানিকটা দূরে বেঞ্চিতে বসে জন পাঁচ ছয় ছোকরা বীর বিক্রমে তর্ক করছে, তাদের মধ্যে তিনজনের চোখে চশমা এবং পাঞ্জাবির বোতাম কাঁধের উপর দিয়ে। অতএব কলেজের ছেলে না হয়ে যায় না। সেখানে গিয়ে অবিনাশ থামল। প্রীতির দিকে চেয়ে বলল, দেখুন, ঘণ্টা চারেকের জন্য আমি আপনার গার্জেন। স্বীকার করেন?

প্রীতি ঘাড় নাড়ল। স্বীকার না করে এ অবস্থায় আর উপায় কি। অবিনাশ দরজার দিকে চেয়ে সকাতর অনুনয় আরম্ভ করল, দেখুন—একটুখানি পথ ছেড়ে দিন। আমার জন্য বলছি না—এই এর জন্য।

টাকওয়ালা দ্বাররক্ষী অবহেলা ভরে চেয়ে রইলেন। কথা যেন তাঁর কানেই যায় নি। অবিনাশ মিনতি করতে লাগল, দোহাই আপনার, একটু সরে দাঁড়ান।

ছেলেগুলোর তর্ক থামল। তারা এইদিকে মনোযোগী হয়েছে। একজনে সাঁ করে উঠে এসে জানলায় মুখ বাড়াল।

কি বলছেন মশায়?

অবিনাশ এতক্ষণে কূল পেয়েছে। বলল, আমরা এই দু'টি প্রাণী। পথটা একটু ছেড়ে দিতে বলুন।

ছোকরা বলল, জায়গা কোথায়? এর পরেই একটা স্পেশ্যাল গাড়ি দিয়েছে, সেটায় তত ভিড় হবে না।

অবিনাশ ক্ষীণকণ্ঠে বলে উঠল, এই গাড়িতে যাওয়া যে চাই-ই। জানলা দিয়ে ইতিমধ্যে আরও অনেকগুলো কৌতূহলী মুখ বেরিয়ে এসেছে। হাসিমুখে সকলের দিকে চেয়ে অবিনাশ হাতের টোপরটা উঁচু করে দেখাল।

যেন মন্ত্রের কাজ হল। চার-পাঁচজন এগিয়ে এসে দরজার ভদ্রলোককে হুমকি দিল, সরে আসুন।

টাক তবু একবার শেষ চেষ্টা করলেন।

জায়গা নেই, এসে বসবেন কোথায়?

আপনার জায়গায়। একিলা দাঁড়িয়ে রয়েছেন, কি রকম ভদ্রলোক আপনি?

হাত ধরে কয়েকজন বুড়োকে সরিয়ে দিল। ভদ্রলোক বেঞ্চির উপর সতরঞ্চি ও বালিশ পেতে এবং চারিপাশে পোঁটলাপুঁটলির বেড়া দিয়ে রীতিমত ব্যূহ সাজিয়ে রেখেছিলেন। দুমদাম করে সেগুলো মেঝেয় ফেলে এবং বিছানা গুটিয়ে নবাগতদের জায়গা হল। ছোকরাদের দিকে কটমট চেয়ে বুড়ো ভদ্রলোক তখন তাঁর বয়সের যে ক'টি আরোহী ছিলেন, তাঁদের দিকে চাইলেন। কিন্তু সহানুভূতি সেদিক দিয়েও এল না। একজন বললেন, যাই বলুন মশায়, অন্যায় আপনারই। আর কিছু নয়—বিয়ের লগ্ন। ধেড়ে মেয়ে, অরক্ষণীয় অবস্থা—সেটা বুঝে দেখতে হয়!

আর একজন মন্তব্য করলেন, মেয়ের বিয়ের জ্বালা পোহাতে হয় নি বোধ হয়।

আলোচনা সমস্তই প্রীতির কানে যাচ্ছে। মুখ রাঙা হয়ে গেছে, লজ্জায় কি রাগে—বলা কঠিন। অথচ অবিনাশের পরে রাগ করা চলে না। বরঞ্চ তার বুদ্ধির তারিফ করতে হয়। সে বেচারা গলদ্‌ঘর্ম হয়ে তখনও মোটঘাট তুলছে। তারপর ক্লান্তভাবে ঝুপ করে সে প্রীতির পাশে বসে পড়ল। জিজ্ঞাসা করল, গাড়ি ছাড়বার দেরি কত?

ছোকরার দল উন্মুখ হয়ে আছে। একজনে হাতঘড়ি দেখে তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল, সাড়ে সাত মিনিট।

ও:—বলে অবিনাশ কোঁচার কাপড়ে বাতাস খেতে লাগল। অসহ্য গরম। প্রীতির মুখেও ঘাম ফুটেছে। অবিনাশ বার দুই-তিন প্রীতির দিকে তাকাল। তারপর ছোকরাদের উদ্দেশে বলল, আপনাদের কারো কাছে পাখা আছে স্যর ?

এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখা গেল, অনেকটা দূরে গাড়ির অপর কোণে এক হিন্দুস্থানি বসে ঝিমুচ্ছে, হাতে তার হাতপাখা। মাঝে মাঝে নাড়ছে, হাত শিথিল হয়ে আসছে, সচকিত হয়ে আবার বারকয়েক খুব জোরে জোরে নাড়ছে। ছোকরার দল চলল সেখানে।

পাখা ধরে টান দিতেই মালিক চোখ মেলে খাড়া হয়ে বসল।

পাখা দেও।

কাহে ?

লেডি—দেখতা নেহি ?

একটু আগে টাকওয়ালা ভদ্রলোকের দুর্গতি দেখেছে, হিন্দুস্থানিটি আর কিছু বলবার ভরসা পেল না। প্রাণপণ শক্তিতে বারকয়েক বাতাস করে পাখাটা সে দিয়ে দিল।

প্রীতিলতা এতক্ষণে কথা কইল। হাত বাড়িয়ে বলল, দিন।

অবিনাশ বলল, না, না—সে কি হয় ?

কিন্তু শেষ পর্যন্ত পাখা প্রীতির হাতেই পৌঁছল। সে বাতাস করছে। অবিনাশ মহানন্দে চোখ বুজে বলল, আঃ—

আবার চোখ মেলে দেখে, ছোকরারাই দল নয়—পাশের প্রবীণ ভদ্রলোকেরাও চাপা গলায় কি আলোচনা জুড়ে দিয়েছেন। একজনে ডাকলেন, হ্যাঁ মশাই—

ভদ্রলোক প্রশ্ন করলেন, মেয়েটি বুঝি পড়াশুনো করে ?

অবিনাশ প্রীতি ও আর সকলের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করে বলল, হ্যাঁ—

তখন ভদ্রলোক নিজের দলের দিকে তাকিয়ে বললেন, দেখুন, আমি বলেছিলাম কি না! ··কিন্তু লেখাপড়া করলে কি হয়, মেয়েটি

ভাল, সেবা-যত্ন করতে পারবে। ঐ বাতাস দেওয়া দেখেই বুঝতে পেরেছি।

এতগুলো লোকের দৃষ্টি ও আলোচনার বিষয় হয়ে প্রীতি অস্বস্তি বোধ করছিল। অথচ আর কোথা পালাবারও উপায় নেই। বেঞ্চিটা মাঝের দিকের, বাইরে তাকিয়ে থেকে যে দৃষ্টিবাণ থেকে রক্ষা পাবে, তার সম্ভাবনা নেই। অগত্যা হাতের উপর মাথা রেখে ঘুমের ভাণ করে সে চোখ বুজল।

পায়ের দিকে যে লোকটা ছিল, সে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, ভাল হয়ে শোন। অবিনাশ বাঙ্ক থেকে ছোটগোছের একটা পুঁটলি নামিয়ে বালিশ হিসাবে তার মাথায় গুঁজে দিল। প্রীতি আরও একটু কাত হয়ে পড়ল।

গাড়ি ছাড়ল। প্লাটফরম ছাড়িয়ে আসতে এক ঝলক বাইরের হাওয়া ঢুকল। গাড়িসুদ্ধ লোক যেন প্রাণ ফিরে পেল। অবিনাশও একটুখানি চোখ বুজেছে। ভাবে একটা বিয়ের সম্বন্ধ হচ্ছে, দেনা-পাওনা সাব্যস্ত হয়ে গেছে, অগ্রহায়ণের দিকে হবে। অবিনাশ চোখ বুজে ভাবছে, মন্দ হবে না—পরের হাতের বাতাস খাওয়া যাবে। লেভেল-ক্রসিং পার হবার মুখে রেলের চাকা যেন বলছে ঠিক ঠিক—ঠিক ঠিক। আবার ভাবল, কেবল বাতাস খেলে তো হবে না, বাতাস করাও একটু উচিত। প্রীতির হাতখানা এলিয়ে পড়েছে, হাতের পাখা মেজে ছুঁয়ে আছে। অবিনাশ পাখাটা টেনে নিয়ে বাতাস খেতে লাগল। প্রীতির গায়েও একটু-আধটু যে লাগছে না, এমন নয়।

পাশের ভদ্রলোক অনেক আগ্রহে অবিনাশকে আপ্যায়ন করলেন। হ্যাঁ, মশাই ?

অবিনাশ চোখ মেলে ঝঙ্কার দিয়ে উঠল, কি ?

রাগ করছেন কেন ? বিড়ি নিন।

বিড়ি ধরিয়ে অবিনাশ চাঙ্গা হয়ে বসল।

বিয়ের কথা বলছিলেন, বিয়ে এরই বুঝি ?

অবিনাশ প্রীতির দিকে এক নজর চেয়ে দেখল। চোখ বুজে নিঃসাড় হয়ে আছে, ঘুমিয়েছে নিশ্চয়। অবাধে সে জবাব দিয়ে চলল, হ্যাঁ—

পাত্র ?

হেসে উঠে অবিনাশ বলল, তা-ও একজন আছে বই কি !

হাসিতে ঘনিষ্ঠতা বেড়ে উঠল। ছোকরা ক-জন প্রায় সবাই কাছে এসে দাঁড়িয়েছে।

একজন প্রশ্ন করল, আপনি ওর অভিভাবক বুঝি ?

আপাতত তো বটে !

আর একটি ছোকরা বলল, তুই একটা আস্ত গাধা হরিদাস। বুঝতে পারলি নে, অভিভাবক এখনও নন, হতে যাচ্ছেন···কি বলেন মশাই, ঠিক ধরেছি কি না ?

জবাব না দিয়ে অবিনাশ আবার একটু মুখ টিপে হাসল।

প্রীতি ঘুমোয় নি। ইস্কুলে থাকতে সে ছোরা খেলত, অনেক দিন পরে তার হাত যেন নিশপিশ করতে লাগল। একখানা ছোরা পেলে ছোকরাগুলো এবং অবিনাশের মুণ্ডে কোপ বসিয়ে কথাবার্তা এইখানে শেষ করে দেয়। কিন্তু অবস্থা এমনি দাঁড়িয়েছে, কপট ঘুম তার এ অবস্থায় কিছুতেই ভাঙবার জো নেই।

এক্সপ্রেস গাড়ি বেশ জোরে চলেছে, গাড়ির লোক চুপচাপ হয়ে গেছে। অনেকগুলো স্টেশন ছাড়িয়ে বারাসতে এসে গাড়ি থামল। ছোকরার দলটি এইখানে নামবে।

একজন অবিনাশকে নমস্কার করল। বলল, শুভ কাজ শিগগির হয়ে যাচ্ছে আশা করি—

অবিনাশ সংক্ষেপে জবাব দিল, অঘ্রানে।

আর একজন বলল, বিয়ের পর সস্ত্রীক গাড়ি চড়ে তো সবাই ! আপনারা বিয়ের আগে। কনগ্রাচুলেশন—একশ' বার কনগ্রাচুলেশন—

ছোকরাদের পিছনে আরও অনেকে নেমে গেল। সমস্ত বেঞ্চিখানাই প্রায় খালি। প্রীতিলতা চোখ মেলে উঠে বসল।

অবিনাশ হাঁ-হাঁ করে উঠল, করছেন কি ? শুয়ে পড়ুন। এক্ষুনি আর একদল এসে বসে পড়বে। কাল স্বত্তোপটিতে রাত কেটেছে; ছারপোকার কামড়ে চোখ বুজতে পারি নি। আমারও শোবার দরকার।

প্রীতি বলল, বেশ তো, এই জায়গায় শুয়ে পড়ুন। আমি বসে থাকব।

শুয়ে থাকতে দেবে বুঝি? পঙ্গপালের দল খোঁচা মেরে টেনে তুলবে। তারপর গম্ভীর হয়ে বলতে লাগল, এই রাস্তাটুকুর জন্য অভিভাবক আমি। কথা তো হয়ে গেছে। যা বলি আপনার করা উচিত। এখানে শুয়ে পড়ুন।

প্রীতি জবাব দিল না, বিরক্তিভরে মুখ ফিরিয়ে রইল।

অবিনাশের স্বর এবার রীতিমতো ঝাঁঝাল হয়ে উঠল। বলল, তা জানি, আপনারা ঐ রকম। আচ্ছা, কৃতজ্ঞতা বলেও কি একটা জিনিষ নেই? মোটে টিকিট করতে পারছিলেন না, জায়গা হচ্ছিল না—এত পথ দিব্যি শুইয়ে নিয়ে এলাম, শুইয়ে বাতাস করতে করতে নিয়ে এলাম—

হঠাৎ কাতর হয়ে বলতে লাগল, শুয়ে পড়ুন দিকি, দোহাই আপনার! নইলে বনগাঁয় গিয়ে বুঝবেন ব্যাপারটা। যত নেমেছে, তার ডবল উঠবে! কচ্ছপের মতো হাত-পা গুটিয়ে বসে যেতে হবে। কেন, তার দরকারটা কি?

এর পর আর কথা না শুনে চলে না। বেঞ্চির অপর দিকটায় অবিনাশও শুয়ে পড়ল। কিন্তু তার কান খাড়া আছে। গাড়ি গোবরডাঙা পুলের পর উঠতে সে উঠে বসল। পুঁটলি খুলে চাঁ করে একখানা নূতন চাদর বের করল। প্রীতিকে বলল, প্যাট-প্যাট করে চেয়ে রয়েছেন যে বড়! বনগাঁয় এসে গেল—চাদরটা মুড়ি দিয়ে ফেলুন এইবার!·· দেখুন, পথঘাট আপনারা তো তেমন চলেন না—যা বলি শুনুন। দিবি৷ শান্তিতে যাওয়া যাবে। · হ্যাঁ—আগাগোড়া মুড়ি দিয়ে অসাড় হয়ে থাকবেন। স্টেশন ছেড়ে গেলে একটু-আধটু বরং চোখ চাইতে পারেন, কিন্তু ষ্টেশনে থাকতে—খবরদার!

বিরক্তি গিয়ে এখন প্রীতির মজা লাগছে। ওস্তাদ লোক, দেখা যাক আবার কি মতলব করেছে! হিন্দুস্থানিটি কোণ থেকে তাকাচ্ছিল। অপর বেঞ্চিতে কয়েকজন নবাগত যাত্রী। প্রীতিলতা বিনা প্রতিবাদে চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ল।

অবিনাশ সত্যই বহুদর্শী—যা বলেছে, বর্ণে বর্ণে মিলে গেল। স্টেশনের এক রশি আগে থাকতে কানে গেল বিপুল কলরব। গাড়ি না থামতেই ঘড়াং করে দরজা খুলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি বোঝাই। ছুমদাম করে মোট ফেলছে। বেঞ্চে জায়গা নেই—অনেকে মেজের উপর বসে পড়েছে। উপরের বাঙ্ক ভর্তি, তবু অন্তত জন দশেক ঐখানে একটু স্থান পাবার আশায় বাদুড়-ঝোলা ঝুলছে।

অবিনাশের দৃষ্টি এসব কোন দিকে নেই। ইতিমধ্যে হাতপাখাটা নিয়ে প্রীতির শিয়রে বসে সে মনোযোগের সঙ্গে বাতাস করতে লেগেছে। হঠাৎ পাখা রেখে সে উঠে দাঁড়াল। হাতজোড় করে করুণ কণ্ঠে সকলকে বলতে লাগল, দেখুন—দয়া করে চেঁচামেচি করবেন না। আমার বড্ড বিপদ। এই এতক্ষণ ছটফট করে একটুখানি সবে ঘুমিয়েছে। মা শীতলার অনুগ্রহ—জানেন তো কি যন্ত্রণা।

পাঁচ-সাত জনে এক সঙ্গে লাফিয়ে উঠল। বসন্ত?

আজ্ঞে হ্যাঁ। বড্ড সাংঘাতিক। মাছি পড়বে, সেই ভয়ে ঢেকে দিয়েছি। খুললে দেখতে পেতেন, কি রকম গুটি বেরিয়েছে।

আর কোথায় যাবে, যারা ছিল বাঙ্কে একলাফে তারা নিচে নেমে পড়ল, যারা মেজেয় ছিল, উঠে দাঁড়াল, বেঞ্চির লোকদের তো কথাই নেই! জিনিষপত্র ঘাড়ে নিয়ে নেমে যাবার জন্য সবাই ব্যস্ত, রীতিমতো মারামারি ধাক্কাধাক্কি আরম্ভ হয়ে গেছে।

প্রীতিলতার হাসি চেপে রাখা দুঃসাধ্য হয়েছে। মুখে হাত চাপা দিয়ে খুক-খুক শব্দ করছে, সর্বাঙ্গ হাসির চোটে আকুঞ্চিত হয়ে উঠছে। অবিনাশ বলে উঠল, আ হা-হা, আবার কাশির লক্ষণ দেখা দিয়েছে। কাশতে কাশতে দম আটকে যাচ্ছে

স্টেশন ছাড়বার আগেই কামরা আবার ফাঁকা হয়ে গেল।

গাড়ি চলতে শুরু হলে অবিনাশ বলল, আর ভিড় হবে না। এবার উঠতে পারেন।

কিন্তু প্রীতিলতা উঠল না, যেন সে শুনতেই পায় নি। সে ভাবছিল, সত্যিই যদি তার ভয়ানক একটা অসুখ করে—পথে ঘাটে এমন কত লোকেরই হয়ে থাকে—অবিনাশ কক্ষণো তাকে ফেলতে পারবে না।

বড্ড মজা হয় তা হলে···এই রকম বাতাস করতে করতে সমস্ত পথ তাকে যেতে হবে, প্রীতিদের ওখানেও যেতে হবে, টোপর নিয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ি যাওয়া ঘটবে না। আবার ভাবল, পথে এই রকম একা একা বেরুন ঠিক নয়—সত্যি সত্যি অসুখও তো হতে পারে!

অবিনাশ অধৈর্য হয়ে উঠেছে। বলল, কই, নড়বার নামও করেন না যে! আমার চাদরটা দিন দয়া করে। নতুন চাদর ময়লা করে ফেলবেন—

চাদরের তলা থেকে প্রীতি মুখ বের করল। হাসিমুখ। বলল, কত দাম পড়েছে এটার? অনেকদিন থেকে এই রকম একটা কিনব ভাবছি। আপনার যদি তেমন দরকার না থাকে—

না রে! দরকার না থাকলে কেউ গাঁটের পয়সা খরচ করে কিনতে যায়? অবিনাশ চটে উঠল। দিন, দিন—আমি এ বেচব না। বড়বাজারে ঢের পাওয়া যাবে, তেজিমল-আগরমলের দোকানে।

প্রীতি বলল, আমার বড্ড পছন্দ হয়ে গেছে।

অবিনাশ বলল, দোকানে যাবেন—যেটা দেখবেন, সেইটেই পছন্দ হয়ে যাবে। সেজন্য ভাববেন না। পছন্দ হওয়া আপনাদের দস্তুর ·· কিন্তু আর দেরি নয়, উঠে বসতে হবে। বোচকা গুছিয়ে ফেলি—যশোরে এসে গেল যে!

প্রীতি দিব্য নির্বিকার হয়ে শুয়ে আছে, কানে যেন কথাই যায় নি। অবিনাশ ওদিকে বিব্রত হয়ে উঠেছে। বলল, নাঃ—আপনাদের মতলব বোঝা ভার। শেষকালে একটা লণ্ডভণ্ড ব্যাপার হবে, এটা নিতে ওটা ফেলে যাব—

প্রীতি বলল, আমি খুব ভাল গোছাতে জানি। প্লাটফরমে নেমে সব জিনিস ঠিকঠাক গুছিয়ে দেব।

অবিনাশ ভ্রূকুটি করে বলল, হুঁ—আর ওদিকে বাস ছেড়ে দিক, তখন সমস্ত রাত স্টেশনে পড়ে মশা তাড়াই!

প্রীতি বলল, স্টেশনে থাকবেন কেন? আমাদের বাড়ি দড়াটানায়, ঘোড়ার গাড়িতে মিনিট দশেক লাগবে। আপনি আমার সঙ্গে চলুন।

আপনি যা করেছেন—যা শুনে আমায় গালাগালি দেবেন, কিন্তু আপনার পরে খুব খুশি হবেন—

অবিনাশ অধীরভাবে ঘাড় নেড়ে বলল, না, না—সে হবে না। তা হলে তো আরও কিছু সওদা করে পরের গাড়িতে যেতে পারতাম। আপনি উঠুন—উঠুন—আমার দেরি করবার জো নেই।

দুমদাম করে বাক্সের জিনিসপত্র নামিয়ে অবিনাশ গোছাতে লাগল। প্রীতির ইচ্ছা হচ্ছিল, সাহায্য করে। কিন্তু লজ্জা করতে লাগল। অলস দৃষ্টি মেলে সে চেয়ে রইল।

হঠাৎ প্রশ্ন করল দেরি করবার জো নেই কেন? বিয়ে কি আপনাদের বাড়িতে? প্রশ্নটা ছিল—বিয়ে তারই কিনা, কিন্তু অশোভন হবে বলে সেটা বলা গেল না।

অবিনাশ আশ্চর্য হয়ে তাকাল, বিয়ে? কে বললে বিয়ে?

আপনিই তো—

ভ্রূকুঞ্চিত করে একটুখানি সে ভাবল। তারপর হো-হো করে হেসে উঠল। বলল, ওঃ, শিয়ালদহে বলেছিলাম বুঝি! দায়ে পড়লে কি না বলতে হয়। বিয়ে না হাতী। টোপর আমার দোকানের মাল। অঘ্রান পড়লেই লগনসা শুরু হবে, তখন কি আবার গস্ত করতে আসব?

মুটের মাথায় চাপিয়েছে বড় ট্রাঙ্কটা। যশোহরের ম্যালেরিয়াগ্রস্ত মুটে—ট্রাঙ্কের ভারেই মাথাটা তার হাতখানেক ঝুলে পড়ল। স্যুটকেশটা অবিনাশ হাতে ঝুলিয়ে নিয়েছে, আরও পাঁচ সাতটা পোঁটলা-পুঁটলি নানা কৌশলে এখানে সেখানে নিয়েছে। প্রীতিকে বলল, নিন না একটা, আপনার তো হাত খালি। মহাত্মা গান্ধী নিজে চরকা কাটতে পারেন, আর একটা মোট হাতে নিলে আপনাদের অপমান হবে নাকি?

আগে আগে চলেছে মুটে, তারপর অবিনাশ, সকলের পিছনে প্রীতিলতা। প্রীতি সভয়ে চারিদিক তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে, স্টেশনে তার জানাশোনা কেউ নেই তো! অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে, তাতে তারা যে নিঃসম্পর্কীয়, একেবারে পথের আলাপি—এ কেউ ভাবতে পারে না।

টিকিট-কালেক্টর ট্রাঙ্কের উপর থাবা মেরে বললেন, কি আছে এতে? ওজনটা দেখতে চাই মশায়।

অবিনাশ তাড়াতাড়ি বলে উঠল, কেন মিথ্যে হয়রান করেন। মেয়েদের বাক্সে থাকবে আর কি হাতী-ঘোড়া? দু-এক শিশি আলতা, গন্ধ-তেল কি দু-একটা সেমিজ-ব্লাউজ। সমস্ত দিন ওর খাওয়া হয় নি—দেখুন না চেয়ে অবস্থাটা। এখন তাড়াতাড়ি কোনগতিকে পৌঁছতে পারলে বাঁচি।

টিকিট-কালেক্টর প্রীতির ক্লান্ত মুখের দিকে এক নজর চেয়ে দেখলেন, আর কিছু বললেন না।

বেরিয়ে এসে অবিনাশ হি হি করে হাসতে লাগল। বলল, হাতী-ঘোড়া নেই বটে—হাতা-বেড়ি লোহা-লক্কড়ে বোঝাই। নিদেনপক্ষে দেড় মণের ধাক্কা। ভাগ্যিস বুদ্ধি করে বাক্সে পুরেছিলাম, আর ভাগ্যিস আপনি সঙ্গে জুটেছিলেন—নইলে পার করে আনা মুশকিল হত।

প্রীতি অন্য কথা ভাবছিল। সে বলল, যাই বলুন, আপনাকে ছাড়া হচ্ছে না। একটা গাড়ি করে চলুন আমাদের বাড়ি। ক্লান্ত হয়েছেন, একটু বিশ্রাম টিশ্রাম করে কালকে তারপর—

উঁহু। অবিনাশ প্রীতির হাতের বোচকাটা কন্থায় ঝুলিয়ে নিয়ে চলল।

পিছন থেকে আবার অনুরোধ এল, একটা গাড়ি ঠিক করে দিয়ে যান তবে—

উই কত রয়েছে, নিন না দেখে একটা। আঙুল দিয়ে অপেক্ষমান গাড়িগুলি দেখিয়ে দিয়ে অবিনাশ হন হন করে ছুটোছে।

প্রীতির রাগের সীমা রইল না। বলল, লোহা-লক্কড় পার করবার জন্য আমায় সঙ্গে নিয়েছিলেন নাকি? অত যত্ন তাই বুঝি।

অবিনাশ বলল, আজ্ঞে না। কেবল লোহা লক্কড় কেন—আমাকেই বুঝি আসতে দিত। দিব্যি শুয়ে বসে এলাম। নমস্কার। কোটচাঁদপুরের দিকে যদি কখন যাওয়া হয়, আমার দশকর্ম-ভাণ্ডারে পায়ের ধুলো দেবেন একবার। ওরে বেটা পা চালিয়ে চল—হর্ন দিচ্ছে।

মুটেকে তাড়া দিয়ে অবিনাশ আগে আগে বাসের দিকে ছুটল।

আংটি চাটুজ্জের ভাই

বর্ষাকাল। রাস্তাঘাটে জলকাদা, উঠানেও আসর বসান মুশকিল নীলকান্ত এই ক'টা মাস তাই যাত্রার দল ছেড়ে কবিরাজি করে। জায়গাটা খুব ভাল। ম্যালেরিয়া তো আছেই, তা ছাড়া আজকাল আবার নূতন নূতন রোগ পীড়া দেখা দিচ্ছে, সে-সব নাম নীলকান্ত বাপের জন্মে শোনে নি। অতএব কাজ-কারবার খাসা চলছে, এক-এক দিন নিশ্বাস ফেলবার ফুরসং থাকে না।

কিন্তু তা সত্ত্বেও সন্ধ্যার পর আয়ুর্বেদীয় ঔষধালয়ে একটুখানি আড্ডার বন্দোবস্ত চাই-ই। নয় তো তার রাতে ঘুম হয় না। জম জমাটের সময় কোন রোগি দৈবাৎ যদি এসে পড়ে, সে বেচারা গালি খেয়ে মরে।

আজও দুই এক করে সকলে জমায়েত হচ্ছে। হরিশ বেহালাদার এসে গেছে। কবালী ভীম সাজে, সে তো সেই দুপুর থেকে তক্তাপোষে গদিয়ান হয়ে হুঁকো টানছে। সামনের রাস্তা দিয়ে গুড়-বোঝাই খান পাঁচ-ছয় গরুর গাড়ি যাচ্ছিল—তারই একখানা থেকে ছোকরাগোছের একটা লোক খোঁড়াতে খোঁড়াতে এসে ঢুকল। লোকটা বিদেশি, পায়ে পাম্প-সু, গলায় কম্ফর্টার, গায়ে ময়লা আধ-ছেঁড়া জিনের কোট, ডান হাঁটুর নিচে বেশ বড় আকারের ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। সেই জায়গাটা দেখিয়ে সে বলে, পুঁজ পড়ছে, থুঃ থুঃ—একদম ঘা হয়ে গেছে মশায়। তার উপর আবার জ্বরে ধরেছে।

নীলকান্ত ঘাড় নেড়ে গম্ভীর ভাবে বলে, ঘায়ের তাড়সে জ্বর। হুঁ, তাই—

ঘা থাকুক, জ্বরটার চিকিচ্ছে করে দাও দিকি। গাড়ি চেপে বেড়াচ্ছি, পা একটু জখম থাকলে কি আর এমন ক্ষতি হবে?

ডান হাতখানা এগিয়ে দিয়ে লোকটা কবিরাজের পাশে বসে পড়ল। বলে, আগে আসছিল এক দিন অন্তর, আজ দু-দিন সকাল-বিকাল দু-বেলা ধরেছে। খাওয়ার তোয়াজ দেখছে, তাই আরও কষে ধরছে।

নীলকান্ত নাড়ি দেখতে দেখতে বলল, এত বড় জ্বর—তার উপরে খাওয়া ?

খাওয়া বলে খাওয়া। দুপুরে গাড়ি বেধেছিল মণ্ডলগাঁয়ের বাজারে। রান্নার সুবিধে হল না—তা মশায়, পাকি পাঁচ পোয়া চিঁড়ে পাঁচ-পোয়া কাঁচাগোল্লা আর ঘন-আঁটা দুধ—তা ৬ সের খানেকের বেশি হবে তো কম নয়। আমার আবার এক বদ-স্বভাব—শরীর বেজুত হলে ক্ষিধে ভয়ানক বেড়ে যায়।

করালী প্রশ্ন করে, কোথায় যাবে তুমি ?

পিরথিমের ভদারকে। বলে সে সুর করে ছড়া কাটে—

জীবনপুরের পথে যাই,

কোন দেশে সাকিন নাই।

সন্ত আমার নাম। আংটি চাটুজ্জের নাম শুনেছ তস্য ভ্রাতা। তিনি থাকেন বাড়ি-ঘরদোর আগলে, বাকি জগৎ-সংসারের খোঁজ-খবর আমাকে নিতে হয়।

রকম-সকম দেখে মনে হয় লোকটা পাগল। নীলকান্ত বলে, জামাটা তোল দিকি। পিলে আছে বলে ঠেকছে।

বসন্ত হা-হা করে হেসে উঠল। তা আছে। আরও নানা রকমের চিজ আছে। কোমর টিপে দেখছ কি, সে চিজ আমি গাঁটে বাধি নে। এই দেখ।

বলে পা থেকে জুতো খুলে শুকতলার নিচে থেকে একখানা দশ টাকার নোট বের করে দেখাল।

এই দেখ দাদা, জাল নয়—আসল রাজ-মূর্তি। আরও আছে, গরজের সময় ফুসমন্ত্রে বেরিয়ে যাবে। হে-হেঁ, আর দেখাচ্ছি নে। আংটি চাটুজ্জের ভাই আমি, তার দশ আঙুলে দশটা হীরের আংটি। তোমার ভিজিট মারব না কবিরাজ মশায়।

নীলকান্ত আরও খানিকক্ষণ প্রণিধান করে দেখে আলমারি থেকে একটা গুঁড়ো ওষুধ বের করল। পিছন-দরজার দিকে চেয়ে বলে, এক গ্লাস জল দিতে হবে যে মা। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই—মানুষটি দেখা গেল না—চুড়ি-পরা একখানা হাত দরজা একটু ফাঁক করে জলের গ্লাস রেখে দিল।

বসন্ত বলে, ঠিক করে বল কবিরাজ, সুরকির গুঁড়ো দিচ্ছ না তো? বৈঁড় কাবু করে ফেলেছে। মাইরি বলছি। হাঁটা মুশকিল হয়েছে, নইলে শর্মারাম গরুর গাড়ি চাপে? রাত্তিরের মধ্যে জ্বরটা নির্দোষ করে সেরে দাও, বুঝব ক্ষমতা। তা হলে ঘোর-ঘোর থাকতে মা-গঙ্গা পাড়ি দিয়ে চাকদা মুখো বেরিয়ে পড়ি।

নোট দেখিয়ে মন্ত্রের কাজ হয়েছে। নীলকান্ত মোলায়েম স্বরে জিজ্ঞাসা করে, রাত্তিরবেলা ওঠা হচ্ছে কোথায়?

উঠেছি এই তোমার এখানে। তুমি জায়গা না দাও, বটতলা রয়েছে। সে জায়গা তো কেউ কিনে রাখে নি।

নীলকান্ত প্রস্তাব করে, একটা রাতের ব্যাপার যখন, তা বেশ তো— এখানেই থাক। অসুবিধা হবে না।

উপরে নিচে চারিদিকে বার কয়েক তাকাল বসন্ত। বলে, শুতে হবে কোন্ ঘরে?

এই এখানে তক্তাপোশের উপর মাদুর পেতে দেব। তবে একটু-খানি রাত হবে। এই এরা সব আসছে—এরা চলে যাবে, তার পরে—

বসন্ত দৃঢ় ভাবে ঘাড় নেড়ে বলে, না মশায়, তা হলে চলবে না। এরই মধ্যে চোখ বুঁজে আসছে। সকাল সকাল না শুলে ভোরবেলা রওনা হব কি করে?

কেন জানি না কপালীর বড্ড ভাল লেগে গেল বসন্তকে। বলে, এক কাজ কর—খেয়ে-দেয়ে বরং আমার ওখানে গিয়ে শুয়ে থেক। এখানকার হাঙ্গামা চুকতে এক একদিন রাত কাবার হয়ে যায়। ঐ টিনের দোতলায় থাকি আমি। একা থাকি। খুব হাওয়া।

বসন্ত আবার প্রশ্ন করে, শোওয়া তো হল, খাওয়াবে কি শুনি কবিরাজ? তুমি বাবা জ্বরো-রোগির জন্য শঠির পালো এনে হাজির করবে না তো? আগে ভাগে বলে দাও, না পোষায় সরে পড়ব।

নীলকান্ত বলল, জ্বর পুরানো হয়ে গেছে। দুটো পুরানো চালের ভাত খেলে দোষ হবে না। তাই খেয়ো।

আর গাঁদালের ঝোল?

উঁহু, তোফা ভাজা-মুগের ডাল লাগিয়ে দেব ঐ সঙ্গে।

তবে বন্দোবস্ত করে ফেল। দেরি কোরো না, পেট জ্বলে উঠেছে। এক্ষুনি চাপাও গে। বলে তৎক্ষণাৎ বসন্ত উঠে দাঁড়াল। করালীর হাত ধরে টেনে বলে, চল তোমার দোতলা অট্টালিকা দেখে আসি। বলি খাট-টাট আছে তো? হেঁ-হেঁ মশায়, রুই-কাতলা খাওয়াবে তো ঘিয়ে ভেজে খাওয়াও। দোতলায় গিয়ে মেজেয় পড়ে থাকতে পারব না, তা বলে দিচ্ছি।"

আবার সে ঘুরে দাঁড়িয়ে ডাকতে লাগে, ও কবিরাজ মশাই, ইদিকে শোন একবার। যোগাড়-যন্তোর করছ, রাঁধাবাড়া করবে কে?

নীলকান্ত বলে, আমার মেয়ে হরিমতী। আর কেউ নেই বাড়িতে, ঘর সংসার সে-ই দেখে।

তা বেশ করে। কিন্তু নৈকষ্য কুলীন আমরা। আংটি চাটুজ্জের ভাই। যার তার হাতে খাই নে।

মুখ কালো করে নীলকান্ত বলে, তুমিই তবে রান্না কর। অন্দরের দিকে এগিয়ে উচ্চ কণ্ঠে ডাক দিল, ও খুকি, যোগাড়যোগ করে তুই শুধু ভাতটা চড়িয়ে দে। ছোঁয়াছুঁয়ি করিস নে—খবরদার।

একগাল হেসে বসন্ত বলল, হ্যাঁ—সেই ভাল। ভাল বামুনের জাত মেরে শেষকালে মহাপাতকের ভাগী হবে, তাই সামাল করে দিলাম।

করালীর সঙ্গে তার ঘরে ঢুকে বসন্ত সর্বাগ্রে দুয়োর ভেজিয়ে দিল। জুতোর ভিতর থেকে নোট বের করে বলল, নাও দাদা, ধর। তোমাদের মনস্কামনা পূর্ণ হোক।

ব্যাপার কি?

শনির দৃষ্টি পড়ে গেছে, কাছে রাখলে রক্ষে আছে? বুঝি দাদা, বুঝি। নিজের বিছানায় এনে শোয়াচ্ছ, ওদিকে ভাজা-মুগের বন্দোবস্ত! এত সব খাতির আমাকে নয়, পদতলে এই যিনি আছেন তাঁর। ছোট ভাইকে ছলনা কর কেন, নেবেই তো—সহজে না দিলে পেটে ছুরি বসিয়ে নেবে। তার কাজ নেই। কিন্তু মা-কালীর কিরে, একা খেয়ো না—কবিরাজের পাওনা গণ্ডা মিটিয়ে দিয়ে বাদ বাকি সমস্ত তোমার।

ধর্মভীরু মানুষ করালী। রাগ করে সে নোট ছুঁড়ে ফেলে দেয়। বসন্ত খানিক অবাক হয়ে থাকে। তার পর টিপ করে সে তার পায়ের গোড়ায় প্রণাম করে। বলে, টাকা ছুঁড়ে দেয়—সে-মানুষ পরমহংস। না নাও, না-ই নিলে। রাতের মতন রেখে দাও তোমার কাছে। ওখানকার ঐ একঘর মানুষ দেখে ফেলেছে। তোমাদের দেশ-ভুঁই, তোমায় কিছু বলবে না -বুঝলে না? বড্ড পাজি জিনিস এই টাকা-পয়সা। ঠেকে ঠেকে বুঝেছি।

তবে সঙ্গে নিয়ে এসেছ কেন?

আমি? বয়ে গেছে আমার সঙ্গে আনতে। ষড়যন্ত্র করে পকেটে ঢুকিয়ে দিয়েছে। ঘাগী মেয়ে আমার বউ-ঠাকরুন। আমারে কাপড়-কাচা দেখে সন্দেহ করেছে। এক প্রহর রাস্তে থাকতে রওনা হয়েছি, কিচ্ছু জানি নে। চানের সময় জামা খুলতে গিয়ে দেখি, খসখস করছে। আংটি চাটুজ্জের বউ কি না, নজর এড়ান কঠিন। এক হিসাবে মন্দ হয় নি অবিশ্যি। শুধু দেখিয়ে দেখিয়েই কাজ হাসিল করা যাচ্ছে। আজ পাঁচ-ছ'টা দিন তো কেবল চেহারা দেখিয়ে চলে যাচ্ছে, একটা পয়সা খরচ হয় নি।

এমন সময়ে কবিরাজের বাড়ি থেকে ডাক এল, গিয়ে ভাত নামাতে হবে।

ডাল ফুটে উঠেছে। হরিমতী চুপটি করে এক পাশে দাঁড়িয়ে আছে আর মিটিমিটি হাসছে। অতি ছেলেবয়সে মা-হারা, তখন থেকেই গিন্নি। বাবাকে দেখে দেখে সে ধরে নিয়েছে, গোটা পুরুষ জাতটাই আনাড়ি। তাদের সম্পর্কে কৌতুক ও করুণার অন্ত নেই। হঠাৎ মেয়েটা হাঁ হাঁ করে ওঠে, ও কি হচ্ছে? অত নুন দেয় নাকি? এই রকম রান্না শিখেছেন আপনি?

বসন্ত বিষম চটে যায়। ডেঁপো মেয়ে, রান্না শেখাতে এসেছ? তোমার জন্মের আগে থেকে এই কর্ম করছি। এ আর কতটুকু— দৈনিক আড়াই পোয়া নুন লেগে থাকে আমার।

বলে কেবল হাতের নুনটুকু নয়, আর একবার তার ডবল পরিমাণ নিয়ে ডালের মধ্যে দিল।

হরিমতী রাগ করে বলে, তা হলে আবার মশলা লাগবে, আরও জল ঢালতে হবে। ও যে পুড়ে অঙ্গার হয়ে গেছে। মানুষে কেন, গরুতেও মুখে দিতে পারবে না।

ঘটির জল হুড-হুড করে সে কড়াইয়ে ঢেলে দিল।

বসন্ত উঠে দাঁড়িয়ে দু-হাত কোমরে দিয়ে রণমূর্তিতে বলল, জল ঢেলে দিলে যে বড। কি জাত তুমি ?

বামুন।

ওঃ, হলেই হল। বামুন অমন সবাই কপচে থাকে। কি রকম বামুন দেখি, গায়ত্রী মুখস্থ বলতে পার ?

হরিমতী বিদ্রূপ করে বলে, সর্বস্ব ফেলে এসে জাতটাই শুধু সঙ্গে নিয়ে বেড়াচ্ছেন ? পৈতে তো ছেড়েছেন, তবু জাত ছাডে না—ও বুঝি কাঁঠালের আঠা ?

একটুখানি চুপ করে থেকে বসন্ত এইবার হেসে ফেলল। বলে, রাঁধো মাণিক, তুমিই রাঁধো তবে। জলের উপর আজ জুত হবে না। কিন্তু রাঁধতে আমি জানি, খুব ভাল জানি। আর এক দিন রেঁধে দেখাব, তখন বুঝবে।

খাওয়া-দাওয়ার পর উদগার তুলতে তুলতে বসন্ত এদের আড্ডায় এল। করালীকে ডেকে বলে, ঘরের চাবিটা দাও—শুয়ে পড়ি গে। ·· একটা কুকর্ম করে ফেললাম দাদা। গঙ্গার পাড়ের উপর রয়েছি, গঙ্গাজলে রান্না—তেমন কিছু দোষ হবে না, কি বল ?

সকালবেলা বসন্ত ঘুমন্ত করালীকে নাড়া দিচ্ছে। চারটে পয়সা দাও দিকি।

করালী চোখ রগড়ে জিজ্ঞাসা করে, কি হবে ?

পারানির পয়সা। গঙ্গা তো সাঁতরে পার হওয়া যাবে না। যাই বল দাদা, মানুষের চেয়ে বানরের বুদ্ধি বেশি।

বসন্ত হঠাৎ ভাবুকের পর্যায়ে উঠে গেছে। মাথা দোলাতে দোলাতে বলে, বিবেচনা করে দেখ, তাই কিনা! হনুমান গন্ধমাদন পর্বত এনেছিল, কাজকর্ম চুকে গেলে যেখানকার জিনিস সেইখানে রেখে এল। আর ভগীরথের কি রকম আক্কেল—মা-গঙ্গাকে এনে

শুটিসুদ্ধ বাঁচালি, তারপর শিবের মাথায় জিনিস আবার সেখানে গুঁজে দিয়ে আয়—তা নয়, গরজ ফুরোলে কিছু আর মনে থাকল না। গাঙ-খাল যদি না থাকত দাদা, মনের সাধে একবার পায়ে হেঁটে বুঝতাম।

তোমার যে পায়ে ঘা। হাঁটবে কি করে ?

ঠিক কথা। থুঃ থুঃ—ওদিকে নজর দিও না।

করালী নোটখানাই ফিরিয়ে দিল। বসন্ত বলে, শুধু চারটে পয়সার দরকার। নোট বন্ধক রেখেই না হয় দাও। পয়লা খেয়া—ওদের এখন ভাঁড়ে মা-ভবানী। কোথায় ভাঙাতে যাই, কি করি। আবার যখন আসব, বন্ধকি জিনিস ছাড়িয়ে নিয়ে যাব, কথা দিচ্ছি।

খুচরো পয়সা নেই। নোট ভাঙিয়ে নিয়ে যা ইচ্ছে করো গে। যাও। বলে করালী আবার শুয়ে পড়ে সঙ্গে সঙ্গে চোখ বুজল।

দুপুর গড়িয়ে গেছে। করালী বেরুবে বেরুবে করছিল, কাঠের সিঁড়ি হঠাৎ মচমচ করে উঠল।

দাদা, ও দাদা, ঘরে আছ ?

তুমি চলে যাও নি বসন্ত ?

যেতে পারলাম আর কই। ভাঙানি খুজতে গিয়ে গোলমালে পড়ে গেলাম।

কাঁধে বেহালা, বসন্ত ঘরে ঢুকল। হাত মুখ নেড়ে বলতে লাগল, ঘুরতে ঘুরতে কালকের ঐ হরিশ-বেহালাদারের ওখানে গিয়ে পড়লাম। একখানা গৎ শোনাল—বলব কি দাদা, মন কেড়ে নিল যেন। দরদস্তুর করে বেহালাটাই কিনে নিয়ে এলাম।

বাজাতে জান ?

কিছু না, কিছু না। কোন দিন এসব ঝঞ্ঝাট ছিল না। নতুন করে এই প্যাঁচে পড়ে গেলাম। কর্মনাশা জিনিস।...সাত টাকায় কিনেছি, তাও মারা গেছে, কি বল ?

বিপুল আত্মপ্রসাদে সে যেন ফেটে পড়ছিল। বলতে লাগল, আর নোটের দরুন বাকি তিনটে টাকাও দিল না। তার বাবদ তিনখানা

গৎ শিখিয়ে দেবে বলেছে। সে-ও লম্বা—কি বল? তারের ভিতর থেকে সুর বের করা, সোজা কথা?

তা হলে আর তোমার ঢাকদায় যাওয়া হয় কই? এখানেই থেকে যেতে হবে।

বসন্ত শুকনো মুখে বলে, তা ক'টা দিন থাকতে হবে বই কি! কপালই এই রকম দাদা। ভাবি এক, হয়ে যায় অন্য। ছোট একটা ঘর-টর দেখে দাও, স্বপাক শুরু করে দিই সেখানে।

করালীর নজরে পড়ল, বসন্তর গা খালি। ভিজে কাপড়-জামা পুঁটলি করে বগলে নিয়েছে।

বৃষ্টি হয় নি, ও-সব ভিজল কি করে?

ভিজিয়ে দিল কবিরাজের বাঁদর মেয়েটা। আগাগোড়াই ভিজেছিল। গা মুছে ফেলে কবিরাজের একখানা শুকনো কাপড় পরে এলাম।

করালী উদ্বিগ্ন হয়ে প্রশ্ন করে, কেন, কি হয়েছিল বল তো—

ওদের বারান্দায় বসে একটু গৎ প্রাকটিশ করছিলাম। হড়াৎ করে জল ঢেলে দিল। মেপে বসতাম—তা বলল, দেখতে পাই নি।

তাই হবে।

তোমরা বুড়োমানুষ, যা বলে তাই বিশ্বাস কর। মুখ টিপে হাসছিল। মনে মনে ওর দুষ্টুমি, যতই সাফাই দাও। আবার বলে, ভাল হয়েছে—মাথা ঠাণ্ডা হওয়ার দরকার ছিল। এত বড় অপমান! বেহালা আমি শিখবই। তোমার এই নিচের ঘরটা ভাড়া দেয় না দাদা? দাও না ঠিকঠাক করে—একসঙ্গে থাকা যাবে।

করালী বলে, টাকাগুলো ছাইভস্ম করে উড়িয়ে দিয়ে এলে। খাবে কি?

আছে দাদা, আরও আছে। সাগরের জল ফুরোবে না। অঙ্ক চিরে বের করে দেবো। আংটি চাটুজ্জের বউ, নজর তার কত মোটা! নোট দিয়েছে কি একখানা?

দরজায় খিল এঁটে অতি সন্তর্পণে সে পায়ের ব্যাণ্ডেজ খুলে ফেলল। ঘা নয় পায়ে—কিছু হয় নি, সব ফাঁকি। ব্যাণ্ডেজের ভাঁজের মধ্যে

নোটের গোছা। বলে, বিশ্বাস হল তো? এবার থাকার বন্দোবস্ত করে দাও। কাউকে কিছু বোলো না কিন্তু। খবরদার! ঋষিতুল্য লোক তুমি—টাকা ছুঁড়ে ফেলে দাও, তাই তোমায় শুধু দেখিয়ে দিলাম।

নিচের ঘরটাই সাব্যস্ত হল। দেড় টাকা ভাড়া। সেইখানে থেকে সে বেহালা শেখে। ডালকলাই-বোঝাই দক্ষিণের বড় বড় নৌকা নদীর ঘাটে পনর দিন কুড়ি দিন এসে নোঙর করে থাকে, ধীরে সুস্থে কলাই বিক্রি হয়। তারই এক মাঝির সঙ্গে বসন্তর ভাব জমে গেল। লোকটা পাল দাবা খেলে। বেহালা বাজানো দাবা খেলা আর কোন গতিকে দু'টি চাল সিদ্ধ করে নেওয়া—এই তার কাজ।

এক দিন এক কাণ্ড হয়ে গেল। শরীরটা আবার খারাপ হয়েছে, বেহালার চর্চা বেশিক্ষণ ভাল লাগল না। খেয়ে দেয়ে সকাল সকাল শুয়ে পড়বে, এই মতলবে রান্নার জোগাড়ে গেল। উনানে হাঁড়ি চাপিয়ে দেখে, চাল নেই। দোকানপাট ইতিমধ্যে সব বন্ধ হয়ে গেছে। তখন দরজায় শিকলটা তুলে দিয়ে তাড়াতাড়ি নদীর ঘাটে তার বন্ধু সেই মাঝির কাছে এল রাত্রের মতো চারটি চাল ধার করবার আশায়। বন্ধুর তখন সঙিন অবস্থা, দাবাখেলা খুব জমে গেছে, এক সুপারিওয়ালা তাকে মাত করবার জো করেছে। এমন দুঃসময়ে কি করে ফেলে যায়—জুৎ দিতে দিতে কখন এক সময় বসন্ত নিজেই বসে পড়েছে, তার হুঁশ নেই।

খেলা ভাঙল। তখন গভীর রাত, দশমীর জ্যোৎস্না ডুবে গেছে। ভয় হল, দরজায় তালা দিয়ে আসে নি—ইতিমধ্যে চোর ঢুকে যদি যথাসর্বস্ব নিয়ে গিয়ে থাকে। যথাসর্বস্ব অবশ্য অতিরিক্ত মূল্যবান কিছু নয়—টাকাকড়ি বসন্ত কাছছাড়া করে না, গামছার পুঁটুলিতে বাঁধা একখানা ধুতি ও একটা উড়ানি, মাটির হাঁড়ি-কুড়ি দু-তিনটা আর ছড়িসহ বেহালাটি। ছুটোছুটি করে এসে দেখে, যা ভেবেছে তাই—চোর সত্যিই ঘরে ঢুকে পড়েছে, তবে জিনিসপত্র নিয়ে পালাবার গরজ দেখা যাচ্ছে না, খিল এঁটে এমন দখল করে বসেছে যে বিস্তর চেঁচামেচি ও দরজা ঝাঁকাঝাঁকি করেও সাড়া মেলে না।

চেঁচামেচিতে দূরবর্তী দোকানের লোকগুলা পর্যন্ত ঘুমচোখে সাড়া

দিতে আরম্ভ করল। অবশেষে দরজা খুলল। নত মেজে দাঁড়িয়ে আছে হরিমতী। নিজের ভাড়া-দেওয়া ঘরে এতক্ষণ বেদখল হয়ে ছিল, তার উপর খিদের নাড়ি জ্বলছে, বসন্ত আগুন হয়ে উঠল।

আমার ঘরে ঢুকেছ কি জন্যে? কৈফিয়ৎ দাও বলছি।

হরিমতী কি বলতে গেল। শব্দ বেরোয় না, ঠোঁট দু'টি শুধু থর-থর করে কেঁপে ওঠে। বসন্ত বলে, চালাকির জায়গা পাও না? এক দিন থাপ্পড় মেরে মুণ্ডু ঘুরিয়ে দেব। টের পাবে সেই সময়।

কাজটা আজও যে অসম্ভব ছিল, তা নয়। কিন্তু হরিমতী হঠাৎ ঝর-ঝর করে কেঁদে ফেলল। রাত দুপুর, কোন দিকে কেউ নেই, ঘরের ভিতরে দাঁড়িয়ে বয়স্থা মেয়ে কাঁদছে, কি জানি কি রকমটা হয়ে গেল বসন্তর মন। বিব্রত ভাবে সে বলতে লাগল, কেঁদ না—আর জ্বালাতন কোরো না লক্ষ্মী। থাপ্পড়ের কথা শুনে এদ্দুর, আর ঘা-গুতো একটা-কিছু খেলে কি করতে? এই বীরত্ব নিয়ে মাথায় জল ঢেলেছিলে সেদিন? মারব না, কিচ্ছু করব না—বাপের ঘরের মাণিক, এবার গুটি-গুটি চলে যাও দিকি।

হরিমতী নড়ে না। বসন্ত মারুক, খুন করে ফেলুক, সে কিছুতে যাবে না। বাড়ির নামে এখনও শিউরে উঠছে। অন্য দিনের মতোই রান্নাঘরে সে ঘুমিয়েছিল আড্ডা ভাঙার অপেক্ষায়। চোরের মতো চুপি-চুপি গিয়ে একজনে তার হাত চেপে ধরে। জেগে উঠে চেঁচামেচি করতে করতে সে বেরিয়ে পড়ল। লোকটিও পিছু ছুটল। অবশেষে বসন্তর এই ঘর খোলা পেয়ে সে তাড়াতাড়ি দরজা দিয়েছে।

বসন্ত রুখে ওঠে। এত সব কাণ্ড ঘটল, কবিরাজ ছিল কোন্ চুলোয়?

যেখানেই থাকুক, চোখ-কান বর্তমান থেকেও আজকের রাত্তে নীলকান্তর দেখাশোনা করবার অবস্থা নেই। কি একটা উপলক্ষে আড্ডায় আজ বিশেষ একটু আয়োজন ছিল। গান-বাজনা ও গাঁজা সমানে চলেছে। যে লোকটা রান্নাঘরে ঢুকেছিল, সে নীলকান্তরই যাত্রার দলের লোক, হরিমতী চিনতে পেরেছে তাকে।

উনানের ধারে চেলা-বাঁশ ছিল। তারই একখানা তুলে নিয়ে বসন্ত

বলে, যাও—যাও এবার। রাত দুপুরে বদনামের ভাগী করতে চাও আমাকে ?

ভয়ে ভয়ে হরিমতী রাস্তায় নেমে পড়ে, এক পা দু-পা করে এগোয়। বসন্ত বলে, বোসো—আমিও যাচ্ছি। বাপের ধন বাপের কাছে বুঝে দিয়ে আসি।

ঔষধালয়-ঘরে তখনও পাঁচ-ছ' জন রয়েছে, বাঁয়াতবলায় একজনে মাঝে মাঝে চাঁটি দিচ্ছে, অপরগুলি যেন ধ্যানস্থ। একপাশে নীলকান্ত বোধকরি ঘুমিয়েই পড়েছে, প্রবল নিশ্বাস-ধ্বনি উঠছে। তবলচি লোকটা বসন্তকে চিনল। বলে, বেহালা এনেছ কই ? নিয়ে এস, নিয়ে এস। আর জমবে কখন ?

তাদের পাশ কাটিয়ে গিয়ে নীলকান্তর পিঠে ঘা-কতক চেলাবাঁশ বসিয়ে বসন্ত বিনাবাক্যে ফিরে চলল। তখন সে এক মহাকাণ্ড। জেগে উঠে নীলকান্ত পিঠের জালায় লাফালাফি করছে, বন্ধুমণ্ডলী সমস্বরে অভয় দিচ্ছে। হরিমতী ইতিমধ্যে রান্নাঘরে ঢুকে পড়েছে।

অত রাত্রে রাঁধাবাড়া আর ঘটল না, মেয়েটাকে গালি পাড়তে পাড়তে বসন্ত শুয়ে পড়ল। ঘুমও এসেছিল একটু। হঠাৎ জেগে উঠে শুনতে লাগল, ঔষধালয় থেকে মুষলধারে গালিবর্ষণ হচ্ছে, নৈশ নিস্তব্ধতায় প্রত্যেকটি কথা স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে, সব চেয়ে উঁচু হয়েছে নীলকান্তর গলা। সকাল হোক, দেখা যাবে কত বড় চাটুজ্জের ভাই। দেহটা দুই খণ্ড করে যদি গঙ্গার জলে ভাসিয়ে না দেয়, তবে যেন তাদের নামে কুকুর পোষা হয়। ইত্যাদি, ইত্যাদি।

এই সব হাঙ্গামে বসন্তর ঘুমাতে দেরি হয়ে গেল, বেলা পর্যন্ত পড়ে থেকে পুষিয়ে নেবে এই ছিল মতলব। কিন্তু ভোর না হতেই দরজা ঝাঁকাঝাঁকি। নীলকান্ত ডাকছে। অতএব নেশার ঘোরে যা বলেছিল, নেশা ছুটলেও সে তা মনে রেখেছে। বিরক্ত হয়ে বসন্ত উঠল, গত রাতের চেলা-বাঁশখানা নিয়ে দরজার পাশে দাঁড়িয়ে সন্তর্পণে খিল খুলে দিল। ঢুকে পড়লেই মাথা ফাটিয়ে দেবে, তা ওরা যতজনে আসুক। কিন্তু নীলকান্ত ঘরে ঢোকে না, বাইরে থেকে মিনতি করতে লাগল, কৃপা করে এস না একটু। একটা কথা নিবেদন করি।

মুখ বাড়িয়ে দেখে নীলকান্ত একাই, সঙ্গে কেউ নেই। বসন্তকে দেখেই সে নিজের গাল দু-হাতে চড়াতে লাগল।

কি, ও কি ?

নীলকান্ত বলে, মহাপাতক করেছি মশায়। ওসব আমি একেবারে ছেড়ে দিয়েছি। কালকেই শুধু দলে পড়ে—

এখন বসন্ত ভেবে পায় না, কি এমন অপরাধ নীলকান্তর—যার জন্য কাল সে অমন মারমুখি হয়ে গিয়েছিল। বেটা ছেলে—একটু-আধটু নেশাভাঙ করবে, সেটা এমন মারাত্মক কিছু নয়। বলল, নেশা ছাড় না ছাড়, দলটা ছেড়ে দাও। নিতান্ত যদি ইচ্ছে করে, একা-একা খেয়ো।

এ সব যে দলেরই ব্যাপার! একা খেয়ে জুত হয় কখনো ?

এ কথার সত্যতা বসন্ত খুব জানে। তখন সে অন্য দিক দিয়ে গেল। বলে, তোমার দলের লোকগুলো বড্ড খারাপ কবিরাজ। ওদের মধ্যে থেকেই তো কাণ্ডটা করল!

নীলকান্ত বলে, কিন্তু তা-ও বোঝ, ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরেরা কি আসবে আড্ডা দিতে ?

এর উপরে কথা চলে না। বসন্ত একটু ভেবে বলল, মেয়েটার বিয়ে দিয়ে দাও। শ্বশুরবাড়ি চলে যাক, তার পরে যাচ্ছে-তাই কোরো।

নীলকান্ত এবার খপ করে তার হাত জড়িয়ে ধরল। বলে, সেই জন্যেই এসেছি। তুমি একটা ঠিকঠাক করে দাও। দেখ, কি রকম চেলাকাঠ মেরেছিলে। কালসিটে পড়ে আছে। তা সত্ত্বেও এসেছি।

এখন দিনের বেলা ঠাণ্ডা মাথায় শাস্তির বহর দেখে বসন্তর করুণা হয়। সে ভরসা দিল—চেলাকাঠ মারার দরুন যেন সত্যি সত্যি একটা দায়িত্ব এসে পড়েছে তার—বলে, আচ্ছা—দেখব।

ইতিমধ্যে নীলকান্ত আর একদিন খাতির করে তাকে নিমন্ত্রণ খাওয়াল। তাগিদ রোজই চলেছে। বিরক্ত হয়ে শেষে বসন্ত বলে, বেহালায় ইস্তফা দিয়ে আমি কি পাত্র খুঁজতে বেরুব ? বেশ, আমার সঙ্গেই না হয় দিয়ে দাও।

তোমার সঙ্গে ?

দশ বছর তপস্যা করলেও এমন পাত্র পেতে না। আংটি চাটুজ্জের ভাই, চকমিলানো দালান-কোঠা। মেয়েটার কপাল ভাল। নেহাৎ কথা দিয়ে ফেলেছি তাই—

ইতিপূর্বেও অবশ্য আরও অনেক জনকে অনেক ক্ষেত্রে কথা দিয়েছে, ভাঙতে তার তিলার্ধ আটকায় নি। কিন্তু আংটি চাটুজ্জের ভাইয়ের মাথায় জল ঢেলে ঠাণ্ডা করবার আস্পর্ধা যার, তাকে বিয়ে করে সকাল-বিকাল দুইবেলা কানের কাছে অবিরত বেহালা শোনাতে হবে, এই তার সঙ্কল্প।

নীলকান্ত যথাসম্ভব পাত্রের খোঁজখবর নিল। বিয়ে হয়ে গেল। বসন্ত করালীর ঘরে এসে বলে, কাজটা গর্হিত হল, কি বল দাদা? কেবলই জড়িয়ে পড়ছি। এরা আবার নিচু ঘর।

করালী বলে, আজকাল ও-সমস্ত দেখে না।

তা ঠিক। তা ছাড়া প্রবাসে নিয়ম নাস্তি। আছি তো গঙ্গার উপর। দোষ-টোষ শুধরে গেছে। কিন্তু আমার ভাই টের পেলে খুন করে ফেলবে। জাত আর ধনসম্পত্তি আগলে বাড়ি বসে থাকে; তবে টের পাবে না, বেরোয় না তো।

দু-দুটো মাস যেন উড়ে চলে গেল। বিয়ের খবর শেষ পর্যন্ত গোপন থাকে নি, চারিদিকে রাষ্ট্র হয়ে গেছে। শোনা গেল, আংটি চাটুজ্জেরও কানে গিয়েছে। নিজে একদিন এসে ভাইয়ের কান ধরে টানতে টানতে প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করবে, এই রকম সে শাসিয়ে বেড়াচ্ছে।

আবার এক রাত্রে অভ্যাস অনুযায়ী বসন্ত পিঠটান দিল। আংটির ভয়ে নয়, নূতন নেশা ইতিমধ্যে ফিকে হয়ে এসেছে। আরও কিছুদিন এদিক-সেদিক ঘুরে হাতের শেষ পয়সাটি অবধি খরচ করে অবশেষে সে বাড়ি গিয়ে উঠল। আংটির সামনে যায় না। বাগদি-পাড়ায় ভাব-গানের দল করেছে, তাতে বসন্তর বড় উৎসাহ। নিরক্ষরেরা গানের পদ ভুলে যায়, বসন্ত খাতা খুলে পদগুলো ধরিয়ে দেয়। নিজে যে কয়টা গৎ শিখে এসেছে, তাও খুব কাজে লেগে গেল। দিনরাত্রি সে এই সব নিয়ে মেতে আছে। দুপুরবেলা আংটি ঘুমিয়ে পড়লে টিপিটিপি বাড়ি ঢুকে

সোজা রান্নাঘরে এসে বসে। স্নান ইত্যাদি মাঠের পুকুর থেকে সেরে আসে। আংটির স্ত্রী পটেশ্বরী রান্নাঘরে তৈরি হয়ে থাকে, স্বামীর অজ্ঞাতে দেওরকে খাইয়ে তাড়াতাড়ি বিদায় করতে পারলে সে বেঁচে যায়। রাতে বসন্তর ফুরসৎ নেই। আজ এখানে, কাল সেখানে—বায়না লেগেই আছে। নেহাৎ বায়না যেদিন না থাকে, সেদিনও মহলা দিতে রাত কাবার হয়ে যায়। রাতে তাই বাগদিদের ওখানে ফলাহারের বন্দোবস্ত—চিঁড়ে, গুড়, নারকেল-কোরা। তোফা দিন কেটে যাচ্ছে।

কিন্তু অদৃষ্ট খারাপ, একদিন একেবারে মুখোমুখি পড়ে গেল। গম্ভীর কণ্ঠে আংটি বলল, এই যেখানে দাঁড়িয়ে আছ এটা জগন্নাথ চাটুজ্জের বাড়ি। তাঁর অতুল ঐশ্বর্য রাখা যায় নি, কিন্তু নামটা আছে। সে নাম তুমি ডুবিয়ে দিচ্ছ।

বসন্ত মাথা নিচু করে দাঁড়িয়েছিল। কথা শেষ হলে দাদার পায়ের গোড়ায় ঠক করে প্রণাম করল।

আংটি বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করে, কি করবে?

চলে যাব।

কোথায়?

চাকরি-বাকরি করব, আয়ের চেষ্টা করব, এমনধারা ঘুরে বেড়াব না আর।

আংটি জ্বলে উঠল। অদৃষ্টবিধেয় পড়ে আমি কিছু দিন কালেক্টরির গোলামি করেছি। তা বলে গুষ্টিসুদ্ধ উঞ্ছবৃত্তি করবে? ভাই আমার একটা, তার ভাত আমি স্বচ্ছন্দে জোটাতে পারব।

বসন্ত জবাব দেয় না, তেমনই দাঁড়িয়ে আছে।

এক মুহূর্ত স্তব্ধ থেকে আংটি পুনরায় প্রশ্ন করে, কি ঠিক করলে? যাবেই?

আজ্ঞে হ্যাঁ—

শোন। বলে আংটি বসন্তর হাত ধরল। নিয়ে চলল অন্দরের শেষদিককার গোল-কুঠুরিতে, যেটায় সে আমলে জগন্নাথ চাটুজ্জে মশায় থাকতেন বলে সকলে জানে। ঘরের মাঝখানে গিয়ে বলল, দাঁড়াও। বাইরে এসে আংটি ঝনাৎ করে শিকল এঁটে দিল।

বসন্ত ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলে, ঘরে আটকাচ্ছেন কেন? পোষাচ্ছে না বলেই তো চলে যাচ্ছি।

আংটি প্রবল হাসি হেসে উঠল। বলে, তা বই কি! বেহালা কাঁধে দেশ-বিদেশে জগন্নাথের মুখ পুড়িয়ে বেড়াবে। তাই আমি হতে দিলাম আর কি।

বসন্ত দরজায় প্রচণ্ড লাথি মেরে বলে, আমি থাকব না। যাব, যাব—

আংটি পটেশ্বরীর দিকে চেয়ে বলে, বউমাকে আনতে লোক পাঠিয়েছি। চাবি দিয়ে দেব বউমার কাছে, তোমাকেও বিশ্বাস করি নে ভাইয়ের ব্যাপারে।

হরিমতী এসে পৌঁছল। আংটি উচ্চকণ্ঠে বলে, উড়ো পাখী পোষ মানাতে হবে মা লক্ষ্মী। এই নাও খাঁচার চাবি সামাল করে আঁচলে বেঁধে রাখ। তুমিই পারবে মা সংসার পাকের বাঁধনে পড়ছে যখন, আস্তে আস্তে সমস্ত সয়ে যাবে।

বন্দী বসন্তের উত্তেজিত কণ্ঠ শোনা গেল, বউ তো আদর করে ঘরে তুলছেন। কোন জাত, কি বৃত্তান্ত, খোঁজখবর নিয়েছেন?

আংটি বলে, আমার মা লক্ষ্মী কি আমার চেয়ে আলাদা কিছু হবেন? হুঁ ভয় পেয়ে গেছে, কথা শুনে বুঝতে পারছি, আমার মন ভাঙিয়ে দিতে চায়। মোটে এলোকাড়ি দেবে না, বুঝলে তো মা?

হরিমতীর অপরূপ বেশ। এ চেহারার সঙ্গে বসন্ত একেবারে অপরিচিত। সমস্ত সন্ধ্যা পটেশ্বরী বসে বসে তাকে সাজিয়েছে, বসন্তের স্বভাব চরিত্র সম্বন্ধে সকল খবর দিয়ে তাকে পাখী-পড়ানোর মতো করে পড়িয়েছে। দুরন্ত দেওরকে বাঁধবার এই একমাত্র ফাঁদ, এ ফাঁদের কোন অংশে ত্রুটি থাকলে চলবে না।

বসন্ত অবাক্ হয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। দৃষ্টির সামনে হরিমতী সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে। নিটোল কপালে দুই বিন্দু ঘাম দেখা দেয়। বসন্ত বলে, বাঃ বাঃ—বেড়ে দেখাচ্ছে। এই বস্তায় এমন বালাম চাল, টের পাই নি তো!

একটু আনাড়ি ধরণে হেসে হরিমতী বলে, এই ইয়ে···বেহালা বাজাও না একটু—

তুমি শুনবে বেহালা ?

হরিমতী বলে, হ্যাঁ, শুনব বই কি। তুমি গুণীলোক হয়েছ, গাঁয়ে গাঁয়ে তোমায় ধরে বায়না গাওয়ায়। আমি শুনব না ?

জল এনেছ বুঝি বাটি ভরে—সেই সেবারের মতো গায়ে ঢালবে ? দেখি, হাত বের কর দিকি। ও কি—চাঁপাফুল ?

হরিমতী বলে, সত্যি—খুব নামডাক হয়েছে। সকলে বলে, বড় মিষ্টি হাত। তখন একেবারে নতুন ছিলে কিনা।

বেহালার প্রশংসায় বসন্ত গলে গেল। বলে, আজকের বখশিশ তা হলে কনকচাঁপা ? তারপর চিন্তাকুল হয়ে বলে, কিন্তু এখানে তো হবে না। বউকে বাজনা শোনাচ্ছি, দাদা বউঠাকরুন কি ভাববেন ! না, সে হয় না।

আস্তে, আস্তে—

ভাব এলে জোর বেড়ে যাবে-যে। তখন কি কাণ্ডজ্ঞান থাকে ? বড্ড যাচ্ছে তাই জিনিস।

হঠাৎ এক মতলব মাথায় আসে। বলে, তুমি তো নৌকোয় এসেছ। সে নৌকো চলে গেছে নাকি ?

উঁহু, ঘাটে রয়েছে। ভাটা না হলে পাড়ে পড়বে কি করে ?

তবে এক কাজ কর··চল টিপিটিপি ঘাটে যাই। ঐ নৌকোয় বসে বাজনা শোনাব। খুব মজাদার হবে।

হাসতে হাসতে দু'টিতে হাত ধরাধরি করে খালের ঘাটে গেল। ফুটফুটে জ্যোৎস্না। জলধারা রূপার রেখার মতো মাঠের ভিতর দিয়ে দূরে—কত দূরে চলে গেছে। দূরে, কত দূরে। মাঠের শেষ নেই—খালেরও যেন শেষ নেই। চেয়ে চেয়ে বসন্তর মন কি রকম করে উঠল। হরিমতী লীলা-ভঙ্গিতে তার কাঁধে ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছে। বসন্ত বলে, ইঃ—কাদার মধ্যে নিয়ে রেখেছে। দাঁড়াও এখানে—নৌকো ঘুরিয়ে নিয়ে আসি।

নৌকায় উঠে বসন্ত বৈঠা ধরল। হরিমতী দাঁড়িয়ে আছে।

কই, এসো—

আসছি, আসছি—

ওপারে চললে যে ?

উঁহু, টানের মুখটা কাটান দিয়ে ঘুরে আসছি।

হরিমতী কাতর কণ্ঠে বলে, বড্ড ভয় করছে। নৌকোয় কাজ নেই, ঘাটে বসে বেহালা শুনব। তুমি এসো।

বসন্ত বলে, ছড়ের গুণ ছিঁড়ে গেছে। বড্ড ঠকিয়েছে হরিশ বেহালাদার। তার কাছ থেকে নতুন ছড় এনে তোমায় শুনিয়ে যাব। তুমি দাঁড়িয়ে থাক, ফিরে এসে দেখতে পাই যেন।

হা-হা-হা—মাঠের বাতাসে তার ব্যঙ্গহাসি দূর-দূরান্তরে ভাসিয়ে নিয়ে গেল।

ও দাদা, দাদা গো—

করালী দুয়োর খুলে বেরিয়ে এসে দেখে বসন্ত।

কি রকম ঝঞ্চাটে যে ফেলেছিল দাদা! কবিরাজের মেয়ে হেসে হেসে কাছে আসে, আবার ওদিকে আংটি চাটুজ্জে দরজায় শিকল আটকে রাখলেন। খুব বেঁচে এসেছি এ যাত্রা। খাল পার হয়ে এক রকম ছুটতে ছুটতে এসেছি। পারানির চারটি পয়সা দাও দিকি এক্ষুনি। দিতেই হবে। নোট ভাঙাতে গিয়েই তো সেদিন থেকে এই সব গোলমাল।

পয়সা নিয়ে সেই মুহূর্তে বসন্ত সরে পড়ল।

বিকালে এসে পড়ল দশ আঙুলে দশ আংটি-পরা স্বয়ং আংটি চাটুজ্জে। কালেক্টরির চাকরি ছাড়বার পর জগন্নাথের অট্টালিকা ছেড়ে এই সে প্রথম বেরিয়েছে। নীলকান্তকে সঙ্গে নিয়ে করালীর কাছে এল।

বউমার কাছে শুনলাম, বসন্তর বড্ড ভাব তোমার সঙ্গে। এসেছিল সে ?

করালী বলে, এসেই চলে গেছে।

কোথায় ? কোন দিকে ?

উই যে চাকদার রাস্তা—

গঙ্গার ওপারের দিকে দেখিয়ে দিল। সীমাহীন ধান-ক্ষেত, মাঝখান দিয়ে চাকদার রাস্তা চলে গিয়েছে। দু-পাশে সারবন্দি পত্রবহুল শিরিষগাছ। চেয়ে চেয়ে আংটি গর্জন করে উঠল।

তোমার মেয়ের হয়ে নালিশ করতে হবে কবিরাজ, খোরপোষের দাবি দিয়ে। আর তুমি করালী হবে সাক্ষি। ডিগ্রি করে দেওয়ানি জেলে আটকে রাখব। দেখি, সেখান থেকে কোন ছুতোয় পালায়। জগন্নাথ চাটুজ্জের নাম নিয়ে দিব্যি করছি, এ আমি করবই—

তা কোরো। তত দিন তো বসন্ত সুখে বেড়াক। নিয়ম-মাফিক খাওয়া-দাওয়া আর বেহালা বাজানো—অসহ্য হয়েছিল তার। পরিচিত পথ-ঘাট গাছপালা ঘর-বাড়ি দেখে দেখে চোখ যেন ভোঁতা হয়ে যাচ্ছিল। আর, এ কি জীবন! সকালবেলা জানা নেই, রাতে কোথায় পড়ে থাকতে হবে। হাঁটতে হাঁটতে বালু উত্তীর্ণ হয়ে আসবে জাঙাল, জাঙাল ছাড়িয়ে অড়হর ক্ষেত···কাদের কাছারিবাড়ি···একটা পচা দীঘি, কত পদ্ম ফুটে আছে আমবন, তারই ছায়ায় দাঁড়িয়ে তাকিয়ে দেখবে—দিগন্ত বিস্তৃত বিল তোমার চোখের সামনে। সন্ধ্যায় দাওয়ায় বসে গোপীযন্ত্র বাজিয়ে কে গান গাচ্ছে, একটি মেয়ে গরুর নাম ধরে ডেকে ডেকে বেড়াচ্ছে, বাঁশঝাড়ে সাঁ সাঁ আওয়াজ। যে বাড়িতে খুশি উঠানে গিয়ে দাঁড়াও, নূতন মানুষের সঙ্গে পরিচয় কর, ভালবাসাবাসি হোক, এক রাত্রি বেশ কাটল, আবার ভোরবেলা বোঁচকা বগলে বেহালা বাঁধে বেরিয়ে পড়ো।

কৈলেসকাঠি কোন্ দিকে ভাই? হ্যাঁ গো হ্যাঁ—বারান্দি-কৈলেসকাঠি?

লঙ্কা-ক্ষেতে মাটি তুলতে তুলতে চাষীরা প্রশ্ন করে, মশায়ের সাকিন?

জীবনপুরের পথিক রে ভাই
কোন দেশে সাকিন নাই···

খাজাঞ্চিমশায় ও ভাইঝি

ছোট শহর, দুটি মাত্র পাকা রাস্তা। রাস্তায় কেরোসিনের আলো সর্বসাকুল্যে গোটা কুড়ির বেশি নয়। কিন্তু মিউনিসিপ্যাল ইলেকশনের উদ্যোগ-আয়োজন দেখে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়।

মিস্ত্রি-মজুর তো অনেকেই। তারা অত শত বোঝে না, জিজ্ঞাসা করে, হ্যাঁ মশায়, চাকরিটায় মাইনে কত?

বিমানবিহারী জবাব দেয়, এক পয়সাও নয় ভাই। এ শুধু ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়িয়ে বেড়ানো।

তারা মুখ চাওয়া চাওয়ি করে, কথাটা বিশ্বাস হতে চায় না। বিমান জমিদারের ছেলে, কলিকাতায় থেকে লেখাপড়া করত। এই কিছুদিন হল, বাড়ি এসে জমিদারি দেখতে আরম্ভ করেছে। জমিদারির কতদূর কি বোঝে, সে বলতে পারবেন বুড়ো খাজাঞ্চি গোপাল রায়। আরও অনেকে হয়তো পারবে—কিন্তু সে যাই হোক, তার মোটরের হর্ন শুনলে কাছারির আমলা-গোমস্তা হতে ম্যানেজারটি অবধি তটস্থ হতে হয়। বুড়ো কর্তা শ্রীনাথ রায় অবধি ছেলের সামনে কথা বলতে ভরসা পান না। যে দুটো পাকা রাস্তা আছে, তার উপর দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টা ধুলো ঝড় উড়িয়ে বিমান মোটর হাঁকিয়ে বেড়াত। সেই লোক ইদানীং খদ্দর পরে গান্ধিটুপি মাথায় দিয়ে পায়ে হেঁটে জনে জনের কাছে ধরনা দিয়ে বেড়াচ্ছে, বিনা লাভে মহিষ তাড়াবার এমন উৎসাহ কলিকালের দিনে আর দেখা যায় না। চোখ টিপে একজন মন্তব্য করল, আছে—আছে গো মাইনে না থাক, দু-চার পয়সা এদিক-ওদিক আছে বই কি।

আস্তে বললেও কথাটা বিমানের কানে গিয়েছে। ঘাড় নেড়ে তৎক্ষণাৎ সে স্বীকার করে নিল। আছেই তো, ঠিক বলেছ ভাই। সেই লোভেই সামলা-ছেঁড়া ছোকরা উকিলের দল উঠে পড়ে লেগেছে। যেখানে তাই এক টাকা দিলে হয়, তোমরা সেখানে চার টাকা ট্যাক্স দিয়ে মরছ।

ছোকরা উকিলই বটে, কিন্তু দলসুদ্ধ নয়—একটি মাত্র লোক। সে কিশোরীলাল। বিমান বুঝল, কিশোরীলাল সম্বন্ধে বিশেষণার কেউই কানে নিচ্ছে না। কিন্তু এই সব বলতেই তো আসা! বলতে লাগল, সে রকম আর হবে না ভাইসকল। তোমাদের বাপ-মায়ের আশীর্বাদে, জ্ঞান তো সবাই—পেটের ভাবনা ভাবতে হয় না। উপরি আয়ের কি দরকার আমার? নতুন বাজেটের সময় ট্যাক্স এবার অর্ধেক কমিয়ে দেব।

বিমান উঠে যেতে খুব হাসাহাসি আরম্ভ হল। একজন বলল, চোর সবাই। কিশোরীবাবুও যে সাধু, তা বিশ্বাস করি নে—যে যাই বল। তবে তার হল ছেঁড়া জামা, পাঁচসিকের জুতো। ওই জামা-জুতোর দামটাই না হয় সে উশুল করবে। তুমি বাবা জমিদারের ছেলে, হেঁ-হেঁ তুমি গেলে মোটারের তেল জোগাতে জোগাতে আমাদের হাড় ক-খানা শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাবে।

এই মহাযুদ্ধে জনৈক উলুখড়ের বিষম বিপদ হয়েছে। তিনি ঐ গোপাল খাজাঞ্চি। পঁচিশ বছর চাকরির মধ্যে এমন অঘটন আর কখনও ঘটে নি। অপরাধের মধ্যে কিশোরীলালের খুড়া তিনি। কেবল খুড়া বললেই হবে না, বাপের চেয়ে বেশি। গোপাল জমা-ওয়াশিল-বাকি করেই জীবনটা কাটিয়ে দিলেন, বিয়ে করবার ফুরসৎ হল না। গানবাজনা করতে জানেন না কিন্তু ও বিষয়ে অনুরাগ খুব। আনুষঙ্গিক আর একটা শখ আছে, বটতলার বাছা বাছা গানের বই ও নাটক পড়া। এরই উপর এসেছে কিশোরীলাল ও বনমালা—ভাই-বোন দুটি। বছর দশেক আগে তারা মা-বাপ হারিয়েছে, এই দশ বছর ধরে গোপাল ওই মনিব দু'টির কাছে বড় ভয়ে ভয়ে থাকেন। অত ভয় তিনি শ্রীনাথ রায়কেও করেন না।

দুপুরে ঘুম থেকে উঠে হাতমুখ ধুয়ে গোপাল গড়গড়ার নলটি কেবল মুখে ধরেছেন, বনমালা অগ্নিমূর্তিতে এসে দাঁড়াল।

শুনেছেন কাকাবাবু?

নল মুখ থেকে পড়ে গেল।

বিমানবাবু নাকি বলে বেড়াচ্ছেন, 'পিপড়ার পাখা ওঠে মরিবার তরে'—

কবিতা শুনে গোপাল মহা খুশি হয়ে উঠলেন।

বলেছে নাকি? তা হলে পড়াশুনো করেছে কিছু কিছু। আমি ভাবতাম, কলকাতায় বসে বসে খালি ঘাস কাটত।

নিজের রসিকতায় গোপাল নিজেই হেসে উঠলেন। বললেন, বড্ড খাসা পদ্য রে, অমন আর হয় না। ওর পরের ছত্র বলতে পারিস মালা?

তাঁর উল্লাসে কিছুমাত্র যোগ না দিয়ে বনমালা বলতে লাগল, আর বলেছেন, তুমি নাকি তাঁদের এস্টেটের টাকা ভেঙে দাদার ইলেকশনের জন্যে খরচ করছ।

বলেছে নাকি? গোপালের মুখের হাসি নিভে গেল, বললেন, এটা মিথ্যে কথা। কিশোরী তো একটা পয়সাও আমার কাছ থেকে নেয় না।

বনমালা বলল, আচ্ছা কাকাবাবু, এই বুড়োবয়সে তোমার চাকরির দরকারটা কি?

গোপাল ঘাড় নেড়ে বললেন, কিছু না, কিছু না।

কিশোরী কোর্টে যায় নি, কোন্ দিক দিয়ে এসে অতি সংক্ষেপে সে রায় দিল, চাকরি ছেড়ে দিতে হবে।

আচ্ছা।

কিশোরী বলল, আজই কিন্তু।

আচ্ছা।

চাদরটা কাঁধে ফেলে গোপাল তাড়াতাড়ি নেমে গেলেন। গলি পেরিয়ে সদর রাস্তায় এসে তবে হাঁপ ছাড়লেন। জমিদার-বাড়ি এসে চুপি চুপি মহেশ দরোয়ানের কাছে শুনলেন, সংবাদ বড় গুরুতর—বিমান বাড়ি নেই, দুপুরে দুটো নাকে-মুখে গুঁজে দলবল নিয়ে বেরিয়ে গেছে। শ্রীনাথ উপরে আছেন, তিনিও নামেন নি।

তিন চার জনে প্রকাণ্ড এক সামিয়ানা কাঁধে ভিতরে ঢুকল।

ব্যাপার কি?

মহেশ বলল, শোনেন নি খাজাঞ্চিবাবু? মঙ্গলবারে যাত্রা হবে।

গোপাল উৎসাহিত হয়ে উঠলেন, বলিস কি? কার দল? কি পালা হবে, শুনেছিস কিছু?

মহেশ বিরক্তমুখে বলতে লাগল, জ্বালাতন আর কি! মঙ্গলবারে সমস্ত রাত জেগে আবার বুধবারের ওই হাঙ্গামা। আমাদের যেন মানুষের শরীর নয়। বড়বাবুর বিচার-বিবেচনা নেই।

তখন মনে পড়ল, বুধবারে ইলেকশন। তার অবশ্য পাঁচ দিন বাকি। গোপাল চিন্তিত ভাবে বললেন, গোলমালের মধ্যে যাত্রা কি জমবে? কর্তামশায়ের খেয়াল হয়েছে বোধ হয়। নইলে আর এমন বুদ্ধি কার।

মহেশ বলল, বুদ্ধি বড়বাবুর। যাত্রা না ঘোড়ার ডিম। যারা ভোট দেবে, যাত্রার নাম করে ওদের রাত্রি থেকে আটকে রাখবার ফিকির। সকালবেলা গাড়িতে পুরে পুরে চালান করবে। মিষ্টি-মণ্ডা খেয়ে ভোট দিয়ে তারপর ছুটি। একটু চুপ করে থেকে বলল, বুদ্ধিটা ভাল। কিন্তু আমাদের যে জানে কুলোয় না।

কাছারি-ঘরে ঢুকে গোপাল হাতবাক্সের সামনে বসলেন। বাঁ দিকে রাশীকৃত কানফোঁড়া খাতা। সেই সব খাতার নিচে আছে অভিমন্যু বধ গীতাভিনয়। হাতবাক্সে কনুই ভর দিয়ে পা ছড়িয়ে গোপাল বই খুলে বসলেন। তারপর কর্তা নামলেন, নেমে বৈঠকখানার দিকে গেলেন। গোপাল চোখ না তুলেই সমস্ত টের পাচ্ছেন। চোখ তোলবার জো নেই—খাসা জমেছে বইখানা, বড় চমৎকার বই।

একটু পরেই ডাক এল, গোপাল!

আজ্ঞে, যাই—

আরও পাতা দুই এগিয়েছে। কর্তা আবার ডাকলেন, কই গো, কি করছ তুমি?

রসভঙ্গে বিরক্ত হয়ে গোপাল জবাব দিলেন, একটা জরুরি হিসেব দেখছি, দেরি হবে।

মিনিটখানেক পরে প্রবল হাসির সঙ্গে সচকিত হয়ে মুখ তুলে দেখেন, শ্রীনাথ স্বয়ং এসে দাঁড়িয়েছেন। হাসতে হাসতে বললেন, আ-হা-হা

ঢাকছ কেন? দেখি দেখি, হিসেবটা কিসের! পরশু থেকে বইটা উড়ে গেছে—তখনই জানি, গোপালচন্দোর ওই নিয়ে হিসেব ধরেছেন। বলি, এমন অভিনিবেশ ইস্কুলে পড়বার সময় ছিল কোথায়? তা হলে যে চাই কি একটা হাকিম হয়ে বসতে পারতে।

বুড়ার দু-হাতে দু'টা রেকাব। একটা হাতবাক্সের উপর রেখে বললেন, লুচি ন্যাকড়া হয়ে যাচ্ছে, ও নড়বড়ে দাঁতে ছিঁড়বে না কিন্তু। হিসেবটা না হয় দু-মিনিট বন্ধ থাকুক। ওরে হীরু, জল দিয়ে যা দু-গ্লাস।

মহানন্দে আহার চলেছে, এমন সময়ে সুতীব্র আলোয় সমস্ত উঠান উদ্ভাসিত করে বিমানবিহারীর মোটর এসে দাঁড়াল। জুতোর আওয়াজে মার্বেলের মেঝে কাঁপিয়ে সোজা সে এসে দাঁড়াল কাছারি ঘরের মধ্যে।

ইতিমধ্যে যেন জাদুমন্ত্রে সেখানকার অবস্থা বদলে গেছে। শ্রীনাথের হাতের রেকাবি ঢুকেছে তক্তাপোষের তলায়, আর গোপালেরটা গেছে খাতাপত্রের আড়ালে। হাতের কাছে এক আদালতের সমন পেয়ে গোপাল তারই উপর শশব্যস্তে ঝোঁক দিয়ে চলেছেন।

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চেয়ে বিমান বলল, এখানে কি বাবা?

শ্রীনাথ বললেন, জলকরের হিসেব নিচ্ছি। তুমি যাও বাবা, কাপড়-চোপড় ছেড়ে ঠাণ্ডা হও গে।

বিমান বলল, ঠাণ্ডা হব কি—মাথায় আমার আগুন জ্বলছে। সমস্ত অঞ্চল ঘুরে দেখে এলাম, কোন আশা নেই।

শ্রীনাথ অতিমাত্রায় ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। একবার ছেলের দিকে আর একবার গোপালের দিকে চেয়ে বলে উঠলেন, তা হলে কি হবে?

এমন কিছু হবে না। কিশোরী জিতবে, আমি বিষ খাব। বলে গোপালের দিকে কঠোর একটা দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বিমান গটমট করে উপরে উঠে গেল।

গোপাল নিশ্বাস ফেলে নড়ে চড়ে বসলেন। শ্রীনাথ বলতে লাগলেন পাগল, পাগল! আমাদের সময় এসব ছিল না, আমরা বেশ ছিলাম। আমরা খেতাম, ঘুমোতাম, পাশা খেলতাম, কোন হাঙ্গামা ছিল না। কি বল হে গোপাল?

গোপাল ততক্ষণে পুনশ্চ গীতাভিনয় খুলে বসেছেন। শ্রীনাথের কথা তাঁর কানেই গেল না। বললেন, কর্তা মশায়, যাত্রায় কি পালা হবে ঠিক করলেন? অভিমন্যু-বধ হোক না, খাসা জমবে।

বেশ, বেশ। তোমরাই ঠিক কর। তারপর গোপালের হাত ধরে একটা ঝাঁকি দিয়ে বললেন, ওঠ হে, সন্ধ্যে হয়ে গেল, আর কত কাজ করবে? চল, একহাত পাশায় বসি গে।

হাতবাক্স ও লোহার সিন্দুকে চাবি এঁটে সমস্ত গুছিয়ে-গাছিয়ে নিতে, এর মধ্যে বিমান আবার নেমে এল। এ সময়ে তার নামবার কথা নয়, আজ তার চোখে মুখে যেন আগুন ফুটে বেরুচ্ছে। এসে গম্ভীরভাবে চেয়ার টেনে বসল। গোপালের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করল, খাজাঞ্চি মশায়, কিশোরীকে বলেছিলেন সে কথা?

গোপাল ঘাড় নাড়লেন, আজ্ঞে হাঁ।

শ্রীনাথ বললেন, কি কথা বাবা?

বিমান বলতে লাগল, আমার চিরশত্রু কিশোরী। কলেজে পাশাপাশি বসতাম, ও ক্লাসে বসে ঝিমোত, ক্লাসের বাইরে হৈ-হৈ করে বেড়াত, আর আমি সমস্ত রাত জেগে পড়তাম। তবু সে কোনবার আমায় ফার্স্ট হতে দেয় নি। এখানে ইলেকশন হচ্ছে, তাতেও সে আমার পথ আটকে দাঁড়াল। নতুন উকিল হয়ে এসেছে, যাতে প্র্যাকটিশ জমে সেই তো তার দেখা উচিত। আমি বরং দু-দশ জনকে বলে দেব। এই আমাদের এস্টেটেই কত কাজকর্ম রয়েছে। এসব হাঙ্গামে দরকারটা কি? সব কথা ভাল করে বুঝিয়ে বলেছিলেন খাজাঞ্চি মশায়?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

সরে দাঁড়াতে রাজি হয়েছে?

গোপাল মৃদুস্বরে বললেন, আজ্ঞে—

উৎসাহের প্রাবল্যে বিমান চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

বেশ বেশ, তবে আর কি। তা হলে লিখে দিক একটা কিছু, আমি কালই ছাপিয়ে বিলি করে দেব। হঠাৎ গোপালের মুখের দিকে চেয়ে সন্দেহ হল। বলল, আপনি বলেন নি বোধ হয় খাজাঞ্চি মশায়?

গোপাল সভয়ে জবাব দিলেন, আজ্ঞে, বলব।

মুহূর্তে বিমানের দৃষ্টি রুক্ষ, স্বর কঠোর হয়ে উঠল। বললেন বই-কি! কিশোরী কেল্লা-ফতে করুক, এই সব বলে বলে হাসি-ঠাট্টা করবেন। তারপর চারিদিক তাকিয়ে বলে উঠল, ওঃ, জলকরের নিকেশ নেওয়া হয়ে গেছে এর মধ্যে? খাতাগুলো আর একবার দয়া করে বের করতে হবে। আমি একবার দেখতে চাই।

সকলে নির্বাক। ঠোঁটে ঠোঁট চেপে মাটির দিকে তাকিয়ে বিমান মুহূর্তকাল দাঁড়িয়ে রইল, তারপর মুখ ফিরিয়ে দ্রুতবেগে উঠান পেরিয়ে নিজের ঘরে চলে গেল। খাতা বের করবার অপেক্ষায় রইল না।

এরই দিন দুই পরে এক কাণ্ড হয়ে গেল। গোপাল সম্প্রতি নদীর ধারে নূতন বাড়ি করেছেন। বিমান শুনেছে কথাটা, কিন্তু তেমন কানে নেয় নি। তারা এক একটা রাস্তা ধরে ঘুরছিল। তখন আসন্ন সন্ধ্যা, নদীর জল ডুবন্ত সূর্যের আলোয় ঝিকমিক করছে। বিমান আর জন দুই-তিনকে নিয়ে ঢুকে পড়ল গোপালের বাড়ি। নিচের তলায় কেউ নেই, ঘর-দোর হাঁ-হাঁ করছে।

অক্ষয় সন্দেহ প্রকাশ করল, এই বাড়ি ভাড়া নিয়েছে ভূপাল সাহ কখনো নয়। আড়ম্বর মানুষ, এ রকম পছন্দ পাবে কোত্থেকে?

ফিরে যাবে মনে করছে, এমন সময় আলো হাতে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল বনমালা। বিমান চেনে না, কিন্তু বনমালা তাকে চিনতে পারল। ছোটবেলায় কতবার সে গোপালের সঙ্গে চণ্ডিদাস-বাড়ি গিয়েছে, বিমান ছুটিতে বাড়ি আসত, সেই সময় তাকে দেখেছে। বনমালা বলল, আসুন। আলো রেখে সকলকে চেয়ার দেখিয়ে দিল।

কি দরকার বলুন তো?

এমন সপ্রতিভ মেয়ে বিমান খুব কম দেখেছে। এ রকম জায়গায় তো আশাই করা যায় না। ছাপানো নানা রকম নিবেদনপত্র তারা ছড়াতে ছড়াতে যাচ্ছিল, একজনে তার একখানা বনমালার হাতে দিল।

বনমালা হেসে বলল, ভোট চাইতে এসেছেন?

বিমান বলল, বুঝছেন তো দুর্ভোগ। বাড়ির কর্তারা কোথায় সব?

বনমালা বলল, এখন কেউ নেই। থাকুন আর না থাকুন, এ বাড়ির ভোট আপনি তো পাবেন না।

এ রকম স্পষ্ট ভাষায় কেউ 'না' বলে না। সবাই স্বীকার করে, এমন কি দিব্যি করে বলতেও অনেকে গররাজি নয়—যদিও বিমান জানে, সেই দিব্যি-ওয়ালাদের শতকরা নব্বুই জন ভিন্ন দলের। বিমান চমকে গেল। বলল, ভোট পাব না—কারণটা শুনতে পাই?

বনমালা বলল, কারণ একটা নয় তো। প্রথমত আপনি বড়লোক, অতএব ভিন্ন জাত—

বিমানবিহারী অধীরভাবে তর্ক আরম্ভ করল, কেন, বড়লোক হলে মানুষ হতে নেই? এসব ধারণা কেন আপনাদের হয়? কে বলে বেড়ায় এসব?

বনমালা বলল, আচ্ছা, এ বিচার না হয় আর একদিন হবে। আজ আপনার অনেক কাজ। বরঞ্চ অন্য কোথাও গিয়ে ভোটের চেষ্টা করলে মিছামিছি সময় নষ্ট হবে না।

বিমান আরও চেপে বসল। থাকুক কাজ। চাই না অন্যের ভোট। খান দুই মোটর আছে বলেই আপনাদের ভোট পাবার অনধিকারী নই, এইটে প্রমাণ করে তবে আজ এখান থেকে উঠব।

বনমালা খিলখিল করে হেসে উঠল। বলে, প্রমাণ করলেও ভোট পাবেন না। যেহেতু এটা গোপাল ঘোষের বাড়ি। কিশোরীলাল ঘোষ আমার দাদা।

বাড়িতে কেউ নেই, এটা বনমালা মিথ্যা বলেছিল। গোপাল ছিলেন, তিনি এসব টের পান নি। তিনি উপরে ছিলেন। বনমালা বলল, শোন কাকাবাবু, আজ মজা হয়েছে। বিমানবাবু এসে হাজির। বলেন, ভোট দাও।

তারপর হেসে বলল, আমার ভোটটা আমি ওকে দেব ভাবছি।

গোপাল সায় দিয়ে বললেন, দেওয়া তো উচিত। কিশোরী যদি ওই খেয়ালটা ছাড়ত, আমার ভোটও ওকে দিতাম। বড্ড ভাল ছেলে।

বনমালা ঠোঁট বেঁকিয়ে বলল, ভাল না ছাই! কি বলছিল, জান?

গোপাল রীতিমতো চটে উঠলেন।

বলেছে তা গায়ে ফোস্কা উঠেছে নাকি? অমন ঢের ঢের বলে

থাকে। আমাদের সময় কি হত? তখন ভোটের কুরুক্ষেত্তোর ছিল না, বেধে যেত তবলার বোল কি পাশার দান নিয়ে। তোদের আমলে খালি মুখের কথা। আমাদের বেলায় হাতাহাতি হয়ে যেত।

পরদিন বাপের সঙ্গে দেখা হতেই বিমান বলল, খাজাঞ্চি মশায়ের বাড়িখানা দেখেছ?

শ্রীনাথ উৎসাহভরে বলতে লাগলেন, খাসা বাড়ি। আমায় নিয়ে গিয়েছিল একদিন। যাই বল বাবা, আমাদের বাড়ি বড় বটে—কিন্তু গোপালের বাড়ি ছোট হলেও ছবির মতো। আমার তো ইচ্ছে করে ঐ রকম একটা জায়গা পেলে রাতদিন গিয়ে পড়ে থাকি।

বিমানের মুখের দিকে চেয়ে বাপের কথা বন্ধ হল। ভ্রূকুঞ্চিত করে বিমান বলল, বাড়ি ভাল, তা জানি। কিন্তু উনি মাইনে পান কত?

শ্রীনাথ ইতস্তত করে বললেন, তিরিশ বোধ হয়।

বিমান বলল, তিরিশ নয়—আটাশ টাকা। তাও আট মাস বাকি পড়ে রয়েছে, নিয়ে যাবারই ফুরসৎ হয় না। পাঁচ বছরের কাগজ উল্টে দেখলাম, বরাবর পুজোর সময় একসঙ্গে বারো মাসের মাইনে নিয়ে যান। বাকি এগারো মাস কি করে চলে তা হলে?

সে কৈফিয়ৎ যেন শ্রীনাথের দেবার কথা। বলতে লাগলেন, জমা-জমি আছে কিছু কিছু। কিশোরীও রোজগার করছে।

আর বাড়ি?

করেছে একরকম করে। বাড়িভাড়া লাগে না, তাই চলে যায়।

কঠোর কণ্ঠে বিমান বলল, কিসে চলে, তা বোঝবার বুদ্ধি আমার আছে। কিন্তু বড্ড সেয়ানা, কাগজপত্রে ধরা-ছোঁয়া পাচ্ছি না। যাই হোক বাবা, নতুন খাজাঞ্চি রাখতে হবে, এস্টেট ফাঁক করে দিচ্ছেন। কাঁচা পয়সা নইলে কিশোরী অমন করে দু হাতে ছড়াতে পারে? কোর্ট থেকে যা আয় করে, সে তো আমার অজানা নেই।

একটু পরেই হেলতে দুলতে পান চিবাতে চিবাতে গোপাল এসে উঠলেন। বাপে-ছেলেয় তখনও কথাবার্তা হচ্ছে। প্রথমটা গোপাল

বিমানকে দেখেন নি, তারপর দেখতে পেয়ে পাশ কাটাবার উদ্যোগে ছিলেন। বিমান ডাকল, শুনুন খাজাঞ্চি মশায়—

গোপাল তটস্থ হয়ে এসে দাঁড়ালেন।

আপনি ইংরেজি জানেন না। তাতে এস্টেটের কাজকর্মের অসুবিধা হচ্ছে। আমরা একজন ইংরেজি-জানা ক্যাশিয়ার রাখব।

গোপাল জবাব দিলেন, আজ্ঞে—

আজই আপনি ম্যানেজারের কাছে চার্জ বুঝে দেবেন। খেসারৎ হিসাবে আপনাকে তিন মাসের মাইনে দিয়ে দেওয়া হবে।

মাথা নিচু করে গোপাল বললেন, যে আজ্ঞে—

তাড়াতাড়ি কাছারি-ঘরে ঢুকে পড়তে পারলে গোপাল বাঁচেন। পিছন হতে বিমান বলল, বেলা হয়ে গেছে, এখন আর কাজ নেই— বিকেলেই সমস্ত বুঝিয়ে দেবেন তা হলে।

শ্রীনাথ চুপচাপই ছিলেন, কিন্তু বড় কটু হয়ে উঠছে দেখে আর কথা না বলে পারলেন না। বললেন, অর্থাৎ তুমিই বলছিলে না গোপাল, চাকরি আর ভাল লাগে না—সেই কথা হচ্ছিল আর কি। তা তোমার যদি ইংরেজি-জানা তেমন কেউ থাকে, বরং—

বিদ্রূপের হাসি হেসে বিমান বলল, কিশোরী যদি আসে চাকরিটা তাকে দিতে পারি। কোর্টে যা পায়, তার চেয়ে মন্দ হবে না।

সময় নষ্ট করবার লোক গোপাল নন, ঘরে ঢুকেই যথারীতি অভিমন্যু-বধ খুলে বসেছেন। হরিচরণ মুহুরি অনেক দিনের লোক, গোপালকে বড় ভালবাসে। এগিয়ে এসে ফিস-ফিস করে বলল, খাজাঞ্চি মশায়, বিমানবাবুকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বলুন একবার।

মুখ না তুলে গোপাল বললেন, কি বলব আবার ?

হরিচরণ বলতে লাগল, বাইরেটাই ওঁর ওই রকম। আসলে বড়বাবু লোক খারাপ নন। ইলেকশন নিয়ে মেজাজ বিগড়ে আছে কিনা—

থাকুক গে। বলে গোপাল গীতাভিনয়ের পাতা উল্টালেন।

বিমান কিন্তু ভুলে যায় নি। পরদিন আবার গোপালকে ধরে বলল, খাজাঞ্চি মশায়, ম্যানেজার বলছিল—আপনি হিসেবপত্র বুঝিয়ে দেন নি।

গোপাল বললেন, আজ্ঞে না।

আজই দেবেন।

ঘাড় নেড়ে গোপাল ঘরে গিয়ে উঠলেন।

মঙ্গলবার সকালবেলা দল এসে পড়ল। অধিকারীর গলায় বাইশ-খানা মেডেল। গোপাল সেদিন দুপুরে ঘুমুলেন না, খেয়ে উঠেই অমনি চাদর কাঁধে ফেললেন। বনমালা রান্নাঘরের দিকে ছিল, যেন হাত গুণে টের পায়, সে ঝগড়া করতে এসে দাঁড়াল।

এক্ষুনি চললে যে!

গোপাল সভয়ে বললেন, জানিস নে তো কত কাজ!

কাজ, কাজ! জিজ্ঞাসা করতে পারি, এত কাজের দরকারটা কি?

গোপাল হেসে ব্যাপারটা উড়িয়ে দিয়ে বললেন, দরকার কি, শোন কথা! বলি, টাকাটা তো খোলাম-কুচি নয়—না খাটলে টাকা দেবে কেন?

ফলে উল্টা-উৎপত্তি হল। মেয়ের অভিমান উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। বলে, কাকাবাবু, আমরা অনেক খাই, বুড়ো বয়সে তাই তোমায় অমন করে খেটে মরতে হয়। বেশ, এখন থেকে একবেলা করে খাব। আসুক দাদা—

খেটে মরি আমি? গোপাল এবার হো-হো করে হেসে উঠলেন। গোপালচন্দোর খেটে চাকরি করে, এ তো শ্রীনাথ রায়ও বলতে পারবে না। সকাল সকাল যাচ্ছি, সে না খাটবার ফিকির রে—সবাই রাত জেগে মরবে, আমি ন'টা না বাজতেই চলে আসব, দেখিস।

*

যাত্রা বিকালবেলা থেকে হবার কথা, কিন্তু আরম্ভ হতেই সাড়ে আটটা। গোপাল নিশ্বাস ফেলে ভাবলেন, তাই তো—গান শোনা হবে আর কখন, আসর-বন্দনাতেই আধ-ঘণ্টা কাটবে। খোঁয়াকের উপর একখানা চেয়ারে উবু হয়ে বসে শুনছিলেন। তারপর উত্তরা এসে গলা কাঁপিয়ে গান ধরল। ঐ ছোকরাই গোপালের কাছে একটা বিড়ি চেয়েছিল বটে, গোপাল হাঁকিয়ে দিয়েছিলেন। সে এমন খাসা গান

গায়। গোপাল আর ওরকম ভাবে থাকতে পারলেন না, উঠানে আসরের মধ্যে এসে চেপে বসলেন। ঘড়িতে নয়-দশটা বেজেই চলল, গোপালের খেয়াল নেই।

মহেশ দরোয়ান এসে বলল, বড়বাবু ডাকছেন।

গোপাল অন্যমনস্কভাবে জবাব দিলেন, যাচ্ছি—

আবার খানিক পরে মহেশ এসে ডাকল, কই গো খাজাঞ্চি মশায়, বড়বাবু দাঁড়িয়ে আছেন, বড্ড দরকার, শিগগির আসুন।

গোপাল ঝাঁঝের সঙ্গে বললেন, একশ বার এক কথা। বললাম তো যাচ্ছি। তালুক লাটে উঠেছে নাকি?

মহেশ বলল, কথাটা কানে নেন নি—বড়বাবু ডাকছেন, কর্তামশাই নন।

কিন্তু পাণ্ডবদের তখন সঙ্কটাপন্ন অবস্থা, অভিমন্যু ব্যূহভেদের উদ্যোগে আছেন। গোপাল মহেশের কথায় বিছুমাত্র বিচলিত হলেন না। বললেন, হোকগে বড়বাবু। বড়বাবু তো ফাসি দেবেন না তো! বল্ গে যেযে, এখন হবে না, কাল সকালবেলা বুঝিয়ে দেব।

মহেশ হঠাৎ ত্রস্তভাবে পাশ কাটিয়ে দাঁড়াল। গোপাল ঘাড় ফিরিয়ে দেখেন, বিমানবিহারী স্বয়ং এসে দাঁড়িয়েছে। আসরের মধ্যে সে এসে দাঁড়াবে, এটা একেবারে অভাবিত। আরও আশ্চর্য—কণ্ঠস্বর তার মোলায়েম। সে বলল, একটুখানি না উঠলে তো হবে না খাজাঞ্চি মশায়—

আজ্ঞে। গোপাল তৎক্ষণাৎ উঠে বিমানের পিছু-পিছু চললেন। অভিমন্যু তখন ব্যূহের সামনে খুব লম্ফ ঝম্প সহকারে অ্যাকটা করে বেড়াচ্ছে। রোয়াকে উঠে গোপাল একবার পিছন ফিরে সেদিকে তাকিয়ে নিশ্বাস ফেললেন।···বিমান এ কোথায় নিয়ে যায়? এ যে উপরে চলল। সেখানে বারান্দার উপরে একখানা সোফা বিমান আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল।

সর্বনাশ! বনমালা এসে বসে আছে।

গোপালের রাগ হল। বললেন, ছোট দিদি, দিদি। তা এখানে আসবার দরকারটা কি?

বিমানের মুখ হাসিতে ভরে গেল।

আপনি ভোট দেবেন আমাকে?

বনমালা জবাব না দিতে মুখের কথা কেড়ে নিয়ে গোপাল বলতে লাগলেন, দেবে বই কি। আমার বাড়িতে পায়ের ধুলো দিয়েছেন, সোজা কথা। ও বলেছে, ওর ভোটটা এখানেই দেবে। আবার তাই নিয়ে আমার সঙ্গে কত ঝগড়া।

বনমালার মুখ লজ্জায় রাঙা হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি সে কথা ঘুরিয়ে নিল। বলল, ঝগড়া হয় সাধে। ঝগড়া না করে উপায় আছে তোমার সঙ্গে? রাত্রি ক-টা বাজল কাকাবাবু?

গোপাল বললেন, বলেছি তো ফিরতে ন'টা হবে। তাই বুঝি ছুটে আসা হয়েছে?

বনমালা বিমানের দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টি হেনে বলতে লাগল, আসব না তো বুড়োবয়সে রাত জাগিয়ে তোমায় মেরে ফেলবে, বসে বসে তাই দেখতে হবে নাকি? বাড়ি চল কাকাবাবু, গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে, কানাই গাড়িতে বসে—

বিমানের অপরাধ নেই, সে তো গোপালকে থাকতে বলে নি। কিন্তু সে রাগ করল না। বলল, বাড়ি যাবেন কি রকম? ভোট দেবেন যখন বলেছেন, এইখানে থাকতে হবে।

বনমালা হাসিমুখে বলল, আটকে রাখবেন নাকি?

নিশ্চয়। যত ভোটার কেউ যেতে পারবে না। সবাইকে যাত্রা শুনতে হবে। কাল ভোট দিয়ে তারপর ছুটি। তারপর হেসে উঠে বলল, যা জেঠাইমা ওঁদের সঙ্গে বসে যাত্রা শুনুনগে, যান।

গোপাল মহানন্দে সায় দিয়ে উঠলেন, সেই ভাল। পালাটা জমেছে।

কিন্তু ভবী ভুলবার নয়। সে উঠে দাঁড়াল। বিমানের নির্দেশমতো যাত্রা শুনতে না বসে সে গোপালের হাত ধরে বলল, বাড়ি চল।

এই রকম ক্ষেত্রে গোপাল কাউকে ভয় করেন না। হেঁকে উঠলেন, বলেছি তো, রাত্তির হবে—ন'টার আগে ফিরব না।

ন'টা বেজে গেছে দেড় ঘণ্টা আগে।

বনমালা দেয়াল-ঘড়িটা আঙুল দিয়ে দেখাল।

হুঁ, বাজলেই হল! এখনও ব্যূহের বাইরে রয়েছে, ঐ ব্যূহ ভেদ হবে, তারপর অভিমন্যু-বধ, তারপর জয়াসন্ধ-বধ। ঘড়ি যদি লাফিয়ে লাফিয়ে চলে, আমি তার করব কি?

বিমান নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছে। সমর্থনের আশায় তার দিকে তাকিয়ে গোপাল বললেন, যাঁদের চাকরি করি, কাল তাঁদের মহামারী কাণ্ড। তাতে আধঘণ্টা যদি দেরিই হয়, কি হবে?

চাকরিতে ইস্তফা দিতে হবে। পঁচিশ বছর শরীরপাত করেছ, আর করতে দেব না।

গোপাল বললেন, দেব তাই। যাত্রা ভেঙে যাক, কাল সকালে দেব।

কোনদিক থেকে শ্রীনাথ সেই সময়টা এসে পড়লেন। তিনি বলে উঠলেন, সেই ভাল। আমিও ইস্তফা দেব। তারপর বুঝলে গোপাল, দু-জনে কাশী গিয়ে সেখানে পাশার ছক পেতে নেব। বলতে বলতে তিনি হো-হো করে হেসে উঠলেন।

বিমান বলল, সে কি করে হবে? ভেবে দেখলাম, ওঁকে ছাড়লে মুশকিল হবে। আমরা আগে কাজকর্ম শিখে নিই ভাল করে। তারপর গোপালের দিকে চেয়ে বলল, বুঝলেন খাজাঞ্চি মশায়, চাকরি আপনি ছাড়তে পারবেন না।

যে আজ্ঞে—বলে গোপাল সসম্ভ্রমে ঘাড় নাড়লেন।

বিমান বলতে লাগল, আর ভেবে দেখলাম, মিউনিসিপ্যালিটিতে যাওয়া আমার পোষাবে না। কিশোরী যাক। ঘরের খেয়ে কে অত খাটবে? যত ভোটার এসেছে, যাত্রা থামিয়ে এখনই সকলকে বলে দিচ্ছি—

এবার গোপালের বিশেষ আপত্তি দেখা গেল। বললেন, আজ্ঞে, ব্যূহভেদটা আগে হয়ে যাক।

বিমান আপত্তি করল না, খুব হাসতে লাগল। ততক্ষণে গোপাল শ্রীনাথের সঙ্গে শশব্যস্তে নিচে নামতে লেগেছেন। চেঁচিয়ে বললেন, ওরে মালা, তুই তবে গিন্নিমাদের সঙ্গে বসে শোনগে যা। ব্যূহভেদ হয়ে গেলেই মায়ে-পোয়ে বেরিয়ে পড়ব।

বিমান মৃদুকণ্ঠে বলল, বৃহভেদ হয়ে গেছে বলে ভরসা হচ্ছে, কি বলেন ?

যান। বলে বনমালা রাগ করে মেয়েদের ওদিকে চলে গেল।

বিমানের মা বলছিলেন, মেয়েটি বড় খাসা। যেমন পটের মতো চেহারা, তেমনই মিষ্টি কথাবার্তা।

বিমান বলল, বড্ড ঝগড়া করে মা। তোমাদের সামনেই ভিজে বেরালটি।

মা হেসে বললেন, তোর সঙ্গে করেছে নাকি ? তা হলে দেখেছিস তুই ? তোর যা স্বভাব, ঝগড়াটে না হলে তোকে আঁটবে কে ? কেমন লক্ষ্মীর মতো আমার পায়ের গোড়ায় বসেছিল। ইচ্ছে হচ্ছিল, লক্ষ্মীকে ঘরে বেঁধে রাখি।

বিমানের এত শপথ-প্রতিপত্তি, মায়ের কাছে কিছুই খাটে না। সে চুপ করে রইল।

তারপর একটুখানি ভেবে মা বলতে লাগলেন, তবে আমাদের গোপাল খাজাঞ্চির ভাইঝি—এই একটা কথা। কর্তার সঙ্গে যতই থাক, তবু ঘোষ-মশায় এখানে চাকরি করেন। তাঁরই ভাইঝি কিনা—

এবার বিমানের কথা ফুটল।

তা যদি বল মা, তবে আমি কিছুতে শুনব না—

হাত মুখ নেড়ে সে মহাতর্ক শুরু করল, বড়লোক-গরিবলোক চাকর-মনিব—ওসব ভগবান করেন নি, মানুষে করেছে। রাশ্যা বলে দেশ আছে, শুনেছ ? সেখানে সব সমান—

পৃথিবী কাদের ?

একেবারে উঠানের উপরে বীজতলা, সেইখানে ধান বুনেছে। নূতন বর্ষায় ধানচারার রঙ হয়েছে মেঘের মতো কালো। নটবর লাঙ্গল নিয়ে ক্ষেতে যাবার সময় দেখে, ক্ষেত থেকে ফিরে এসে দেখে, রাত্রিবেলা একঘুমের পর তামাক সেজে যখন দাওয়ায় বসে, তখনও ঐ বীজতলার দিকে চেয়ে চেয়ে দেখে।

এরই মধ্যে একদিন সর্দি করে একটু জ্বর হয়েছে সৌদামিনীর। আর যাবে কোথায় ? নটবর বলে, হুঁ হুঁ—বুঝতে পেরেছি। ঘর তো নয়—এ হয়েছে যেন তেঁতুলতলা। বাইরের বৃষ্টি বন্ধ হয়, তেঁতুলতলার বৃষ্টি থামে না। বোসো—

ক্রোশ পাঁচেক দূরে ভদ্রার ওপারে পিস শ্বশুরের বাড়ি, তাদের অবস্থা ভাল। নটবর ছুটল সেখানে। বলে, তিন কাহন খড় দিতে হবে গো পিসেমশাই। মেয়ে তোমাদের নবাব-নন্দিনী। গায়ে ফোঁটা দুই জল লেগেছে, সেই থেকে বিছানা নিয়েছেন—

পিসে একটুখানি ইতস্তত করতে নটবর বলল, ভাবছ কেন গো ? এই চারটে মাস দেরি কর—তোমার ঐ তিন কাহনের জায়গায় আর এক কাহনের বেশি দাম ধরে দেব। জমিদার এবার লকগেট করে দিয়েছে, আমার বাইশ বিঘে জমিতে সোনা ফলবে। আর কিছু ভাবনা করি ?

ক্ষেতের কাজের ফাঁকে ফাঁকে নটবর মটকায় উঠে ঘর ছায়। নিচে থেকে সৌদামিনী খড়ের আঁটি ছুঁড়ে দেয়। খড় সে অবধি বড় পৌঁছায় না, নটবরের কাছেও যায় না, গড়িয়ে আবার নিচে এসে পড়ে। নটবর বলে, এই তোর হাতের ঠিক ? কোন কাজের নোস রে বউ, তোরা পারিস কেবল বেগুন কুটতে। তাক করে ফেল্ দিকি।

খুব মনোযোগের সঙ্গে বউ তাক করে। খড় পড়ে এবার চালের উপর নয়—নটবরের পিঠের উপর।

উহু—হুঁ এই ?

বউ হেসে গড়িয়ে পড়ে। নটবরের ইচ্ছে করে, নেমে এসে ঐ

নটবর বলল, বড্ড মাথা ধরেছে, ক্ষেতে আর দাঁড়াতে পারলাম না।

দাঁড়াবার জো ছিল না সত্যি। সৌদামিনী মাদুর পেতে দিল। নটবর শুয়ে পড়ে সেই যে চোখ বুজল, সমস্তটা দিনের মধ্যে আর উঠ না—গেলও না। সৌদামিনী বারবার গায়ে হাত দিয়ে দেখে, গায়ে কিন্তু জ্বর নেই।

আরও ক'দিন কাটল এই রকম। নটবরের কি যে অসুখ, সারা সময়ে শুয়ে শুয়ে থাকে। ক্ষেতে ওদিকে বড় গোল লেগেছে—প্রিয়নাথ, মদন, কাসেম আলি ওরা সব সকাল সন্ধ্যা দু-বেলা চাষ জুড়েছে ক দিনের বৃষ্টিতে ধানচারা আরও বেড়ে গেছে। তারপর আবার একদিন রাত্রিবেলা ঘুম থেকে উঠে নটবর ডাকতে লাগল, ও বউ শিগগির ওঠ—উঠে বোঁদাটা বসিয়ে দে একটু।

রাতদুপুরে নটবর ক্ষেতে যায়, ভোর না হতে ফিরে আসে। সৌদামিনী আর পারে না, হাতে দু খানা ধরে একদিন জিজ্ঞাসা করল, কি হয়েছে তোমার? সত্যি কথাটা বল দিকি—

কিছু না, কিছু না। নটবর কথাটা উড়িয়ে দেয়। রোদ লাগলে মাথা ধরে যে। রাতারাতি না চষে উপায় কি?

সন্ধ্যার পর সৌদামিনী ভাত বেড়ে দিয়ে সামনে আসনপিঁড়ি হয়ে বসেছে। কেরোসিনের ডেমি জ্বলছে। দু গ্রাস মুখে দিয়ে নটবর ফিক করে হেসে উঠল। বলে, বউ, দেখছি যে মস্ত মচ্ছব ব্যাপার। রোজ রোজ এ তুই আরম্ভ করলি কি?

ব্যাপার গুরুতর বটে। ডাল এবং শাকের ঘণ্টের উপর খেজুর গুড়ের পায়েস দিয়েছে। সৌদামিনী গাই দুইতে পারে ভাল। হরি চাটুজ্জের বেয়াড়া গরু কেউ সামলাতে পারে না, আজ সৌদামিনী দুয়ে দিয়ে এসেছে। সেখান থেকে দুধ পেয়েছে, এবং দুধ যখন পাওয়া গেল—ঘরে গুড় রয়েছে—আগুনে একটু সিদ্ধ করা বই তো নয়। কিন্তু এত সব কৈফিয়ৎ দেবার মেয়ে সৌদামিনী নয়। সে ঝঙ্কার দিয়ে উঠল, দেখ মানা করে দিচ্ছি—আমি গিন্নি, আমার ঘর-সংসার। তুমি কেন আমার সংসারের কুচ্ছো করবে?

হাসতে হাসতে নটবর বলে, আচ্ছা, আচ্ছা, আর করছি নে। কিন্তু একটা কাজ কর্ বউ, আগে ঐ আলোটা নিভিয়ে দে। মাছ নেই যে কাঁটা বেছে খেতে হবে। এত রোশনাই করলে লাটসাহেবও যে ফতুর হয়ে যায়।

সৌদামিনী তাড়া দিয়ে ওঠে, আবার?

হতাশ স্বরে নটবর বলে, বেশ, কিন্তু আবার যে কাল বলবি এক পয়সার কেরাসিন কেনো—

কাল বলব না, পরশুও না। তুমি চুপ কর দিকি। অত বকবক করলে খেয়ে কখনো পেট ভরে।

বাঁশবাগানের ফাঁক দিয়ে উঠানে অস্পষ্ট জ্যোৎস্না পড়েছে। নটবর এক এক গ্রাসে খায় আর ভাবে, না—মেয়েমানুষের মতো বেহিসাবি আর নেই। এই তো চাঁদের আলো পড়েছে, কি দরকার ছিল কেরাসিন পুড়িয়ে নবাবি করবার।

হঠাৎ কুকুর ডেকে ওঠে। নটবর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পুবধার দিকে চাইল। সৌদামিনী বলে, কিছু না, তুমি খাও—

হাত গালে ওঠে না।

সৌদামিনী ব্যাকুল কণ্ঠে বলল, কই, উঠছ যে। শেয়াল টেয়াল কি ওধারে যাচ্ছিল। তুমি বোসো, আমি দেখে আসছি—

টেমির কেরোসিন অকারণে ব্যয় হতে লাগল—লাটসাহেবের অপব্যয়। কিন্তু নটবরের সেদিকে দৃষ্টি নেই। দারুণ অন্ধকারে সুঁড়ি-পথের দিকে সে তাকিয়ে আছে।

ফুঃ ফুঃ—

আলো নিভিয়ে এক ঝটকায় সৌদামিনীর হাত ছাড়িয়ে সে অদৃশ্য হয়ে গেল।

কাছারির মাণিক বরকন্দাজ উঠানে এসে দাঁড়াল। এদিক ওদিক উঁকি মেরে সে বলে উঠল, কোথায় গো?

বাড়ি নেই।

ভেগেছে?

পিঁড়ি টেনে নিয়ে ধীরে সুস্থে মাণিক দাওয়ায় উঠে বসল। আপন

আজ্ঞে হ্যাঁ—

নায়েব একটা হিসাব নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন, চশমার ফাঁকে চেয়ে বললেন, শুধু তাই নয় হুজুর, একদিন বরকন্দাজ দিয়ে লাঙল খুলে জমি থেকে তাড়িয়েও দিয়েছিলাম—

ছোটবাবু বললেন, অথচ শুনতে পাই রাত্তিরে রাত্তিরে জমি চষা হচ্ছে। বলি, মতলবটা কি?

নায়েব টিপ্পনি কাটলেন, মতলব বোঝাই যাচ্ছে। পেছনে ঠিক রঘুনাথ সা রয়েছে, এই বলে দিলাম। জমির দখল বজায় রাখছে।

ছোটবাবু বলতে লাগলেন, তোদের জন্যে আমি সদরে ফৌজদারি করতে যাব না। আসবার সময় কলকাতা থেকে একখানা ভাল হান্টার নিয়ে এসেছি। তা-ই যথেষ্ট। দেখবি?

নটবর আকুল হয়ে কেঁদে উঠল, হুজুর বাঁধ ভেঙে তিন তিন বছর ক্ষেত ভাসিয়ে দিল—পেটে খেতে পাই নি, খাজনা দেব কোত্থেকে?

সে ছোটবাবুর পা জড়িয়ে ধরল। এবার জমিতে বড্ড ভাল গোন, সোনা ফলবে, হুজুর। খাবার ধান যা জোগাড় ছিল, সমস্ত বীজতলায় ছড়িয়েছি। এইবারটা রক্ষে করুন ধর্মবাপ, সিকি পয়সা আর বাকি থাকবে না।

নায়েব ডাকলেন শোন শোন—এদিকে আয় নটবর। তোদের ঐ মায়াকান্না শুনলে কি আর রাজ্যি রক্ষা করা যায়? আচ্ছা—আচ্ছা. তামাক সাজ্ দিকি। তোর ধানের চারা খুব ভাল হয়েছে—না?

হ্যাঁ, বাবা—

কত জমিতে বীজধান ছড়িয়েছিস? কাঠা দশেক?

বেশি হবে বাবা—

ভাল ভাল। তা হলে সেই কোন্ না বিশ-কুড়ি টাকার ফসল!

মাণিক বরকন্দাজের দিকে চেয়ে নায়েব বললেন, এ সব খবর তো কই আমাদের কানে আসে না।

নটবর হাত জোড় করে অস্পষ্টস্বরে আবার কি বলতে গেল। নায়েব বললেন, হ্যাঁ, হবে। ধানচারার একটা উপায় হবে বই কি! তুই হুজুরের হুকুম নিয়ে চলে যা এখন।

ছোটবাবু বললেন, আচ্ছা যা। কিন্তু জমি জমিদারের। আর কোনদিন লাঙল চষবি নে—খবরদার!

ঘাড় নেড়ে নটবর বেরিয়ে এল। তারপর হেসেই খুন। জমি চষিস না—হঃ, বললেই হল! চষব না তো সোনা হেন ধানের চারা বুঝি বীজতলায় শুকিয়ে মারব!···নায়েব মশায় লোক মন্দ নয়, ওর মনে মনে দরদ আছে। ছোটবাবু আগে চলে যাক সদরে। কাছারির কিছু পার্বণি লাগবে, তা লাগুকগে—

সৌদামিনী রাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে এসেছিল। জিজ্ঞাসা করল, কি হল?

কিছু না, কিছু না, বাবু শিবতুল্য লোক—

সে জানি। তারপর আর্তকণ্ঠে সৌদামিনী বলল, জমি চষেছে বলে মারধোর করেছে কিনা, সেই কথাটা বল আমায়—

মারধোর? বাঃ রে—। স্ত্রীর মুখের দিকে চেয়ে নটবর বিরক্ত হয়ে উঠল। বলল, মগের মুল্লুক নাকি! এ সব কথা কে বলেছে শুনি? বাবু যে আমাদের সাক্ষাৎ শিবঠাকুর।

সে ওরা সবাই—ঐ বরকন্দাজটা অবধি। শিবঠাকুরেরা ঢোল বাজিয়ে জমি নিলাম করেছে, ঘাড় ধাক্কা দিয়ে দু-পুরুষে জমি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। সেই দিন থেকে তোমার মাথাপরা আর ছাড়ে না। তুমি বল না, কিন্তু আমি সমস্ত শুনেছি, সমস্ত জানতে পেরেছি।

সৌদামিনীর চোখ দিয়ে টপটপ করে জল পড়তে লাগল। নটবর মৃদু কণ্ঠে অপরাধের সুরে বলল, তার আর কি বলব বউ! ওদের দোষ কি, তিন বছরের মালখাজনা পায় নি—

সৌদামিনী আগুন হয়ে উঠল। ওরা খাজনা পায় নি, আর তুমি এই তিন বচ্ছর—দিন নেই, রাত নেই—তিল তিল করে জীবন দিয়েছ, তুমি কি পেয়েছ শুনি?

নটবর বলল, ঠাণ্ডা হ বউ, তুই একেবারে আস্ত পাগল। খাজনা না পেলে ওদের চলে! বুড়ো কর্তা কত টাকা দিয়ে বিষয় করে গেছেন—ছোটবাবু আজও বলছিলেন, সে টাকার সুদ পোষাচ্ছে না।

আর, আমার বুড়ো শ্বশুর ঐ আবাদ করতে সাপের কামড়ে মরেছেন, তাঁর ছেলেপুলের পেটে দানা পড়ছে না—সেটা কিছু নয় ?

অবোধ চাষার ঘরের বউ—নটবর যা বলেছে, পাগলই ঠিক। এই কথাটা কিছুতে বোঝে না, লাঙ্গল টানতে টানতে গরু মহিষও কত মুখ থুবড়ে মরে যায়। মানুষ সাপের কামড়ে মরেছে, জ্বরে ওলাউঠায় পঙ্গপালের মতো মরেছে, বাঘ কুমীরের পেটে গেছে—আবার নূতনের দল এসেছে, যুগের পর যুগ চলেছে, বন কেটে জনপদ হয়েছে, শস্যশালিনী পৃথিবী হাসছে। যাঁদের এই পৃথিবী, রাজ্য দেখতে তাঁরা মাঝে মাঝে শুভ পদার্পণ করেন, রাজ-কাছারিতে উৎসব পড়ে যায়, আলো জ্বলে মাছ আর মিষ্টান্ন দেশদেশান্তর থেকে ভারে ভারে উদয় হয়, শতজনে তটস্থ, তিলমাত্র ত্রুটি যেন না ঘটে। কবে কোনখানে কে মরেছিল, কে তার ইতিহাস মনে রেখেছে—আর তার দরকারই বা কি।

প্রকাণ্ড দিন এবং তারও চেয়ে মন্থর চারিপ্রহর রাত্রি কেটে যায়, নটবরের কাজকর্ম নেই। বিলের মধ্যে কেবল তার ক্ষেতটাই ফাঁক যখন-তখন সে আলের উপর গিয়ে বসে, বুকের মধ্যে গুরু করে ওদের সব বোধা হয়ে গেছে, এমন গোল আজ কত বছর হয় নি। দেবরাজ অঝোর ধারে জল ঢালছেন, বৃষ্টির মধ্যে ঝিমঝিম ঝিমঝিম বাজনা বাজে, গাছপালা মাঠ-ঘাট উল্লাসে সবাই মিলে গান ধরে বীজতলায় ধানের চারা দুষ্ট ছেলের মতো বৃষ্টির বাতাসে দাপাদাপি করে। হতভাগারা বলছে যেন, নিয়ে যাও গো আমাদের ঐ বড় বিলের মাঝখানে—দুপুরের কড়কড়ে রোদ ধরে মাথা উপর চারিদিকে জল থৈ-থৈ করবে—দু-ক্রোশ পাঁচ ক্রোশ থেকে বাদলা ছুটে আসবে দেয়া ঝিলিক দেবে, কত আমোদ। তার লাঙ্গল বলদও যেন নিঃশব্দে কথা বলে, তার শূন্যক্ষেত হাতজোড় করে চেয়ে থাকে

এমনি সময় এক একদিন নটবর ভাবে, ঐ পাগলী—সৌদামিনীর কথাগুলো। জমি চষতে দেবে না। হঃ, বললেই হল। আমার বাবা মরেছে সাপের কামড়ে—যে ক'টা ধান ছিল পেটে না খেয়ে বীজতলায় ছড়িয়েছি, জমি দেবে না তো এদের বাবার দেয় কি মাথার উপর ? কেন দেবে না ?

আবার একদিন সে কাছারি গিয়ে একেবারে কেঁদে পড়ল।

নায়েব মশায়, আর যে বাড়ি থাকতে পারি নে—

হল কি?

ফাঁকা ক্ষেত, দাওয়ায় বসলে দেখা যায়। থাকি কি করে? হুকুম দাও—রুয়ে ফেলি। ফসল না হয় কাছারির গোলায় উঠবে।

ছোটবাবু নেই, আমার হুকুমে হবে কি? আসছে, সদর থেকে পাকা হুকুম আসছে।

তারপর প্রায় রোজই নটবর হাঁটাহাঁটি করে।

চোখের উপর চারাগুলি শুকিয়ে যাচ্ছে—তুমি যে বলেছিলে বাবা, উপায় একটা হয়ে যাবে।

নায়েব অভয় দিয়ে বলেন, হবে বলেছি যখন—উপায় হবে না? ব্যস্ত হোস নে নটবর, পাকা হুকুম এল বলে—

অবশেষে হুকুম এল—পাকাই বটে, আদালতের ছাপ-মারা। নটবর সকালবেলা উঠে দেখে, বীজতলায় গরু পড়েছে।

হোই গো, কি সর্বনেশে কাণ্ড গো।

বাঁক নিয়ে তাড়া করতে গরু পালাল, এগিয়ে এল চরণ ঘোষ।

গরু তাড়াও কেন মোড়ল? বারো টাকা গুণে দিয়ে বন্দোবস্ত পেয়েছি—

বন্দোবস্ত? নটবরের চক্ষু কপালে উঠল।

মাণিক বরকন্দাজ দখল দিতে এসেছিল, সে-ই সমস্ত বুঝিয়ে দিল। জমি নিলাম হয়েছে, তাতে খাজনা সব শোধ হয় নি। তাই বীজতলার ধানচারা ক্রোক হয়েছে। চরণ ঘোষ জাতে গোয়ালা—গরু বাছুর অনেক। গরুর খোরাকি কম পড়ে গেছে, তাই কাছারি থেকে বীজতলার বন্দোবস্ত নিয়ে গরু নামিয়ে দিয়েছে।

ভাল, ভাল। নটবরের চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এল। বলতে লাগল, তোমাদের আক্কেল ভাল বটে, মাণিক ভাই। কোন চাষার সঙ্গে বন্দোবস্ত করা গেল না বুঝি! তবু আমার ধানচারা গরুর পেটে যেত না—ভুঁয়ে ঠাঁই পেত।

মাণিকের অনেক কাজ, হাসতে হাসতে সে চলে গেল। চরণ

ঘোষের দিকে নটবর গর্জন করে উঠল, গরু নিয়ে চলে যাও। ভাল হবে না বলছি—

চরণ বলল, টাকা কি আক্কেল-সেলামি দিয়ে এলাম ?

নটবর অধীর কণ্ঠে বলতে লাগল, ধান গরু দিয়ে খাওয়াবে, চাষার ছেলে হয়ে চোখে তা দেখতে পারব না—পারব না। গরু সরিয়ে নাও বলছি। না হয় আমিই উপড়ে দিচ্ছি, বাড়ি নিয়ে গিয়ে খাওয়াও গে—

অদূরে দেখা গেল, চরণের ছেলে কানু—একটা দুটো নয়—তাদের গোয়ালসুদ্ধ গরু নিয়ে আসছে। তাই দেখে চরণের জোর বাড়ল। কিন্তু নটবর উন্মাদ হয়ে উঠেছে। বাঁক নিয়ে সে সমস্ত ক্ষেতে ছুটাছুটি করে। ধান মাড়িয়ে বীজতলা চষা-ক্ষেতের মতো কাদা কাদা করে গরুগুলো ছুটে। নটবর চিৎকার করতে লাগল, বেরো—বেরো আমার জমি থেকে—

কানু ছুটে এল। বাপ-বেটায় এক সঙ্গে এসে নটবরের সামনে রুখে দাঁড়াল, খবরদার।

সঙ্গে সঙ্গে বাঁকের এক বাড়ি চরণের চোয়ালের উপর। চোখে অন্ধকার দেখল, বাবা গো—বলে জলকাদার মধ্যে সেইখানে চরণ বসে পড়ল। কানু চেঁচাতে লাগল। মাণিক বরকন্দাজ বেশি দূর যায় নি—ছুটতে ছুটতে ফিরে এল, মাঠ থেকে চাষারা এল, গাঁয়ের মেয়ে পুরুষও কেউ আর বড় বাকি রইল না। সকলের শেষে এলেন নায়েব মশায়।

কিন্তু আসামির দেখা নেই। ঘর বাড়ি অন্ধি-সন্ধি কোথাও খুঁজতে বাকি নেই—গোলমালে কখন সে সরে পড়েছে, যেন পাখী হয়ে উড়ে গেছে।

উত্তেজনা ও আস্ফালন চলল রাত্রি অবধি। ক্রমশ যে যার বাড়ি যেতে লাগল, চারিদিক নির্জন হয়ে এল। সৌদামিনী আজ সমস্তদিন রান্না করে নি, এক জায়গায় চুপটি করে বসে সকলের গালি শুনেছে আর কেঁদেছে। গভীর রাতে টেমি জ্বলছিল। টেমির আলোয় ছায়া দেখে সে চমকে উঠল। নটবর টিপিটিপি ঘরের মধ্যে এসে উঠেছে। ফিসফিস করে সে বলল, চরণ কেমন আছে রে বউ ?

ভাল। একটু চুপ করে থেকে সৌদামিনী বোবকরি উদ্ধত

অশ্রু রোধ করল। বলল, ভাল না থাকলে কি অমন ঝাঁধুনি-ঝাঁটা গালিগালাজ বেরোয় ?

নটবর একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। সমস্ত চরণের ভিরকুটি। ছুতো ধরে পড়ে ছিল, আমি তখনই জানি—

সৌদামিনী বলল, তা বলে নায়েব ছাড়বে না। থানায় গেছে, কাল তোমার কোমরে দড়ি দিয়ে নিয়ে যাবে। আর বলেছে, ঘরের চাল কেটে বসত ওঠাবে—

মুখখানা ম্লান করে নটবর বলতে লাগল, কেন ছাড়বে ? সুবিধে পেলে কে কাকে ছাড়ে বল্‌ ? একটা ফ্যাসাদ বাধলে দু-চার পয়সা পাওনা-থোওনাও তো রয়েছে ! তারপর সে বলল, বড্ড খিদে পেয়েছে, কিছু ভাত-টাত আছে রে বউ ?

বধূ উঠে দাঁড়াল। ভাত নেই—রাঁধার সম্ভাবনাও নেই। উনুন ভেঙে হাঁড়িকুড়ি ভেঙে চাল-ডাল ছড়িয়ে তারা প্রতিশোধ নিয়ে গেছে।

উঠে দাঁড়িয়ে সৌদামিনী নটবরের হাত ধরে টানল।

চল, চলে যেতে হবে এখান থেকে—

নটবর একটু কাষ্ঠ-হাসি হাসল। মেয়েমানুষ, তায় বয়সে কত ছোট—এইতো মাত্র ক'বছর আগে এই সংসারে এসেছে। কিন্তু সৌদামিনীর মুখের দিকে তাকালে নটবর প্রতিবাদের ভরসা পায় না। একটু ইতস্তত করে বলল, তাই চল্‌। জমি যখন দেবে না—চল্‌ তোর পিসের বাড়ি যাই তবে। পাইকঘেরির বন কেটে নাকি নতুন আবাদ করবে শুনছি—

যা কিছু সামনে পেল, পুঁটুলি বেঁধে তারা কাঁধে নিল। ক'পা গিয়ে বধূ থমকে দাঁড়াল।

কি ?

টেমিটা জ্বলছে যে !

নটবর তাচ্ছিল্যের ভাবে বলল, থাকগে, কি হয়েছে—জ্বলে জ্বলে আপনি নিভে যাবে—

কিন্তু সৌদামিনী মানা শুনল না। ঘরে ঢুকে জ্বলন্ত টেমি নিয়ে দ্রুতপদে বেরিয়ে এল। এসে সেই টেমি পরল চালের কিনারায়।

নূতন ছাওয়া ঘরের চাল রাতের অন্ধকারে ঝিকমিক করছে। চালে আগুন ধরল।

নটবর ছুটে এসে বলে, করলি কি! ঘরে আগুন দিলি—কি সর্বনাশ করলি বউ!

সৌদামিনী হেসে উঠল। আগুন দাউ-দাউ করে ওঠে—হাসি তার আরও উগ্র হয়। বলে, বয়ে গেল—বয়ে গেল! আমাদের কি—যাদের জিনিস তাদের পুড়ছে—তাদের সর্বনাশ—

টেমিটা সে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে নটবরের হাত ধরে বাঁধের উপর দিয়ে ছুটল। নটবর আর ছুটতে পারে না।

থাম্ থাম্—ওরে বউ, ভুল-পথে চললি যে। পিসের বাড়ি কি এইদিকে?

না, যমের বাড়ি।

বালাই ষাট। নটবর একটু রসিকতার চেষ্টা করল। তোর যে কত সাধ বউ! এই বয়সে—এত সকাল সকাল সেখানে যাবি?

সৌদামিনী বলল, হাঁ, যাব। গিয়ে সেই পোড়া বিধাতাকে জিজ্ঞাসা করব, পৃথিবী যদি বাটোয়ারা করে দিয়েছিস—তবে আমাদের সেখানে পাঠাস কি জন্যে?

বন্দে মাতরম্

গ্রামের সীমানায় বিল। এখন অগ্রহায়ণ মাস, জল-কাদা নেই, যত দূর তাকাও ধানবনে যেন সোনা ঢেলে দিয়েছে। গহর আলির দাওয়া থেকে বিল দেখা যায়। কিন্তু সে আর কদিন বা! বড় পুকুরের ধার দিয়ে সারবন্দি আমের চারা পুঁতেছে, এই এবারের বর্ষাতেও আট-দশটা পুঁতেছে—চারাগুলোর নধর সবুজ শ্রী, পাল্লা দিয়ে ডাল-পালা মেলছে, বছর কয়েকের মধ্যে সমস্ত জায়গা জুড়ে ওদিকটা অন্ধকার হয়ে যাবে।

ধান কাটা লেগেছে। দু-বেলাই কাজ হয়। যতক্ষণ নজরে কুলোয় গহর ক্ষেতে থাকে। উঠানে এসে দাঁড়াতেই পত্নী তামাক সেজে

আনে। কাস্তে ফেলে গহর তখন হুঁকা নিয়ে বসে। আরও খানিক পরে হাত-পা ধুয়ে ভাত খায়। পরী ততক্ষণ মাদুর বিছিয়ে রেখেছে। কিন্তু খেয়ে দেয়ে যে বিশ্রাম নেবে, তার উপায় আছে! মল বাজিয়ে বউ অমনই হাজির। বলে, একটা গীত গাও না শুনি।

খঞ্জনি বাজে, গান আরম্ভ হয়। সখীসোনার বারমাসি—ঝিকরগাছার পুল-ভাঙার গান—মুগ্ধ শ্রোতাটি বসে বসে শোনে। ঝিরঝিরে বাতাসে আমচারাগুলো নড়ছে বড় পুকুরের জল জ্যোৎস্নায় ঝিকমিক করছে, শীতের আমেজ লাগছে। গহর আলি হঠাৎ যেন সম্বিৎ পেয়ে জেগে ওঠে। বলে, বউ, অনেক রাত হল। তোর এখনও খাওয়া হয় নি—আজ এই অবধি।

পরীর নেশা লেগে গেছে, উঠতে চায় না। মৃদু হেসে বলে, ক-ঘড়ি বাজল? বারোটা—চোদ্দটা?

তা' বাজল বই কি। এখন তুই খেতে যা।

তাচ্ছিল্যের সুরে পরী বলল, বাজুকগে। যা বাজবার বেজে যাক, তারপর ধীরে সুস্থে খেতে বসব। তুমি আর একখানা ধরো।

গহর গম্ভীর স্বরে কি যেন কি ভাবে। তারপর বলে, এই শেষ কিন্তু। এর পর গান গাইতে নেই।

বলেই গেয়ে উঠল—

সুজলাং সুফলাং মাতরম্

মাত্র তিনটি কথা, তার বেশি জানা নেই। বিশ্রী সুর, উচ্চারণ আরও বিশ্রী। পুণ্য-নাম দেশসেবক যাঁরা, গহরের গান শুনলে তাঁরা ক্ষেপে যেতেন—বলতেন, জাতীয় সঙ্গীতের অপমান হচ্ছে। পরীও হেসে খুন। বলে, অং বং—কি রকম গীত হচ্ছে গো? ভাল দেখে কিছু গাও।

গহর গম্ভীর কণ্ঠে বলল, হাসিস নে বউ, এ আমাদের মাটির গান। বাপজান বড় পুকুর কেটে গিয়েছে চাষীরা লাঙল ছেড়ে ঘাটে এসে বসে, আঁজলা ভরে জল খায়—ঐ হল গিয়ে সুজলা। নতুন ধানে আমাদের বিল ঐ ভরে গেছে, এত যে আমগাছ লাগিয়েছি ওতেও কি রকম ফল ফলবে দেখিস, চাষীরা এখন শুধু জল খায়, তখন আম খাবে, এই সব

কথা দিয়েই গান বেঁধেছে—সুফলা। তারপর গহর প্রশ্ন করল, আমার বীরু-ভাইকে দেখিস নি বউ, নাম শুনেছিস তো?

পরী নামটাও শোনে নি।

গহর বলল, শহরের ফাটকের মধ্যে এখন হয়তো সে ঘানি ঘুরিয়ে মরছে।

বলতে বলতে একটু উন্মনা হয়ে পড়ে। জেলের ভিতরকার ব্যাপার সম্বন্ধে ধারণা তার স্পষ্ট নয়। হয়তো বীরুকে তারা পেট ভরে খেতে দেয় না, এত যে লেখাপড়া শিখেছে তার কোন মর্যাদা দেয় না হয়তো হাতে-পায়ে শিকল বেঁধে রেখেছে। নিশ্বাস ফেলে গহর বলতে লাগল, বীরু-ভাই 'বন্দে মাতরম্' গাইত, আমি হাসতাম। একদিন সে মানে বুঝিয়ে দিল, আমার তাজ্জব লাগল। মাটিকে ওরা মা বলে জানে—গাছপালা, ধানবন, পুকুরের জল, বাড়ি-ঘর-দোর সমস্ত মিলে ওদের মা। সেই মাকে ওরা 'বন্দে মাতরম্' বলে ডাকে।

পরী জিজ্ঞাসা করল, অমন লোকের ফাটক হল?

গহর বলল, ঐ তো মজা। আমরা চাষীর ছেলে, মাটি মেখে দিন কাটে। আমার বীরু-ভাই ভদ্দর হলেও মাটির পরে দরদ আমাদের চেয়ে বেশি। সেই মানুষকে মাটি থেকে সরিয়ে ইটের পাঁচিলে আটকে রেখেছে।

গহর আলি চুপ করল। পরী রান্নাঘরে গিয়েছে। দূরের জ্যোৎস্না-মগ্ন বিলের দিকে চেয়ে চেয়ে গহর তার বীরু-ভাইয়ের কথা ভাবতে লাগল। চোখে জল এসে গেল। কেন মানুষের এ রকম দুর্বুদ্ধি হয়! চাকরি-বাকরি করবি, ঘর-আলো-করা বউ আসবে, মায়ের মুখে হাসি ফুটবে, পায়ের উপর পা দিয়ে দিব্যি দিন কেটে যাবে! তা নয়, বাড়ি বাড়ি গিয়ে লোকের দুঃখের কথা শুনে বেড়ানো, হেরিকেন জ্বেলে পাড়ার এখানে সেখানে সভা করা—

রান্নাঘরে শিকল টেনে দিয়ে পরী শুতে যাচ্ছিল। গহর বলল, কাল মা-ঠাকরুনকে দেখতে যাব। যাবি রে বউ? আমার বীরু-ভাইয়ের মা, দেখলে পুণ্যি হবে।

পরদিন মনে তাড়া রয়েছে, মা ঠাকরুনের ওখানে যেতে হবে—দুপুর না হতেই গহর আলি ক্ষেত থেকে ফিরে এল। খাওয়া-দাওয়া সেরে পরীর হাত ধরে বলল, চল্—

চল্ বললেই অমনি যাওয়া যায় বুঝি! পরীর এখনো কত কি বাকি! কাঁসার মল সে তেঁতুল দিয়ে মাজতে বসল, কপালে কাচপোকার টিপ পরল, বিয়ের ঢাকাই শাড়িখানা ফেরতা দিয়ে পরে ঝুমঝুম করে সে আ'ল বেয়ে গহরের পিছনে পিছনে চলল।

মাগো!

গহর? বস বাবা, আসছি এক্ষুনি।

বয়স হয়েছে, কিন্তু মা দুপুরে ঘুমোন না। কাঁথার ডালা নিয়ে বসেছিলেন, স্থঁচ-সুতো সাবধান করে রেখে তিনি বাইরে এলেন। পরীকে দেখেই তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

ও কি, ও কি! গহর বাধা দিয়ে উঠল, ও কি করছ মা?

বিস্মিত হয়ে মা প্রশ্ন করলেন, কি বলছিস গহর? এ আমার মা লক্ষ্মী নয়?

হ্যাঁ মা, এদ্দিন ছোট ছিল—আজ দিন কুড়িক এরে বাড়ি নিয়ে এসেছি।

মা চটে উঠলেন, তবে যে তুই হা হা করে উঠলি? আমার মাকে একটু আদর করছিলাম, তাতে তোর হিংসে হচ্ছিল বুঝি! দেখ্ দিকি, ছেলে মানুষ—কি রকম জড়সড় হয়ে গেছে।

গহর আলি অপ্রতিভ হয়ে বলতে লাগল, মাগো, সে কথা নয়। আমরা হলাম মোছলমান, তোমরা বামুন। এই অবেলায় ছোঁয়াছুয়ি হলে—

মা বললেন, ওঃ! গহরের আমার বুদ্ধি বিবেচনা হয়েছে, এ খবর তো জানতাম না! হাঁ রে, বামুন-মোছলমান তোরা কবে থেকে হলি? তুই আর বীরু পাঠশালা থেকে কালি-ঝুলি মেখে আসতিস, মুড়ির মোয়া কাড়াকাড়ি করে খেতিস, তখন তো এ সব ছিল না। মনে পড়ে, পেয়ারাগাছ থেকে পড়ে পা ভেঙে কাঁদতে কাঁদতে এলি—তার উপর আমি আবার আচ্ছা করে কান টেনে দিলাম। এখন হলে বোধ হয়

বলতিস—দেখ, মোছলমানের উপর হিন্দুর অত্যাচারটা দেখ একবার!

এ কথার জবাবে গহর আলি একটুখানি মুখ টিপে হাসে। মনে মনে বলে, খুব মনে পড়ে মা, কান টেনে দিয়ে তারপর সমস্ত দুপুর কোলের মধ্যে রেখে হাঁটুতে মলম মালিশ করলে। সে সব দিন কি আর আসবে?

মা বলতে লাগলেন, আমার ছেলে যে এত দুঃখ সইছে, সে বুঝি মোছলমান বাদ দিয়ে কেবল বামুন-জাতের জন্যে?

এ কথায় গহরের চোখে জল এসে গেল। বলল, মাগো, দোষ হয়েছে—তোমার বীরুর মতো তো বিদ্যে শিখি নি, কথাবার্তা বলতে জানি নে। রাজপুত্র হয়ে কেন যে ওরা বনে যায়, আমি বুঝতে পারি নে। কিন্তু মা, এটা জানি—যে মাটির জন্যে ওরা মরছে সে হিন্দুর মাটি, মোছলমানেরও মাটি। ওরা মাটি দেখে, জাত দেখে না। তারপর জিজ্ঞাসা করল, বীরুভাই আসবে কবে মা?

মা বললেন, আসবে তো ভাদ্র মাসে। এসে আবার ক'দিন থাকে, তাই দেখ।

মা কিছুতে ছাড়লেন না, বললেন, গহর বাবা, ঐ দাওয়ার উপর পাতা পেতে তোরা দুই ভাই খেতিস, মনে আছে? কতদিন কেউ মা বলে ডাকে না, ছেলের পাতে ভাত বেড়ে কতদিন দিই নি। আজকে তোদের ছাড়ছি না, খেয়ে যেতে হবে। তোর বীরু-ভাই নেই, তেমনই আমার মা-লক্ষ্মী রয়েছে। দুটো পাতাই পাতব আজও।

সন্ধ্যা গড়িয়ে গেল, চাঁদ উঠল। মা নিজের হাতে কি কি রান্না করলেন, দু-জনের জায়গা পাশাপাশি করে দিলেন। পরীর তো পুরুষ মানুষের সামনে খাওয়া অভ্যাস নেই, আড়ষ্ট হয়ে হাত কোলে করে বসে থাকে। মা বললেন, ও মেয়ে, খাচ্ছিস না কেন? রান্না খারাপ হয়েছে বুঝি! বুড়ো মানুষ—তোদের মতো কি পারি?

গহর তাড়া দিয়ে ওঠে, কেন খাচ্ছিস না? এ জিনিস বেশি জুটবে না—খেয়ে নে। যতদিন বাঁচবি, মুখে স্বাদ লেগে থাকবে।

আরও জ্যোৎস্না ফুটেছে, দিনের মতো স্বচ্ছ জ্যোৎস্না। মা রাঙচিত্তের বেড়া অবধি এগিয়ে দিয়ে গেলেন। এবার আ'লপথে নয়,

বাঁধের রাস্তা দিয়ে চলেছে। ওদিক থেকে একখানা গরুর গাড়ি আসছে, তারই কাঁচকোঁচ আওয়াজ হচ্ছিল। খানিক পথ গিয়ে গহর কথা বলে উঠল, মা দেখলি বউ ?

পরী জবাব দিল না। গহর বলতে লাগল, শোন্ আমার বীরু-ভাইয়ের গল্প। সভা ভেঙে সবাই তো হুড়মুড় করে পালাল। লাঠির পরে লাঠি পড়ছে। তেঁতুলগাছের উপর থেকে আমি চেঁচাচ্ছি, পালা ভাই, পালা। সে নড়ে না, চেঁচিয়ে বলে বন্দে মাতরম্। তারপর থানার মধ্যে অজ্ঞান হয়ে পড়ল।

আতকণ্ঠে পরী বলে উঠল, আহা!

গহর উত্তেজিত হয়ে ওঠে। বলে আমরাই ব্যথা পাই, তার ওসব বালাই নেই। বুকের মধ্যে অত জোর কোত্থেকে আসে জানিস বউ? ঐ মা রয়েছে বলে। আমার মা যদি ছোট বয়সে না মরে যেত, আমি কি সেদিন ঐ রকম পালাতাম? বীরু-ভাইয়ের পাশে দাঁড়িয়ে আমিও বলতাম - বন্দে মাতরম।

তারপর গহর তার জান সেই একটা মাত্র কলি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বারম্বার গাইতে লাগল---

সুজলাং সুফলাং বন্দে মাতরম্---

পরীরও বুক ভরে উঠল। গানের মধ্যে কেবলই তার মায়ের কথা মনে হচ্ছে---কাল রাতে গহর যে মানে করেছিল, সে তার মনে ধরে না। স্নিগ্ধ সুগৌর একখানি মুখ, পরনে সাদা থান---নিরলঙ্কার, দু-চারটে চুল পেকেছে---মার তাতে অপরূপ শ্রী খুলেছে, বন্দে মাতরম!

গরুর গাড়ি নিকটে এসে পড়ল। গাড়ি থেকে হাঁক এল, কেই গো, যায় ডাইনে সেই---

গলা শুনে গহর চিনতে পারল। বলে, মুন্সিসাহেব নাকি? নবাবপুরের মক্তবে যাওয়া হচ্ছে?

মুন্সিসাহেবও চিনলেন। গীত গাচ্ছ গহর মিঞা? তা একটা ভাল গীত গাইলে হয়---

গহর আলি লজ্জিত হয়ে বলল, গলাটা সুবিধের নয়। তা এই রকম মাঠে-ঘাটে গাই, মানুষ-জন দেখলে চুপ করি।

মুন্সিসাহেব বললেন, গলার কথা হচ্ছে না—ঐ গীতটাই যে ভাল নয়। ও হিঁদুর গান—মোছলমানের ছেলে গাইলে যে ধর্মে পতিত হবে।

গহর আলি অবাক হয়ে বলে, সে কি কথা মুন্সিসাহেব? মা কি কেবল হিঁদুর—মোছলমানের মা নেই?

মুন্সিসাহেব শ্লেষের হাসি হাসতে হাসতে বললেন, কোন মা সেটা ঠাহর করে দেখেছ মিঞা? ও যে হিঁদুর ঠাকুরের গান, দশহাতওয়ালা—

গাড়ি এগিয়ে গেল। গহর স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়ায়। বলে কি! বিশ্বাসী সরল মানুষ—যত কাজকর্মে থাকুক, পাঁচ বার নমাজ করতে কোন দিন ভুল হয় না তার। ধর্মের হানি হবে, তার চেয়ে জীবন যাওয়াই যে ভাল!

পরী তার হাত ধরে টানে। বলে, দুত্তোর, বাজে কথা!

সর্বনেশে কথা রে বউ। তারপর গহর চিৎকার করে বলে উঠল, মুন্সিসাহেব, আমি নবাবপুরে যাব একদিন। সব কথা আমায় ভাল করে বুঝিয়ে দিতে হবে।

এরই প্রায় দিন-কুড়ি পরে, একদিন গঙ্গাচরণ সর্দার বেড়াতে এল। গঙ্গার বাড়ি খালের ওপার, বকডোবার আবাদে। ওরা এক গানের দল করেছে; গহর তাতে ঢোলক বাজাতে পারবে কিনা, জানতে এসেছে। গহর মহা উৎসাহে বলে, পারব—খুব পারব। কিন্তু ভাই, এই ক'টা মাস। বৃষ্টির ফোঁটা পড়লে আর হবে না, লাঙল নিয়ে ভুঁয়ে নামতে হবে।

বকডোবার আবাদ জুড়ে এখন নোনা জলের তরঙ্গ খেলে। আগে ধান হত, এখন জলকর হয়েছে—দিন-ভোর মাছ ধরা হয়, শেষ রাতে ডিঙা বোঝাই হয়ে শহরে চালান যায়।

গঙ্গাচরণ এক নূতন খবর দিল। বলে, শোন নি বুঝি? সে গুড়ে বালি! লাঙল বেচে এবার খেপলা জাল কেনো গে যাও। তোমাদের বিলও ভাসিয়ে দেবে, শুনলাম। নীলমণি সাঁপুই সতর হাজার ডাক দিয়েছে। দেবে না? জলকরে লাভ কত!

এত বড় ভয়ানক কথাটা সহজে বিশ্বাস হয় না। গহর অর্থহীন ভাবে খানিক তাকিয়ে থাকে।

বল কি!

গঙ্গাচরণ হি-হি করে হাসতে হাসতে বলে, তাতে ঘাবড়াবার কি আছে মিঞা? সে তো ভাল কথা। রোদে পুড়ে সমস্ত দিন লাঙল ঠেলে বেড়াতে হবে না—রাত্তিরবেলা ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায় কাজ। কপালে লেগে গেল তো এক দণ্ডের মধ্যে পাঁচ সিকে দেড় টাকা রোজগার। তারপর দিনমানটা ঘুমিয়ে তাড়ি খেয়ে যে রকম খুশি কাটিয়ে দাও।

গহর ব্যাকুলকণ্ঠে বলে, ছিলাম চাষা, শেষকালে কি চোর হতে হবে?

গঙ্গা বলে, কোন্ সুমুন্দি নয় শুনি? বলি, পেটে খেতে হবে তো। আর চোরই বল, যা-ই বল—আগের চেয়ে ভাল আছি ভাই। এখন পানে তাম্বুলবিহার, সকালবেলা মিছরির জল—নানা রকম বেয়াড়া অভ্যাস হয়ে গেছে।

চেহারা দেখেই সুখের অবস্থা অনুমান করা যায় বটে। এদের বাপ-দাদা বকডোবার আবাদে একদিন সোনা ফলিয়ে গেছে, এদের কাজ গভীর রাত্রে। চারিদিক একেবারে নিশুতি হয়ে যায়, দূরের আলায় টিমটিম করে লণ্ঠন জ্বলে, সেই সময়ে আবছা আঁধারে বাগদি-পাড়া থেকে একের পর এক প্রেতের মতো সব বেরিয়ে আসে। বাদার খোলে ঝুপঝাপ শব্দে জাল পড়ে, হয়তো আলা থেকে কোন পাহারাদার শুয়ে শুয়ে হাঁক দেয়, হোই গো—ও—ও—। ছুটাছুটি করে এরা আবার পাড়ার গহ্বরে ঢুকে পড়ে। আর কোন সাড়া শব্দ নেই।

গঙ্গাচরণের খবর মিথ্যা নয়, একদিন সকল প্রজার কাছারিতে ডাক পড়ল।

নায়েব বললেন, ভুঁয়ে কেউ লাঙল দিও না, বাছারা। নীলমণি সাঁপুইয়ের সঙ্গে বন্দোবস্ত হয়ে গেছে।

বিশ-কুড়ি জন যেন হাহাকার করে উঠল, আমরা খাব কি হুজুর?

নায়েব বললেন, সে কথা বললে জমিদার শুনবে কেন বাবা? জমি তাঁর—তোমরা বছর বছর কেবল ঠিকা চাষ করে যাও বইতো নয়!

এবারে স্থবিধা হয়ে গেল, সাড়ে সাত হাজার টাকা বেশি মুনাফা—তার উপর টাকাটা একসঙ্গে এসে যাবে, কোন হাঙ্গাম-হুজ্জত নেই।

জমিদার কেবল নিজেরটাই দেখলেন?

নায়েব শেষ করতে দিলেন না। বলতে লাগলেন, কেন, শুধু নিজেরটা দেখবেন কেন? তোমার ঐ নীলমণিও লাল হয়ে যাবে, এই বলে দিলাম। শহর যে রকম জেঁকে উঠছে, মাছের দরকার খুব—মাছের সেখানে সোনার দাম।

শহরের লোকে কি কেবল মাছই খায়? ভাত খায় না? ধান-চালের তাদের দরকার নেই?

নায়েব বললেন, ধান তো কাঁহা কাঁহা মুল্লুক থেকে আসতে পারে। মাছ যে পচে যায়—

গহর আলি বলল, শহরের লোকের টাকা আছে, সোনার দামেও তারা কিনে খেতে পারে। আমরা যে ক্ষেতের তলানি খেয়ে বাঁচি। নায়েব মশায়, তোমরা নিজের আর নীলমণি সাঁপুয়ের দিকটাই দেখলে, মাট ঘর চাষার দিকে চেয়ে দেখলে না!

খালের মুখের বাঁধ কেটে দিল। টুকরা টুকরা যত আ'ল ছিল, নোনা জলের ঢেউয়ে তাদের আর চিহ্ন রইল না। জ্যৈষ্ঠ মাসে গহরের দক্ষিণ ঘরের কানাচে দিন-রাত জলের ধাক্কা লাগে। বড়-পুকুরের কালো জল এরই মধ্যে বিবর্ণ হয়ে গেছে। আগে পাঁচ-সাত ক্রোশ দূর থেকেও লোকে নৌকা করে কলসি কলসি ভরে নিয়ে যেত, এখন পরীকেই বামুনপাড়া থেকে জল নিয়ে আসতে হয়। সতেজ লাবণ্যভরা ধানগাছে যে সব জায়গা আঁটা থাকত, মাছের নৌকা সেখানে খটাখট বৈঠা চালিয়ে বেড়ায়। গহর আলি বিলের ধারে বসে বসে দেখে, যখন-তখন এসে চুপটি করে বসে থাকে।

পরী হাত দু'খানি ধরে বলে, তুমি অত কি ভাব বল তো?

যা ভাবি, সে মুখে বলবার নয় বউ। বলতে বলতে গহর আলি গর্জন করে ওঠে, জানিস, তুই তখন আসিস নি,—এখানে পোড়ো জমি ছিল। নিজের হাতে কারকিত করেছি, জঙ্গল কেটেছি, ভুঁয়ে মাটি

তুলেছি। আজ এক হুকুমে সেখানে নোনা জলের বন্যা বইয়ে দিল। এ সব কি চোখ মেলে দেখা যায়?

পরী বলল, দেখো না, চল যাই এখান থেকে। যদি আবার কখনও এসে পড়, চোখ বুজে থেকো।

ইচ্ছে করে কি বউ, ওদের একটুখানি দেখিয়ে দিতে পারতাম!

বউ তাড়াতাড়ি গহরের মুখে হাত চাপা দিল। একটুখানি হেসে গহর বলল, দেখিস কি! আর ভাত জুটবে না, নোনা জল খেয়ে থাকতে হবে। আর এমনই কপাল, বাঁক-ভাইও এ সময়টা বাইরে নেই। এত লোকের দুঃখ কখনও সে চুপ করে সইত না, উপায় একটা-কিছু করতই।

যাই হোক, আপাতত অবশ্য কোন চিন্তা নেই—আলা বাঁধা হচ্ছে। এই উঁচু টিলাটা ছিল গহরের খামার বাড়ি, এখানে সে ধান তুলত। এখন সমান চৌরস করে টোঙের মতো বড় বড় খড়ের ঘর উঠছে। মাটি কেটে চারি পাশে উঁচু বাঁধ দেওয়া হচ্ছে, সকাল সন্ধ্যা চাষীরা সব কোদাল নিয়ে বেরোয়। মাস দুই ধরে এই চলবে, সে ক'টা দিন এক রকম নিশ্চিন্ত।

সন্ধ্যার সময় মাটির মাপ হয়। কারকুন গোলাম হোসেন মাপকাঠি নিয়ে মাপ করে, পূর্ণ গায়েন থলি ভর্তি পয়সা-সিকি দুয়ানি নিয়ে বসে।

গোলাম হোসেন হাঁক দেয়, তিন—তিরিশ—

পূর্ণ বলে, তেরো পয়সা। নাও মিঞা। গুণে গেঁথে নাও।

গোলাম হাঁকে, চার—পুরো।

পূর্ণর সঙ্গে সঙ্গে হিসাব, সাড়ে চৌদ্দ পয়সা, নব—

একুনে কার কত হল, রাস্তায় এসে সকলে হিসাব করতে করতে চলে। গহর খালি এত খাটে, তার চার কি পাঁচ আনার বেশি কোন দিন হয় না। অথচ আর সকলের কারও হয়েছে দশ আনা, কারও বারো আনা—এই রকম।

একদিন সে গোলামকে কথাটা বলল। গোলাম হি-হি করে হাসে। বলে, তুই বড্ড ন্যাকা গহর মিঞা। পয়সা কামাই করতে হলে ইয়ের

বন্দোবস্ত করতে হয়। জুডন মাঝি কত পার্বণি দেয়, জানিস? সিকিতে আনা হিসাবে।

গহর বলে, বন্দোবস্ত হয় নি বলে আজ তিন হপ্তা ধরে এই রকম ফাঁকি দিয়ে আসছিস? মাটি মাপ্—আবার দেখব।

গোলাম হাসতে হাসতে বলে, খুব—খুব। একবার কেন—হাজার বার। মনে সন্দো রাখিস নে।

সে মাপ করতে লাগল, এই এক কাঠিতে হল ছ ফুট, আর এক কাঠি হল বারো, আর এক কাঠি পনর, আর এক কাঠি—

মাপকাঠি গোলামের হাত থেকে কেড়ে নিয়ে গহর মারল তার চোয়ালে এক বাড়ি। আর্তনাদ করে গোলাম মাটিতে বসে পড়ল। বিশ-পঁচিশ জন আলার দিক থেকে ছুটে এল, গহরকে এসে চেপে ধরল। কেউ ধরল হাত, কেউ কান, কেউ চুলের মুঠি···

প্রহরখানেক রাত্রে গহর ক্লান্ত দেহে বাড়ি এল। পরী কাঁদো-কাঁদো গলায় জিজ্ঞাসা করল, কি হয়েছে?

কিছু না, তুই তামাক সাজ।

পরী বলল, হুঁ, সাজতে যাচ্ছি—বয়ে গেছে আমার! কাঁদতে কাঁদতে সে তেলের বাটি নিয়ে এল। পিঠের উপর মুখের উপর দড়ির মতো ফুলে ফুলে উঠেছে, পরী তেল মালিশ করতে লাগল। এক পশলা বৃষ্টির মতো ঝরঝর করে গহরের চোখ দিয়ে হঠাৎ জল নেমে এল। কি মনে হল—চোখের জলের মধ্যে অতি অস্পষ্ট কণ্ঠে বারম্বার সে বলতে লাগল, মা, মা, বন্দে মাতরম্—

গভীর রাতে গহর টিপিটিপি বেরুচ্ছে। পরীর সজাগ ঘুম, সভয়ে জিজ্ঞাসা করল, কোথায় যাও গো?

গহর ফিসফিস করে বলে—বকডোবার আবাদে, একটা খেপলা জালের খোঁজে গো। আজ ওরা পিঠেই দিয়েছে, পেটের তো কিছু দেয় নি। কাল যে নিরম্বু উপোস, তা ঠাহর করছিস?

বাগদিপাড়ায় গিয়ে গহর প্রথমেই গঙ্গাচরণের দাওয়ায় উঠল।

গঙ্গাচরণ শুনে লাফিয়ে উঠল, বল কি মিঞা? আট ঝুড়ি মাছ মজুত রয়েছে, আর বেটারা পড়ে পড়ে ঘুমুচ্ছে? পেটে জুত থাকলে

ঘুম আসে ঐ রকম। চল—চল, খাসা হবে—আমাদের বাত্রাদলের সাজের টাকাটা হয়ে যাবে এইবার।

খাল পেরিয়ে ছায়ামূর্তিরা চলেছে টিপিটিপি। অন্ধকার রাত্রি, কোন দিকে কেউ নেই। আলার উপর তীব্র একটা আলো জ্বলছে, অনেক দূর থেকে দেখা যায়। বাগদিরা বিলের খোলে নেমে দাঁড়াল। মাছের ঝুড়ি রয়েছে বটে! কিন্তু সকলেই যে ঘুমিয়ে আছে তা নয়, ঝুড়িগুলোর কাছে দাঁড়িয়ে জন দুই লোক পাহারা দিচ্ছে।

গহর ফিসফিস করে বলল, দেশলাই আছে রে?

গঙ্গা বলল, উঁহু, এখন কি বিড়ি ধরাবার সময়?

গহর বলল, বিড়ি নয় রে, আলায় আগুন ধরালে কেমন হয়? ঐ জায়গাটায় আমি ধান তুলতাম, এখন ওরা ঘর তুলেছে।

যুক্তিটা সকলে অনুমোদন করল। সবাই আগুন নেভাতে ব্যস্ত থাকবে, মাছ নিয়ে সেই ফাঁকে সরে পড়বার সুবিধা হবে।

দাউ-দাউ করে আলা জ্বলে উঠল। ঐ অত রাত্রে বিলের মধ্যে তখনও মাছ ধরা হচ্ছিল। আগুন দেখে আর চিৎকার শুনে যে যেখানে পারল, নৌকা বেয়ে বাঁধ ধরে ছুটল। নূতন জলকর হয়েছে, চাষীরা সব ক্ষেপে আছে, কখন কি করে বসে বলা যায় না—জেলেদের সকলের সঙ্গে তাই সড়কি রাখবার হুকুম আছে। সকালবেলা শোনা গেল, আলায় মাছ লুঠ করতে এসেছিল, সুবিধা করতে পারে নি, তিন চার জন ধরা পড়েছে—আর তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি আহত হয়েছে গহর মিঞা।

সেই রাত্রেই গহরকে শহরের হাসপাতালে পাঠান হল। সেখান থেকে আদালতে। একদিন হাজতের মধ্যে চুপিচুপি সে পরীকে বলল, তোর জন্য ভাবি নে বউ—ইচ্ছে হয় বাপের বাড়ি যাস, না হয় মাঠাকরুনের ওখানে গিয়ে থাকিস। বীরু-ভাই জেল থেকে বেরিয়ে আসছে, তবে আর কি। কিন্তু আমার দুঃখ, সমস্ত কথা শুনে ভাই আমায় বলবে কি। চোর ডাকাতকে ওরা ঘেন্না করে। ওরা ফাটকে যায় ফুলের মালা পরে, আর আমি চললাম ডাকাতি করে। এখন সেখানে দেখা না হলে বাঁচি। কি করে তার মুখের দিকে তাকাব।

গহর আলির দু-বছর জেল হ'য়ে গেল।

বছর-দুই পরে এক সকালে বীরনারায়ণ জেলের গেটের ধারে দাঁড়িয়ে আছে। গহর বেরিয়ে এল। বীরু বলে, আমায় চিনতে পার গহর-ভাই?

পারি বই কি ভাই! এত বড় হয়েও আমাদের সকলের জন্য তোমার কত দুঃখ! চিনব না? বন্দে মাতরম্—

বীরু প্রতিধ্বনি করল, বন্দে মাতরম্। আরও জন-কয়েক লোক সেখানে ছিল, নানা দরকারে তারা জেলের গেটে এসে দাঁড়িয়েছে। তারাও হেঁকে উঠল, বন্দে মাতরম্।

রাস্তায় লোক দাঁড়িয়ে যায়। একজন বলে, কোন্ স্বদেশি বাবু বেরুল বুঝি? থাম, একটুখানি দেখে যাই।

তাদেরই পাশ দিয়ে গহরের হাত ধরে বীরনারায়ণ গরুর গাড়ির দিকে যাচ্ছিল। বলল, হ্যাঁ ভাই, বড় স্বদেশি আমাদের গহর আলি। কিন্তু বাবু নয়—মজুর। দু-বছর পরে এই বেরুচ্ছে। বল ভাই, বন্দে মাতরম্।

গরুর গাড়ি ক্যাঁচকোঁচ করে অসমান মেঠো-পথে চলেছে। গহর ছলছল চোখে বলল, মিছে কথা কেন বললে বীরু-ভাই?

বীরু বলল, কোনটা মিছে?

এই যেমন আমি স্বদেশি করে ফাটকে গিয়েছি। আমি তো ভাই, আলা লুঠ করেছিলাম।

বীরনারায়ণ বলল, ও তো একটা ছুতো। আসলে, তোমার প্রাণ কাঁদছিল। সুজলা সুফলা আমাদের গাঁয়ের ঐ দশা তুমি দেখতে পারছিলে না। বড় পুকুরে নোনা জল উঠেছে, ধানবন খাঁ খাঁ করছে, এ কি তোমার সহ্য হয়? আলা লুঠ করে যা হোক করে তোমার প্রাণ কোথাও আড়ালে গিয়ে জিরোতে চাচ্ছিল, আমি কি বুঝি নে ভাই?

একটুখানি চুপ করে থেকে গহর বলল, কিন্তু এ তো একেবারে আমাদের নিজেদের ব্যাপার। এতে কি স্বদেশি হল?

বীরু বলল, স্বদেশ কি দেশের মানুষকে বাদ দিয়ে? দেশের মানুষ

দাবি বুঝে নিতে পারে না বলেই তো দু-চার জনের কাঁধে বোঝাটা বেশি হয়ে চাপে।

পাশাপাশি তারা চুপ করে রইল। গাড়ি খালের ধারে ধারে চলেছে। গহর হঠাৎ বীরুর হাত দু'খানা জড়িয়ে ধরল। বলল, গাঁয়ে তো ফিরছি, একটা কথা বল ভাই—এদ্দিনে আপদ চুকে গেছে তো? নীলমণি সাঁপুই বিদায় হয়েছে? আবার ধান হচ্ছে? ছেলেমেয়েরা বড়পুকুরে চান করতে আসে তেমনি করে? আমার আম চারায় এবার আম হয়েছিল? তুমি যখন ফিরে এসেছ, সমস্ত আবার ঠিক হয়ে গেছে—নয়?

বীরনারায়ণ ম্লানদৃষ্টিতে গহরের চোখের দিকে এক মুহূর্ত চেয়ে রইল। বলল, হয়ে গেছে বই কি ভাই। তুমি ভেব না, সব ঠিক আছে।

গরুর গাড়ি বাড়ির সামনে আসতেই অনেকে এসে দাঁড়াল। ভিড় সরিয়ে বীরু হাত ধরে তাকে দাওয়ায় নিয়ে বসাল। গহর ফিসফিস করে জিজ্ঞাসা করে, বীরু ভাই, মা এসেছেন তো? তারপর জোর গলায় হাঁক দেয়, ও মা, মাগো, দুটো মুড়ি দেবে না? কতদিন খাই নি তোমার হাতে। আমার বীরু ভাই আছে—দু জনে কাড়াকাড়ি করে খাব।

মৃদু পায়ে পরী এসে দাঁড়াল। যত পালিয়ে আসুক, গহর তা টের পায়। হাসতে হাসতে বলল, কেমন আছিস বউ?

পরীর ঠোঁট কাঁপতে লাগল। কথা বলতে পারে না—ভয় হয়, বুঝি বা কেঁদে ফেলবে। তারপর বলল, তুমি কেমন ছিলে গো?

ভাল। তবে কষ্ট হত খুব—চারিদিকে ইট আর ইট। আহা হা, আজ চোখ জুড়োচ্ছে। আমরা হলাম চাষার ছেলে, ধানবন না দেখলে বাঁচি?

পরী চমকে উঠল। ও কি পাগল হয়ে গেছে? বলল, কি দেখছ?

ধানবন। কি রকম মিশকালো হয়েছে, দেখ। কত গাছপালা! আমার আমচারাগুলো কত বড় হয়েছে রে? এবার আম হয়েছিল?

পরী ভাল করে স্বামীর মুখের দিকে তাকাল। অর্থহীন লক্ষ্যহীন দৃষ্টি। তার ডুকরে কাঁদতে ইচ্ছা হল। হায় রে, নোনা জলের তুফান লেগে গহরের নিজের হাতে পোতা আমচারাগুলো যে কোন কালে মরে গেছে!

গহর বলল, কি ভাবিস রে বউ? আমার কথার জবাব দিলি নে?

পরী ধরা গলায় বলল, অনেক আম হয়েছিল, আমসত্ত্ব করে রেখেছি—তুমি খেয়ো।

আর, বড়-পুকুরের জল মিঠে হয়েছে তো রে? খেতে নোনা লাগে না? আমার জন্যে এক ঘটি নিয়ে আয় দিকি!

আচ্ছা—বলে বউ ছুটে পালাল।

গহর তখন বলছে, ও বউ, বলি সেই গীতটা মনে আছে—সুজলাং সুফলাং বন্দে মাতরম্? এখন ভাল লাগে? তার মানে বুঝিস?

পরী তখন ও-ঘরের মেজেয় পড়ে ফুলে ফুলে কাঁদছে। মার কাছে গিয়ে বলে, মাগো, ও অন্ধ হয়ে গেছে।

মা বললেন, সে তো অনেক আগেই শুনেছি মা। তাই শুনে বীরু ওকে জেলে দেখতে গিয়েছিল। তুই দুঃখ পাবি বলে তোকে জানায় নি। সেই যে সড়কির খোঁচা লেগেছিল, তারপর ক্রমেই খারাপ হয়ে গেল। কাঁদিস না বেটি, ও এই বাড়ি-ঘরদোর ভালবাসত কি না, তাই তাদের এ দশা ভগবান ওকে আর দেখতে দিলেন না।

বীরু বলল, মা, অন্ধ হয়ে গেছে গহর-ভাই—কিন্তু ও দেখতে পাচ্ছে। ও দেখছে, বড়-পুকুরে কাকের চোখের মতো জল, বিল-ভরা সবুজ ধান, গাছে গাছে ফুল, মানুষের মুখে-চোখে হাসি, সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা আমাদের মা। আমাদের চেয়ে ও ভালই দেখছে। আসতে আসতে গহর গাড়িতে সেই সব কত গল্প করল! মাগো, ভাগ্যবান আমার গহর-ভাই—আমরা সব মরে আছি যে, যদি বেঁচে থাকতাম সবাই ঐ রকম অন্ধ হতে চাইতাম।

বেলা পড়ে এল। কাজকর্মের পর বাড়ি ফিরবার মুখে অনেকে গহরের উঠানে এসে বসেছে। নবাবপুরের মুন্সিসাহেব গহরকে খুব

ভালবাসতেন, খবর পেয়ে তিনিও এসেছেন। আসতেই তর্ক শুরু হয়েছে। তিনি বলছেন, বেশ তো, বন্দে মাতরম্ বললে আমরা যখন চটে যাচ্ছি—জেদাজেদির কি দরকার? আর একটা নতুন কিছু গাইলেই তো হয়। অবশ্য দেবতা-টেবতা সব বাজে—দশভুজাকে কখন সুজলা বলে না, সে সবাই বোঝে। কিন্তু আর কিছু না হোক—এই গান যিনি লিখেছেন, আমাদের জাতকে তিনি গালি দিয়েছেন, এটা তো মানতে হবে।

বীরনারায়ণ উচ্চকণ্ঠে প্রতিবাদ করে উঠল, আমি চ্যালেঞ্জ করছি—বিভিন্ন লেখা থেকে দেখিয়ে দেব, তিনি সাম্প্রদায়িক ছিলেন না—

শান্তকণ্ঠে মা বললেন, সে তর্কের দরকার কি বাবা? আমরা তো কেউ বঙ্কিমের বন্দে মাতরম গাই না।

বঙ্কিমের গান নয়?

মা বলতে লাগলেন, না মুন্সিসাহেব। আনন্দমঠের সন্তানেরা বইয়ের পাতায় আছে, আমার এই সন্তানের রক্তে মাংসে চোখের সামনে বেড়াচ্ছে। এদের গানে ভোলবার জো নেই। এই বন্দে মাতরম্ আমার বীরুর রক্তে রাঙা হয়ে রয়েছে, এই গান আমার অন্ধ গহরের চোখের জলে ভিজে গেছে। সত্যি যদি গানের জন্মগত দোষ কিছু থাকে, চোখের জলে ধুয়ে ধুয়ে তাতে আর এক কণিকাও ময়লা নেই। আর একটা নতুন কিছু গাইবার প্রস্তাব করেছিলেন, তার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করবে কে? রাজি আছেন আপনারা?

গহর রুক্ষকণ্ঠে বলে উঠল, তুমি বলবে বই কি মুন্সিসাহেব। তুমি থাক নবাবপুরে—সেখানে বানবান নোনা জলের তুফান বয় না, চোখ মেলে উঠানের উপর মরা আম চারাও দেখতে হয় না। তোমরা সুখের মানুষ—মাকে চিনবে কি করে? তুমি বাড়ি যাও মুন্সিসাহেব, আমরা এখন বন্দে মাতরম্ গাইব।

সুরহীন কণ্ঠে বন্দে মাতরমের একটি কলি গাইতে গাইতে গহর আলির চোখ ভরে গেল।

মন্বন্তর

পাত্রপক্ষের প্রস্তাব ছিল বোটানিকেল গার্ডেনে। তাতে অমিতার মায়ের ঘোরতর আপত্তি—মাগো, বাইরের কত লোক বেড়িয়ে বেড়াবে, মেয়ে দেখানোর সময় হাঁ করে চেয়ে রইবে, কি বিশ্রী! শেষে ঠিক হল, কোন্নগরের আড়পাড় তাঁদের এক আত্মীয়ের বাগানবাড়ি আছে—সেখানে গেলে কোন পক্ষের অসুবিধা হবে না, সে-ই সবচেয়ে ভাল।

দীঘির বাঁধানো চাতালে বসে আলাপ পরিচয় হচ্ছে। পাত্রের মা অমিতাকে বড় পছন্দ করলেন। তাকে আদর করে কোলের মধ্যে টেনে নিয়ে নিজের হাতে মিষ্টি খাওয়ালেন। ওদিকে ভুবন মুখুজ্জে হিরণকে বেহাই বলে ডাকতে শুরু করেছেন। বলেন, পাকাপাকি হয়ে যাক—আর কি! মেয়ে এ যাবৎ কম দেখি নি ভায়া, কিন্তু আমার চোখে লাগে তো গিন্নি বাতিল করেন, আবার দু জনেরই পছন্দ হয়ে যায় তো কোষ্ঠি মেলে না। কলকাতার শহর তোলপাড় করে বেড়িয়েছি, কিন্তু পাব কোথায় বলুন? আপনি যে মা লক্ষ্মীকে কাশীপুরের তেমহলার ভিতর সেরে রেখে দিয়েছেন।

তাঁরা বিদায় হলেন। বিপিন সরকার এসে অবধি ফাই-ফরমাস খাটছে, এই তৃতীয় দফায় তরিতরকারি সংগ্রহ করে ফিরে এল—ঝুড়িভর্তি পুঁইশাক ও নটের ডাঁটা, ডান হাতে দড়িতে ঝোলান দুটো মিঠেকুমড়ো। বলে, এখানে আর কিছু মিলবে না। বলেন তো ঘড়ি ওয়ালা ঐ সাঁপুইদের বাগানে খোঁজ করি।

প্রভাবতী বলেন, থাকগে—অনেক হয়েছে। নেড়ে চেড়ে দেখে খুশি মুখে তারিপ করতে লাগলেন, বাঃ বাঃ—তোমার পছন্দ আছে সরকার মশাই। কি রকম লকলকে ডগা, কি তেজালো।

বিপিন মহোৎসাহে বলে, শুনলাম মা ঘাটে এক একদিন টাটকা পোনামাছ বিক্রি হয়। গঙ্গার মাছ বড্ড মিষ্টি। মালিটাকে পাঠিয়ে দেব নাকি?

হিরণ বললেন, বিয়ে ঠিক হয়ে গেল বলে বিয়ের বাজারটাও সেরে যাচ্ছ নাকি? গন্ধমাদন যোগাড় করলে, নেবে কি করে? ট্যাক্সিতে যাবে না, ঘোষের গাড়ি ঠিক করতে হবে দেখছি।

না বাবা, নৌকোয় যাব। অমিতা আবদার করে বলে, আবার গাড়িতে? বাপরে বাপ! রাস্তার ধুলোয় ভূত হয়ে গিয়ে তারপর এক প্রহর ধরে সাবান ঘষো। তার কাজ নেই নৌকা ভাড়া কর বাবা। ঝিরঝিরে হাওয়া দিচ্ছে, দুলে দুলে চলবে। চমৎকার!

খুব হাসি, খুব স্ফূর্তি। প্রভাবতী বলেন হাসব না? ছেলে ছিল না, ছেলে আসছে ঘরে। এর মেয়ে বলে [illegible] বড্ড দেমাক। ভাগীদার আসছে, এবারে জারিজুরি ভেঙে যাবে।

অমিতা চুপি চুপি বলে, ভাগ আদায় করতে এলে কুশানের উপর পিন ফুটিয়ে রেখে দেব। খোঁচা খেয়ে পালাবার পথ পাবে না।

মালপত্র নিয়ে বিপিন সরকার এবং দু জন মালি আগে আগে যাচ্ছে, এরা একটু পিছনে। ঘাটের কাছাকাছি এলে দশ বারো জনে ছেঁকে ধরল।

কোথায় যাওয়া হবে কর্তা? এক্ষুনি নৌকো ছাড়ব। ত তুফানা নাও—উড়িয়ে নিয়ে যাবে।

সম্মতির অপেক্ষা রাখল না, যে যা পারল কেড়ে কুড়ে হাঁটতে শুরু করেছে। বিপিন ছুটছে।

ভাল মজা তো—কি মতলব তোদের? দাঁড়া—

ঘাটে পৌঁছে সবাই ডাকছে, আমার এই নৌকো আসুন কর্তা, এই যে—

মৃদু হেসে হিরণ বললেন, এই আমার মেয়ে, এই পরিবার, ইনি সরকার মশাই আর এই আমি। একটা নৌকোয় যাবার বাসনা ছিল। তা তোমাদের খাতিরে চারজনের না হয় চারটে নৌকোই করলাম। বিশ জনের মন রাখব কি করে বাছা?

নিজেদের মধ্যে তখন তুমুল বচসা বেধে গেল, সর্বপ্রথম কে কোন জিনিস টেনে নিতে পেরেছে। মীমাংসা হয় না, মারামারির যোগাড়। মহানন্দে এঁরা কৌতুক উপভোগ করছেন।

দক্ষিণে আঘাটার দিকে দেবদারু-ছায়ায় এক বুড়ো ডিঙি বেঁধে আপন মনে তামাক খাচ্ছিল। হিরণ এগিয়ে তার কাছে গিয়ে বলেন, ভাড়ায় যাবে না?

কেন যাব না? চড়নদার পেলেই যাই।

এমন জায়গায় বেঁধে বসে আছ। চড়নদার জানবে কি করে?

কি করি বাবু, বুড়োমানুষ—হাতাহাতি করে পেরে উঠি নে। ওরা এদিকে আসে না, বেশ চুপচাপ থাকা যায়।

ভাড়া জোটে?

বুড়ো বলে, তা জোটে বই কি কখনো কখনো। যে খায় চিনি, তারে জোটান চিন্তামণি। তা হুজুর, আমাদের তো চিনি নয়, দিনান্তে দু-মুঠো ভাত। কষ্টে সৃষ্টে চলে যায় একরকম। চড়নদারে না-ও যদি দেখে, আর একজন তো দেখতে পাচ্ছেন। তিনিই ঠেলেঠুলে নিয়ে আসেন। এই যেমন আপনাদের এনেছেন।

খিল-খিল করে হেসে অমিতা বলে, সে তিনির আজ কাজকর্ম নেই কিনা, তাই প্যাচপেচে কাদার মধ্যে মশার কামড় খেয়ে তোমার খদ্দের ঠেলে আনছেন।

ওদিকে ওদের বিবাদের আস্কারা হচ্ছে না। ঘড়ি দেখে ঘণ্টা-মিনিট ঠিক করে তো জিনিস নেবে নি, গলাবাজি একমাত্র প্রমাণ। আর ঈশ্বর-দত্ত গলা আছে সকলেরই। শেষ পর্যন্ত নাজেহাল হয়ে তারা বলে, বাবু আপনারা বলে দিন কোন নৌকো নেবেন।

প্রভাবতী বুড়োর ডিঙিটা দেখিয়ে দিলেন। ধর্মভীরু মানুষ, কেমন ঠাণ্ডা কথাবার্তা। বুড়োকে তার বড্ড ভাল লেগেছে।

আর মাঝিরা আশ্চর্য হয়ে বলে, ভৈরব তো মোটে যায়ই নি আপনাদের কাছে।

হিরণ বলেন, জ্বালাতন করতে যায় নি। সেইজন্যেই যাব ঐ নৌকোয়। আর তোমাদের নামে যাচ্ছি থানায় রিপোর্ট করতে। প্যাসেঞ্জারের উপর রাহাজানি কর- সঙ্গে মেয়েছেলে রয়েছে, তা বলে সমীহ নেই।

মাঝিরা তবু একবার শেষ চেষ্টা করে দেখে। বাবু ভৈরবের

নৌকোয় দাঁড়ি নেই। রোঠে বেয়ে যেতে যেতে রাত্তির হয়ে যাবে বললাম কিন্তু।

ভৈরব মাঝি এবার চোখ পাকিয়ে ক্রুদ্ধস্বরে বলল, যা-যা-যা—হিরণকে বলে, ন-বছর বয়স থেকে এই কর্ম করছি হুজুর। দাঁড়ি না থাক, পাল খাটিয়ে দেব। পাখনা মেলে উড়ে চলবে নৌকো। ওদের আগে গিয়ে পৌঁছব।

হিরণ বললেন, তাড়াহুড়োর কাজ নেই, তুমি ধীরে-সুস্থে যেও মাঝি। যাব তো এই কুঠিঘাট। কতক্ষণ লাগবে?

ডিঙি ছাড়ল। ভৈরব ডাকে, ওঠ্ দিকিনি কেষ্ট। বেলা পড়ে এল, আর কত ঘুমুবি? পালটা খাটিয়ে দে বাবা

কেষ্ট ওঠে না। হাতের হুঁকাটা দিয়ে ভৈরব একটা খোচা দিল। কেষ্ট তাতে পাশ ফিরে শুল মাত্র।

হিরণ বলেন, ছেলে তোমার ভয়ানক আলসে।

আলসেমি নয় বাবু, ক্ষিধেয় নেতিয়ে পড়েছে। দুপুরে দু-পয়সার মুড়ি খেয়ে আছে। মত দরের চাল···তার উপর চড়নদারের এই অবস্থা। আপনার মতো ভদ্রলোক ক'জন আছে বাবু? ছেলেমানুষ—তা তো বুঝবে না! মুশকিল হয়েছে—কি যে করি ওকে নিয়ে—

প্রভাবতীর মায়ের প্রাণ মোচড় দিয়ে ওঠে। ডাকেন, খোকা—খোকা—ওরে কেষ্ট!

বাগানবাড়িতে সুপ্রচুর খাওয়া-দাওয়া হয়েছে, মিষ্টি-মিঠাই যা বাড়তি ছিল ওখানে কিছু বিলি হয়েছে, আর নিয়ে যাচ্ছেন বাড়িতে চাকর-বাকর কতকগুলো রয়েছে—তাদের জন্য। কেষ্ট ঘুমের মধ্যে চোখ মিটমিট করে দেখছে। প্রভাবতী হাঁড়ির মুখ খুলেছেন—আর কুকুর যেমন আ-তু-উ-উ—বললে ছুটে আসে, তেমনি এসে খাবার এক রকম কেড়ে নিয়ে কেষ্ট গব-গব করে চিবোতে লাগল। বড় ঘরের বউ প্রভাবতী—হাত থেকে এ রকম অসভ্য ভাবে ছিনিয়ে নিল···কিন্তু রাগ না হয়ে তাঁর চোখে জল এসে গেল। বলেন, আমার এই মেয়ের বিয়ের কথাবার্তা হয়ে গেছে, মাঝি। বিয়ের দিন তোমার আর কেষ্টর নেমন্তন্ন রইল। যেও কিন্তু, নিশ্চয় যেও—

খেয়ে দেয়ে কেষ্টর বিষম ফূর্তি লেগে গেল। কথার জাহাজ ছেলেটা, কেবলই বক-বক করছে। অমিতার প্রায় সমবয়সি, তার সঙ্গে ভাব জমে উঠল। কি ওটা মাঝখানে? ভাসছে, দুলছে? কেষ্ট যেন কত মুরুব্বি! বলে, কুমীর-কামট নয়—ওর নাম হল বয়া। বাতাস-পোরা রয়েছে কিনা, কিছুতে ডুববে না।

গল্প জমে উঠল, একবার মাতলার গাঙে বাসন্তীর চরের উপর কেষ্ট একটা কুমীরকে বাছুর ধরতে দেখেছিল। কুমীরটা পড়েছিল, যেন জঙ্গলের একখানা কাঠ ভাসতে ভাসতে এসে লেগেছে। বাছুর ঘাস খেতে খেতে যেই না কাছে এসেছে, অমনি তার পিছনের দুই ঠ্যাং আর দেহের খানিকটা মুখে পুরে গড়াতে গড়াতে কুমীর জলে পড়ল। চাষারা ক্ষেতে কাজ করছিল, হৈ-হৈ করে এল। কিন্তু কোথায় কি— তীরের কাছে জলটা একটু লাল হয়ে উঠল। ব্যস—আর কিছু নেই!

বড় বড় গাঙে রাত দুপুরে এক কাণ্ড হয়ে থাকে, শোনো। জলের ঠিক উপর দিয়ে আলগোছে পা ফেলে জিন-পরীরা ছুটে বেড়ায়। শোঁ-শোঁ করে আওয়াজ আসে, মাঝে মাঝে জল ছিটিয়ে ওঠে। তাই থেকে বোঝা যায় বৃত্তান্ত। একবার এই ডিঙির গায়েই প্রায় ধাক্কা খেয়েছিল আর কি! টেমি নিভিয়ে দিয়ে এরা তখন নিঃসাড় হয়ে বসেছিল। বাপকে সাক্ষি মানে, না বাবা?

ভৈরব হাসিমুখে সায় দেয়। সে বলে, কিন্তু এই মা-গঙ্গার বুকে কোন দিন ওসব আসতে পারে না খুকী দিদি। মাহাত্ম্য আছে কিনা!

অমিতা বলে, দু-ধারে এত ঘর-বাড়ি কল-কারখানা—এলে ওর মধ্যে জাঁতিকলের মতো আটকা পড়ে যাবে, সেই ভয়ে আসে না।

বলে সে হেসে উঠল।

শেষে তাকেও গল্প বলতে হয়, অবোধ বড় বড় চোখ দুটি মেলে কেষ্ট চেয়ে থাকে। বইয়ে পড়া গল্প—এদের মতো স্বচক্ষে দেখা নয়। উঁচু পাঁচিলে ঘেরা চিক-খাটানো সেকেলে বড়-বাড়ির মধ্যে সে মানুষ হয়েছে, আকাশের চাঁদ-সূর্য সেখানে উঁকি দিতে ভরসা পায় না, বাইরের আর কতটুকু দেখেছে। পায়ে হেঁটে নয়, বই পড়তে পড়তে

মনের কল্পনায় অমিতা চলে যায় শিলাসঙ্কুল দুর্গম অরণ্যে কাঠ কাটছে আলিবাবা···দস্যুরা মণিরত্ন নিয়ে এল চিচিং-ফাঁক—গোপন ভাণ্ডারে পৃথিবীর সব ঐশ্বর্য এনে জড় করে রেখেছে, বাপরে বাপ, চোখ ঝলসে যায়। দরজা খোলার মন্ত্র যারা জানে না, বনে জঙ্গলে না খেয়ে গাধা তাড়িয়ে কাঠ কেটে তাদের দিন কাটে। আলিবাবা পথ পেয়ে গেল।

খাসা গল্প, অতি চমৎকার গল্প! কেষ্ট উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। ভৈরবও তারিফ করে। প্রত্যাসন্ন সন্ধ্যার ঝিলিমিলি আলোয় একবার মনে ওঠে, ঐ রকম একটা ভাণ্ডারের পথ পেলে কেষ্টকে সে সোনার থালে পঞ্চাশ ব্যঞ্জন সাজিয়ে খাওয়াত, কত খেতে পারে দেখত। দুধের ছেলে নিয়ে তা হলে কি গাঙে খালে ঘুরে বেড়ায়? ঐ ফর্শা মেয়েটির মতো ঐ রকম রেশমি কাপড় পরিয়ে তাকে ঘরের মধ্যে বসিয়ে রাখত, ঐ রকম প্রাণমাতানো বাস বেরুত কেষ্টর গা দিয়ে। দেখতে তো তাকে মন্দ নয়—যত্ন করতে পারে না বলেই অমন রুক্ষ ছাই-গুড়া চেহারা।

খালের মুখ। বাতাস উঠেছে—গোলমেলে বাতাস। ঢেউ আছাড়ি-পিছাড়ি খাচ্ছে। আজকে ভরা পূর্ণিমা। পালে বাতাস বেধে ডিঙি কাত হয়ে পড়ল, এক ঝলক জলও উঠল।

সামলে খুব সামলে। গাজি বদর বদর!

প্রভাবতী অমিতাকে [illegible] আর্তনাদ করে উঠলেন। বিপিন সাহস দিচ্ছে, ভয় নেই মা, কোন ভয় নেই—

পালের দড়ি খুলে ফেল্ রে কেষ্ট। কড়া হাতে বৈঠা ধরে রয়েছে ভৈরব মাঝি, হাতের শিরা-উপশিরা ফুলে উঠেছে। বলে, ভয় কিসের মা-ঠাকরুন? ঠাণ্ডা হন, নারায়ণের নাম করুন।

কেষ্টর বয়স কম, তাতে কি? এই রকম ক্ষেত্রে কি করতে হয়, সে ভাল করে জানে। তাড়াতাড়ি পালের দড়ি খুলল। গ্রহের ফেরে ঠিক সেই সময়টা জোরে এল বাতাস। ডিঙি বোঁ করে পাক খেয়ে গেল। পালের কোণ বিষম বেগে আলগা হয়ে বেরুল। ছেলেমানুষ সামলাতে পারল না—সেই টানে একেবারে ধনুকের তীরের মতো ছিটকে পড়ল বিশ-পঁচিশ হাত দূরে খরস্রোতের মধ্যে।

ভাসছে আর চেঁচাচ্ছে, বাবা গো!

ভয় কি বাবা, কোন ভয় নেই। পা আর এক হাত দিয়ে ভৈরব বৈঠা ধরে আছে—আর এক হাতে ছেলের দিকে গুণের দড়ি ছুঁড়ে দিচ্ছে। কেষ্ট ধরতে পারে না, ভেসে আরও দূরে চলে যাচ্ছে, এক হাতে দড়ি ঠিক মতো পৌঁছয় না। বিপিন এসে দড়ি ছুঁড়তে লাগল। উপোস করে করে গায়ে সে রকম বল নেই, তার উপর এতক্ষণ জল টেনে নিস্তেজ হয়ে এসেছে—দড়ি গায়ের উপর পড়লেও কেষ্ট ধরতে পারছে না। হিরণ প্রভাবতী অমিতা চেঁচামেচি করছে, কাছাকাছি একটা নৌকা দেখা যায় না। কেষ্ট ডুবছে আর ভাসছে, জলে ভুড়ভুড়ি ছাড়ছে, আবার প্রাণপণ প্রয়াসে মাথা জাগিয়ে ডাকছে, বাবা—বাবা!

ভয় নেই খোকা, ঠাকুর রক্ষে করবেন।

হিরণ অধীর কণ্ঠে বলেন, ঝাঁপ দিয়ে পড় বুড়ো, ওকে টেনে আন—

বোঠে ছাড়ি কি করে বাবু? বড্ড তুফান—সবসুদ্ধ তলিয়ে যাব।···দাঁড় টানতে পারবেন? জোরে—জোর করে—

বিপিন দাঁড়ে বসেছে। অনভ্যস্ত হাত। টানের মুখে বেকায়দায় মচাৎ করে দাঁড় ভেঙে গেল। আর দরকার নেই, ছেলে জলতলে তলিয়ে গেছে। শক্ত মুঠোয় বৈঠা ধরে ভৈরব পাথরের মতো বসে, যেন তার সম্বিৎ নেই। নিষ্পলক সে চেয়ে আছে আবর্তিত জলধারার দিকে, যেখানে বাবা—বলে ডাকতে ডাকতে অসহায় ছেলে অদৃশ্য হয়ে গেল।

পাকা মাঝি ভৈরব—তার হাতে কোনদিন নৌকা বানচাল হয় নি, আজও হল না। আরও নৌকা এসে পড়ল। অনেক গণ্ডগোল ও হৈ-চৈর পর তারা ঘাটে এসে পৌঁছল, তখন রাত্রি গভীর। ডিঙি বেঁধে ভাঁটা-সরে-যাওয়া কাদার উপরেই ভৈরব বসে পড়ল। এতক্ষণে হু-হু করে চোখে জল নেমে এল। দশ টাকার দু-খানা নোট প্রভাবতী তার হাতে গুঁজে দিয়ে একটা ভাড়াটে গাড়িতে তাঁরা উঠে বসলেন।

যে শোনে, সেই ধন্য-ধন্য করে। ছোটলোক হলে কি হয়, এমন কর্তব্যপরায়ণ বড়দের মধ্যেও মেলে না। মাঝিমাল্লা মানুষ—সাঁতার কেটে ছেলেটাকে নিশ্চয় বাঁচাতে পারত, কেবল এদের মুখ চেয়ে তা করল না।

ভৈরব মনে মনে ভাবে, আপনার জনদের মধ্যে বলেছেও এ কথা—কষ্ট দেখে মা-গঙ্গা তার ছেলেকে কোলে তুলে নিয়েছেন। পেট ভরে খেতে দিতে পারত না, খাওয়া নিয়ে কত বকাবকি মারধোর। আর চালের দর দিন দিন যা হচ্ছে, এর পর কি ঘটবে বলা যায় না। তা এখন সমস্তই চুকে গেল, ভাবনার কোন-কিছু থাকল না আর।

আর সে হিরণদেবও খুব গুণগান করে। কুড়ি কুড়িটা টাকা দিয়ে গেল—আহা, ভাল হোক ওদের। অমন মন যাদের, তাদের ভাল হবে বই কি। প্রভাবতী বলেছিলেন, টাকা-পয়সায় জীবনের দাম হয় না—আমরা তোমার কেনা হয়ে রইলাম মাঝি। দু-দুখানা নোটেও নাকি দাম শোধ হয় নি। বলে কি ওরা? বড্ড ভাল লোক—তাই অমন করে বলল। এক পয়সা না দিলেও কে কি করতে পারত—আর ওদের কি দোষ? ভৈরব অন্তর দিয়ে আশীর্বাদ করে, নারায়ণ, ভাল কর ওদের।

ক'দিন শুয়ে বসে নানা চিন্তায় এই রকম কাটল। তারপর ঘাটে গিয়ে গলুয়ের উপর সে তার চিরকালের জায়গাটিতে বসে। এই পাঁচ-সাত দিনে ভয়ানক বুড়ো হয়ে পড়েছে হাত আর চলতে চায় না। মাঝ-গঙ্গায় গিয়ে সে উন্মনা হয়ে পড়ে, জলের নিচে কে যেন ডাকছে, বাবা, বাবা। ভয় নেই খোকা, দড়ি ধর্। বৈঠা তাড়াতাড়ি জল থেকে তুলে ধরে, স্রোতের নিচে ছেলের মাথায় মেরে বসবে নাকি? ডিঙি ঘুরে গেল, সওয়ারিরা ভয় পেয়ে গালিগালাজ করে। ভৈরব ভাবে, তাই তো—এ রকম করে কোনদিন পরের ছেলে-মেয়ে ডুবিয়ে মারব নাকি? সে সামাল হয়ে জোরে জোরে বৈঠা চালায়। কিন্তু কতক্ষণ? আবার অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। ভাবে, নৌকা বাওয়া আর হবে না দেখছি। কার জন্যে আর চালাব নৌকা? কুড়ি টাকা নগদ তবিলে রয়েছে, দিব্যি কেটে যাবে। যখন সে মোটে ন বছরের ছেলে তার বাপ বৈঠা ধরতে শিখিয়েছিল, সেই বৈঠা এতকাল পরে ছেড়ে দিতে হল। মাসখানেক পরে সে ডিঙিটাও বিক্রি করল। আর ক'টা দিনই বা। এই ভাঙিয়ে চুকিয়ে চলে যাবে একরকম।

ধান-চালের দর লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। অবিশ্বাস্য ব্যাপার। চোদ্দপুরুষের মধ্যে কেউ কখনো শুনেছ, এক টাকায় এক সের চাল? নারায়ণ, তোমার সংসারে অন্যায় বেড়েছে. তাই একেবারে নিশ্চিহ্ন করে ফেলবে নাকি? রাস্তায় এক মিনিট দাঁড়ানো যায় না, মৃত্যুর ছায়া মুখে নিয়ে বাঁচবার আকাঙ্ক্ষায় শত শত মানুষ ঘিরে ফেলে। রাতে ঘুমুতে পারবে না, হাজার হাজার নরনারী কন্ট্রোলের দোকানে নগদ দামে এক সের চাল কিনবার প্রত্যাশায় রাত্রি জাগছে, আধ হাত বসবার জায়গা নিয়ে তাদের কলহ-মারামারির অন্ত নেই। ভাতের ফেন পোষা-গাইটাকে দিয়েছি—কারা তক্কে তক্কে ছিল, ফেনের হাঁড়ি গরুর মুখ থেকে চুরি করে নিয়ে গেছে। কুকুরের সঙ্গে কাড়াকাড়ি করে মানুষ ডাস্টবিন থেকে উচ্ছিষ্ট খায়। শত সহস্র ধুঁকছে ঘরের কোণে, রাস্তার উপর মরে পড়ে থাকছে। সকালবেলা খবরের কাগজে দেখ, আজকে বিরানব্বুই জন কুড়িয়ে নেওয়া হয়েছে, আজকে একশ একান্ন।

আর দেখ, দেখ—ওদের ঘরে অর্গান বাজছে, কলহাস্যের বিরাম নেই, মোটরের ভিড়ে রাস্তা চলা দায়, সিনেমা-হলে জায়গা পাওয়া যায় না—জিনিসের দাম বাড়ছে তিনগুণ পাঁচগুণ বিশগুণ। অফুরন্ত ওদের নোটের তাড়া, যেন নেশা ধরে গেছে ওদের। কুচ পরোয়া নেই—যে দামে হোক, কুপন যোগাড় কর—আন মোটরের তেল, কেন সোনা, কেন ধানচাল জায়গা-জমি। নারায়ণ, তোমার ধরিত্রীতে একমুঠো অন্ন পড়ে নেই—যেখানে যা ছিল ডাকাতেরা ভাণ্ডারে পুরে ফেলেছে। দরজা খোলার মন্ত্রটি যদি জানা যেত!

অবস্থা দেখে ভুবন মুখুজ্জে অতিমাত্রায় ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। যখন তখন তাগিদ দিচ্ছেন, একটা তারিখ সাব্যস্ত করুন ভায়া। শ্রাবণের মধ্যে হয়ে যাক, নইলে আবার অকাল পড়ে যাবে। যা দিনকাল আসছে, কে আছে কে নেই কিছু বলা যায় না। ছোট্ট মা'টিকে নিয়ে দুটো দিন আমোদ আহ্লাদ করে যাই।

হিরণ ইতস্তত করেন। এই মন্বন্তরের মধ্যে এখন কি বিয়ে

খাওয়ার সময় ? খাবার জিনিসপত্র বাজার থেকে যেন উড়ে গেছে। পোড়াবার কয়লা—সে-ও বাঘের দুধের মতো অমিল। বরঞ্চ অঘ্রাণ কি মাঘমাসের দিকে—

ভুবন প্রবল বেগে ঘাড় নাড়েন। না না-না—অবস্থা তখন আরও খারাপ হবে না, কে বলতে পারে ? আমার কিছু দাবি-দাওয়া নেই মশায়। অসুবিধে হয়, এক ভরিও সোনা দেবেন না—ফুলের গয়না দিয়ে মেয়ে সম্প্রদান করবেন।

ফুলের গয়না দ্বিগুণ দেবেন যেহেতু ও মেয়ের গায়ে ফুলের আরও বাহার খুলে যায়। কিন্তু সোনা জহরতে মুড়ে দিলেও আটকাবে না—সোনার ভরি যদি দু'শ টাকাই হয়, হোক না কেন। অসুবিধা সে দিক দিয়ে হচ্ছে না। সকল, এখন শহরে আলোর কড়াকড়ি—ছাতে উঠানে হোগলা দিতে দেবে না, ত্রিপল দিয়ে ঢাকতে হলেও অনুমতির জন্য হাটাহাঁটি করতে হবে। সাত নয়, পাঁচ নয়, একটি মাত্র মেয়ে—তার বিয়েয় রোশনাই হবে না, বাজি পুড়বে না, জাঁকজমক তেমন যে কিছু করা যাবে তা ও মনে হচ্ছে না—

অবশেষে মুখ বাঁকিয়ে করে ভুবন বললেন, আসল কথা কি এই, না মনে মনে আর কিছু আছে ? খোলসা করে বলুন।

শেষ পর্যন্ত মত দিতে হয়। ছাব্বিশে শ্রাবণ বিয়ে। সর্বাংশে উপযুক্ত পাত্র হাতছাড়া করা চলে না। বিশেষত ওদের যখন এত আগ্রহ।

মন্দিরের সামনে ভৈরব ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। দুপুরবেলা ঠাকুরের ভোগ দিয়ে জন পঁচিশকে এরা প্রসাদ বাঁটোয়ারা করে দেয়। পাকা ভোগ—মিহিচালের সুগন্ধ অন্ন। তারই মতো একজন খুব গোপনে তাকে খবরটা দিয়েছে। বেশি লোক জানাজানি হয় নি, সকালবেলা সকলের আগে এসে দাঁড়িয়েছে, নির্ঘাৎ সে পেয়ে যাবে। কিন্তু যেন তারে তারে খবর হয়ে যায়। এক প্রহর হতে না হতে লোকারণ্য হয়ে গেল। দরজা খুলতেই মারামারি খুনোখুনি ব্যাপার। মানুষ ভাতের জন্য হন্যে হয়ে উঠেছে। মায়ামমতা স্নেহসৌজন্য নেই, ভাত চাই - ভাত। পিছনের ধাক্কা খেয়ে বুড়ো ভৈরব মাটিতে পড়ে গেল,

তাকে পায়ে পিষে হৈ-হৈ করে লোকগুলো ঢুকছে। সেবাইত ঠাকুরের দুই গোঁয়ার-গোবিন্দ ছেলে লাঠি নিয়ে দমাদম পিটছে—বেরো, বেরো—পঁচিশ জন পুরে গেছে।

ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে ভৈরব উঠল। পাঁচ দিন—পুরো পাঁচটা দিন ও রাত্রির মধ্যে মুখে ভাত ওঠে নি। ভাত খাওয়া যেন ভুলে গেছে। একটা পচা তাল জোগাড় করেছিল এক তরকারিওয়ালার কাছ থেকে চেয়ে চিন্তে। এই মাত্র পেটে গেছে। কোথায় যাবে সে? নারায়ণ, তোমার দুয়ারে এসেছিলাম—খেয়ে গেলাম লাঠির বাড়ি। ঢাক-ঢোল বাজিয়ে পুজো হচ্ছে, ওর মধ্যে এদের কথা ঠাকুরের কানে ঢুকবে কি করে? গন্ধপুষ্পে ধূপের ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন করে রেখেছে, ঠাকুর এদের দেখতে পান না। বড়লোকের মন্দিরে ঠাকুর আটকা পড়ে গেছেন।

সন্ধ্যা হয়ে আসে। ভৈরব টলছে, আর চলতে পারে না। কৃপণ নিষ্করুণ পৃথিবী, তবু তার ধুলোয় হাতড়ে হাতড়ে বেড়াচ্ছে। মস্ত বড় এক খাবারের দোকান। ভৈরব ও তার মতো আরও বিস্তর লোক সামনে দাঁড়িয়ে। অজস্র খাবার সাজানো, শুধু একখানা মাত্র কাচের ব্যবধান। যাদের টাকা আছে, ঝনাঝন টাকা ফেলছে, কাচের ভিতর দিয়ে হাত চালিয়ে দিচ্ছে, হাত ভরতি বেরুচ্ছে মনোলোভা রকমারি খাবার। কাচের ভিতর দিয়ে দেখা যাচ্ছে, ওদিকে সারবন্দি ঝকঝকে চেয়ার-টেবিল। বিচিত্রবেশ নরনারী ঢুকছে, প্লেট পড়ছে টেবিলে। আর বাইরে খাদ্য-প্রত্যাশীরা নিশ্বাস নিরুদ্ধ করে অপেক্ষা করছে, ভাগ্যবানেরা খেয়ে-দেয়ে যখন উদ্গার তুলতে তুলতে বেরিয়ে যাবেন যদি ছিটেফোঁটা পড়ে এদিকে। কেউ তাকায় না—গটমট করে চলে যায়, রাস্তার উপরে অপেক্ষমান মোটরগুলা গর্জন করে ওঠে, ভকভক করে পিছনে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে উপহাস করে চলে যায়।...এরা ধুঁকছে, বাতাসে মুখ নাড়ছে, চলে বেড়াচ্ছে যেন কলের পুতুল। সুখাদ্যের কথা ভাবতে ভাবতে দুচোখ নিষ্প্রভ ও হৃদস্পন্দন মৃদুতর হয়ে আসে। ওদিকে—উঃ, খাবারের পাহাড়! নারায়ণ, তোমার

মানুষের এত সঞ্চয়, এত প্রাচুর্য! মাঝখানে একখানি মাত্র কাচ। একটুকরা ইট ছুঁড়ে মারলেই ঝন-ঝন করে কাচ ভেঙে পড়বে—কে রুখবে? গুনতিতে ক'জন ওরা?…ভাঙো তবে ঐ ভঙ্গুর কাচের ব্যবধান—চুরমার করে দাও।… না—না, সে হয় না।

কাচের আড়ালে ঐ জন আষ্টেক লোক যারা দেওয়া-থোওয়া করছে, ভয় তাদের নয়। ধরে নিয়ে যাবে? জেল? সরকার বাহাদুর ঈশ্বরের চেয়ে দয়াবান—জেলের ভিতর এখনো ভাত দিয়ে বাঁচিয়ে রাখে, বাতাস খেয়ে থাকতে হয় না। জেল তো জেল, ফাঁসি হলেই বা দুঃখ কি? তিল তিল করে মরার চেয়ে পলকের মধ্যে সব সাবাড়—সে ভালো, খুব ভালো।

কিন্তু কাচ নয়, কনেস্টবলও নয়—আরও রয়েছে। মাথার উপরে আছেন নারায়ণ, পাপ-পুণ্যের নিক্তি নিয়ে অতি সতর্ক চোখে চেয়ে আছেন। ভয় তাঁকে, ভয় তাঁর রুক্ষ মার্জনাহীন দৃশ্যাতীত দৃষ্টির। যুগ যুগকাল কত চেষ্টা কত পুণ্য কাব্যকথার মধ্য দিয়ে গড়ে তোলা হয়েছে ঈশ্বরের গৌরব। যাঁরা দু-হাতে ঐশ্বর্য উজাড় করে কারুখচিত মন্দির গড়েছেন। এই যেমন আজ ভুপালে ভৈরব গিয়েছিল একটায়। খরচ করে ঠকেন নি, মন্দিরবাসী দেবতা সতর্ক চোখে তাদের বিত্ত পাহারা দিচ্ছেন। আমার মুখে ভাত তুলে দেওয়া ঐ ঈশ্বরের কর্তব্য নয়—তোমার বাড়তি ভাত আমি খেয়ে যদি বাঁচতে চাই, অনির্দেশ্য হুমকি এসে আমার হাত আড়ষ্ট করে দেবে। জয় হোক মহিমময় ঈশ্বরের! সার্থক ঈশ্বরভক্তেরা, যাঁরা খরচপত্র করে আকাশচুম্বী মন্দির গড়ে দিয়েছেন।

কে ও বেরুচ্ছে? বিপিন সরকার না? সে-ই। পিছনে ভারে ভারে দই-রাবড়ি ক্ষীর-সন্দেশ যাচ্ছে। আটজনা বাঁকে করে নিয়ে চলেছে, তারা হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে।

দাঁড়ান ও সরকার মশাই, শুনুন একটা কথা। ছুটতে পারি নে—

বিপিন ভয় পেয়ে যায়, পঙ্গপালের মতো ক্ষুধার্তের দল—ঘিরে ফেলতে কতক্ষণ? সময় বড্ড খারাপ পড়েছে, কিছু বলা যায় না—সোনারুপা নিয়ে বেরুনো যায়, কিন্তু খাদ্য নিয়ে চলা দায় হয়েছে।

ভালয় ভালয় ফটক পার করে জিনিসগুলো ঘরে তুলতে পারলে সে বেঁচে যায়। বিপিন গতিবেগ আরও বাড়িয়ে দিল। ভৈরব ছুটছে আর চেঁচাচ্ছে, আস্তে চলুন সরকার মশাই, শুনুন না—

ভিতরে ঢুকে বিপিন সুস্থির হল। দরোয়ান রঘুনন্দন সিং ঘড়াং করে ফটক বন্ধ করে। লোহার গরাদে দেওয়া—ওদিকটা দেখা যাচ্ছে। উপর থেকে মধুর স্বরে রসুনচৌকি বেজে উঠল, চারিদিক ফল পাতা আর রঙিন কাপড় দিয়ে সাজানো। সেই ফুটফুটে খুকি দিদিমণির বিয়ে তবে আজবে ?

ভৈরব ডাকে, চিনতে পারছেন না সরকার মশাই ? তাকিয়ে দেখুন তো। বাবুর সঙ্গে দেখা করব একটু—

যা যা। বাবুর আর কাজকর্ম নেই কিনা—

বিপিন চলে যায়। ভৈরব আর্ত চিৎকার করে বলে, আমার যে নেমন্তন্ন এখানে। আমি ভিতরে যাব।

মুখ ফিরিয়ে চেয়ে বিপিন হেসে উঠল। নেমন্তন্ন থাকে, বেশ তো—বাড়িতে মোটর যাবে। গাড়ি চড়ে চলে আসিস। এখন ক্ষমা দে বাপু।

বন্দুক কাঁধে তুলে রঘুনন্দন সিং বেরিয়ে আসছে। বর আসবার সময় হয়ে এল, রাস্তা খালি করতে হবে। যারা ভিড় করেছিল, ছুটোছুটি করে পালিয়ে যায়। রঘুনন্দন ভিতরে গেলে ত এক করে আবার এসে জোটে। বিকাল থেকে এই রকম চলেছে।

বাঁ দিক্‌কার গলি দিয়ে ভৈরব ঢুকে পড়ল। যেতে যেতে বাড়িটার পিছন অবধি গেল। দরজা খুঁজছে। গিন্নি নিজে তাকে নিমন্ত্রণ করেছেন—এরা ঢুকতে দিল না—কিন্তু একবার কোন গতিকে তাঁর কাছে পৌঁছতে পারলে হয়। আঃ, কি দরদ—মা বলে সেই দয়াময়ীর পায়ের নিচে মাথা ঠেকাতে ইচ্ছে করে।...দরজা পাওয়া গেল, কিন্তু ভিতর থেকে বন্ধ। ভৈরব বড়-রাস্তা অবধি চলে আসে, আবার যায়। দু-তিনটে দরজা—কোনটা খোলা নেই। অনন্ত অপরিমিত রত্নভাণ্ডার সে চাচ্ছে না, শুধু পেটের খোরাকি। আলিবাবার মতো একটা মন্ত্র কেউ বলে দিত, ঝন-ঝন করে খুলে যেত দরজা!

গন্ধ বেরুচ্ছে, পিছনের রান্নাবাড়িতে কত কি রান্না হচ্ছে! হয়তো ভাত ফুটছে টগবগ করে কতদিন ভাত গলায় ওঠে নি, যুগযুগান্তর বলে মনে হচ্ছে। ভৈরব যেন পাগল হয়ে ওঠে। হঠাৎ এক নজর প্রভাবতীকে দেখতে পেল। কি কাজে বড় ব্যস্ত হয়ে তিনি পিছন-দিক্‌কার বারাণ্ডায় এসেছিলেন। ভৈরব প্রাণপণে ডাকে, মা ঠাকরুন, মা, মাগো—

অত উঁচু অবধি ডাক পৌঁছায় না। প্রভাবতী যেমন এসেছিলেন, তেমনি চলে গেলেন। যেন মত্তহস্তীর বল এলো বুড়ো ভৈরবের অস্থিসার দেহে। কাঠবিড়ালের মতো সে আঁচড়ে দেয়াল বেয়ে ওঠে। ঠাকরুন রয়েছেন ঐখানে কোথাও। নিজের মুখে নিমন্ত্রণ করেছেন, আর কেউ না চিনুক তিনি ঠিক চিনবেন।

ঐ যে—দেখ দেখ, ঐ একটা।

এই মন্বন্তরের মাঝে চোর-ছ্যাঁচোড় ভিখারিরা কৌশলে ঢুকবার চেষ্টা করবে, আগে থেকে আন্দাজ করে চারিদিকে কড়া পাহারা মোতায়েন হয়েছে। ভৈরবের মাথা পাঁচিল ছাড়িয়ে উঠতেই ওদিক থেকে দিল এক লাঠির খোঁচা। আর্তনাদ করে সে মাটিতে পড়ল, উৎসব বাড়ির আনন্দ আয়োজনের মধ্যে সে শব্দ কারও কানে গেল না। রাস্তার উপর কন্ট্রোলের দোকানের পাট এখন চুকে গেছে, ভিড় ছিল না, ক-জনে শুধু কয়লার দাগ কেটে নিজ নিজ জায়গা চিহ্নিত করছিল কাল সকালবেলাকার অনুষ্ঠানের জন্য। তারা ছুটে এল। ওরই মধ্যে একজন ভৈরবকে চিনল, রজনী কয়াল তার নাম। কিছুদিন সে ভৈরবের নৌকায় দাঁড়ির কাজ করেছিল, তখন ভালবাসাবাসিও হয়েছিল খুব।

ধরাধরি করে ভৈরবকে কলের কাছে নিয়ে এল। ভিড় জমেছে। পথ-চলতি মানুষ নানা জনে নানা মন্তব্য করছে। অসৎ কর্মের ফল হাতে হাতে—পাঁচিল টপকে যেমন চুরি করতে গিয়েছিল। সাহসও বলিহারি মশায়, ঐ তো হাড় ক'খানা—সে উঠেছে অত উঁচুতে।

রজনী যথাসাধ্য করছে। জল দিয়ে রক্ত ধুইয়ে দিল, মুখে চোখে জলের ঝাপটা দিচ্ছে। ভৈরব এক-একবার হা করছে। কানের কাছে মুখ নিয়ে উচ্চকণ্ঠে রজনী বলে, ও দাদা তেষ্টা পেয়েছে? জল খাবে?

অর্ধ-অচেতন ভৈরবের মুখ থেকে জড়িত স্বরে বেরিয়ে আসে, উঁহু—ভাত দে, চাট্টি ভাত—

রজনীর চোখে জল এসে যায়। নিতান্ত সরল এই ভালোমানুষটি মরবার আগে একমুঠো ভাত খেতে চায়। কিন্তু এ যে কংসরাজার বন্ধ ফরমাস—চারিদিকে রাস্তার ধুলো-জঞ্জাল, কোথায় পাবে ভাত? ভৈরব নিষ্প্রভ চোখ চেয়ে হাঁ করে আছে, সাগ্রহে ঠোঁট নাড়ছে··· কি দেবে ঐ মুখে?

ভাত তো নেই দাদা—

রাঁধছে?

মৃত্যুপথযাত্রীকে রজনী নিরাশ করতে চায় না। আর কতক্ষণই বা।

হ্যাঁ—ফুটছে। এই হয়ে এল। ততক্ষণ জল খেয়ে গলাটা ভিজিয়ে নাও, লক্ষ্মী দাদা আমার—

ভাত ফুটছে! নূতন রূপশালি চালের ভাত, ভুরভুরে গন্ধ। নবান্ন হয় এই চালে। আর একটু সবুর করতে হবে—একটুখানি মাত্র। ভৈরবের মুখে অনন্ত আগ্রহের ছবি। হয়ে এল রান্না—···ছোটবেলায় মা যেমন তাকে বলত, ঘুমুস নি খোকা—হয়ে এল। উঠে বোস, ঘুমুস নি—

কিন্তু ঘুম বড় জড়িয়ে আসছে চোখের পাতায়। জাগ্রত হয়ে থাকতে সে চেষ্টা করছে—কিন্তু চেতনা স্তিমিত হয়ে আসে, সব যেন ধোঁয়া হয়ে তালগোল পাকিয়ে যায়। রজনী কান্নাজড়িত কণ্ঠে তার কানে কানে বলে, গঙ্গা-নারায়ণ-ব্রহ্ম! ও দাদা, ঠাকুরের নাম কর। এ জন্মে যা হবার হল—পরজন্মটা বরবাদ না হয়।

চিরদিনের ঈশ্বরবিশ্বাসী মানুষ! ছেলে ডুবেছে, তা-ও মনে করে ঠাকুরের কোলে আছে। সে আজ চরমক্ষণে গঙ্গা-নারায়ণ-ব্রহ্ম বলছে না, ঈশ্বরের উপর কৃতজ্ঞতার কোন কারণ নেই। সেই ন-বছর বয়স থেকে শীত নেই, বর্ষা নেই—চিরকাল সে খেটে এসেছে, কোনদিন অবহেলা করে নি, জীবনে একটা পয়সা অপব্যয় করে নি, কোন অন্যায় বা পাপ করে নি—তবু সে খেতে পরতে পেল না। ধরিত্রীর সব ধান-চাল টাকা-পয়সা কাপড়-চোপড় চল্লিশ-ডাকাতে

গুপ্ত-ভাণ্ডারে নিয়ে রাখল, বন্ধ-দরজায় সে ঘুরে মরেছে, কিছুতে দোর খুলল না। মৃত্যুক্ষণে ভৈরবের ঠোঁট নড়ছে—ঠাকুরের নামগান করবার জন্ম নয়—ভাতের আশায়, ভাত দে··· ভাত···ভাত···

পরদিন সকালে দিনক্ষণ খুব ভাল, বর-কনে বিদায় হবে। সানাই বাজছে। শুভকর্মে চোখের জল ফেলতে নেই, থমথমে মুখে হিরণ ঘোরাফেরা করছেন। কাল রাতে বাড়িময় গণ্ডগোলের মধ্যে তাঁর খাওয়া হয় নি; অমিতা যাবার আগে বাবাকে জোর করে খেতে বসাল। হিরণ বলেন, তুই বোস খুকি, নইলে আমি গালে তুলছি নে। আসন টেনে নিয়ে অমিতাকেও বসতে হয়। বাপ নিজে খাচ্ছেন, আর কচি খুকিটির মতো অমিতার গালে তুলে দিচ্ছেন। আর বাধা মানে না, চোখের জলের ধারা বইল। সানাই করুণ-রাগিণীতে আলাপ করছে, প্রাণের ভিতর আলোড়িত হয়ে উঠে।

ফুলে ফুলে সাজানো মোটর-গাড়ি—যেন বিজ্ঞানযুগের ইস্পাতের যান নয়, কল্পলোকের বিচিত্র একটি ময়ূর। দেশটাও যেন কল্পলোকের। ফুল আর খই ছড়াচ্ছে উপর থেকে। ফুটফুটে ছেলেমেয়েদের দল, সুশ্রী সুগৌর-তনু কত তরুণী—দামি কাপড়-চোপড় পরা, দামি-দামি গহনা ঝিকমিক করছে, মুখে মুখে হাসি—হাসির তরঙ্গ উৎসারিত হয়ে এদিকে-সেদিকে পড়ছে, উগ্রমধুর সেন্টের গন্ধে ভারাক্রান্ত বাতাস · অপরিমিত ঐশ্বর্য। এই অপূর্ব মনোহর মানুষগুলিও যেন মাটির পৃথিবীর নয়—রূপকথায় যে রাজপুত্র-রাজকন্যাদের কথা শুনে থাকি তারাই। লনের দক্ষিণদিকটায় ত্রিপল-ঢাকা অস্থায়ী শেডটার নিচে গত রাত্রের বাড়তি ঝুড়ি ঝুড়ি সন্দেশ পোলাও ফ্রাই লুচি। এর একটা বিলিব্যবস্থা করতে হবে—বিপিন সরকার ভয়ানক ব্যস্ত।

এ যেন দ্বীপের মতো—বাইরের থেকে বিচ্ছিন্ন, একেবারে স্বতন্ত্র। এই নরনারীরা কাঁদতে শেখে নি, হাহাকার জানে না, বিশ্রী নিরলঙ্কার ভাবে অভাব-অনটনের কথা বলতে পারে না, কেবল সুমিষ্ট হাসি, শালীন হিউমার, উঁচুধরণের কথাবার্তা। অগণ্য মানুষের জীবন-সংঘর্ষে লোনা ঢেউ চারিদিকে আছাড়ি-পিছাড়ি খাচ্ছে—মাঝখানে এরা নারিকেল-মর্মরিত শান্ত সুস্নিগ্ধ মায়াকুঞ্জ রচনা করেছে।

গেট থেকে বেরিয়েই ব্রেক কষে মোটর থামাতে হয়। রাস্তায় পড়বার মুখে আড়াআড়ি খানিকটা জায়গা জুড়ে শুয়ে আছে মানুষটা। ড্রাইভার চেঁচিয়ে ওঠে, এই উল্লুক! সত্যি, কি রকম বেকুব—এ কি একটা শোবার জায়গা? চাপা পড়লে তখন তো ড্রাইভারকে নিয়েই টানাটানি!

হঠ যাও। এই বুড়বাক—

এত চিৎকার চেঁচামেচি, তবু ওঠে না। রাগে গরগর করতে করতে ড্রাইভার নেমে জুতা সুদ্ধ পায়ের লাথি উঠিয়েছে···পা'টা নামিয়ে নিল। ঘুম নয়, মরে গেছে বেটা। মুশকিল! জন দুই ভিতর থেকে ছুটে এসে মড়াটা ড্রেনের দিকে গড়িয়ে দিল। রওনা হবার মুখে কি অলক্ষণ! কালকের ভোজে ময়দা লেগেছিল, খালি বস্তাগুলো পড়ে আছে—তার গোটা দুই এনে ঢেকে দিল, যাবার সময় মড়া দেখতে না হয়! মুখটা চেনা নাকি? যেন ভৈরবের মতো। না-ও হতে পারে। ক্ষুধা-বিশীর্ণ বীভৎস ওদের সব মুখের চেহারা মোটামুটি এক—তোমার আমার মুখ নয় যে আলাদা করে চেনা যাবে।

কিন্তু ক'টিকে ঢাকা চলে ময়দার বস্তায়? শুয়ে আছে, বসে আছে—আরও কত! বসে থেকে ক্ষুধা-লোলুপ চোখে যারা তাকাচ্ছে, তারা আরও ভয়ানক। মড়া জ্যান্ত হয়ে ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকালে যে রকমটা হয় তেমনি। অমিতা শিউরে তাড়াতাড়ি মোটরের কাচ তুলে দেয়; রাস্তার দিক থেকে চোখ সরিয়ে বরের দিকে তাকায়। বরও তাকিয়ে আছে পরম রূপসী নববধূর দিকে। বাস—আর তো কেউ নেই, মাত্র এরা দু'টি। দু-জনের মুখে মধুর হাসি ফুটে উঠল। চালাও জোরে···জোরে···আরও জোরে। তীব্র হর্ন দাও, রাস্তা ছেড়ে ওরা সব ছুটে পালাক। গাড়ি এখনই গিয়ে দাঁড়াবে আর এক প্রকাণ্ড গেটের ভিতরে মার্বেল-বাঁধানো প্রকাণ্ড সিঁড়ির পাশটিতে। ততক্ষণ এ-ওর দিকে চোখ চেয়ে ঠেশাঠেশি হয়ে বসে থাক তোমরা। এক দ্বীপ থেকে আর এক নিরাপদ দ্বীপে যাচ্ছে, মাঝের লবণাক্ত সমুদ্রটুকু চোখ-কান বুঁজে কোন রকমে কাটিয়ে দিতে পারলে হয়!

লঙ্গরখানা

১

ভাত দাও মা চাড্ডি।

ওরে হারামজাদা গোবিন্দ, কানে যাচ্ছে না ?

উঠোনের দিকে ঝুঁকে গোবিন্দ বলে, চেঁচাচ্ছিস কেন রে বাপু ? ...স। নিয়ে যাচ্ছি।

উঁহু, এখানে নিয়ে আয়। ভাত নয়—ফ্যান।

গোবিন্দ এসে দাঁড়াল।

গরম আছে তো ? ঢেলে দে বেটাদের মাথায়। এত খাওয়াচ্ছি, তবু ডাকে, 'মা'। 'মা'—'মা'—'মা'—মুখস্থ করে এসেছে !

২

নমিতা শুনে হেসেই খুন।

ভাত জুটছে না, তাই এখন ফ্যান চালাচ্ছে ? লাগাও খিচুড়ি আমাদের এখানে, সঙ্গে মাছ ভাজা।

খবর পৌঁছে গেল। রক্তচক্ষু সুবল বলে, বটে ! লাগাও এখানে পোলাও কোপ্তা-কাবাব। মোড়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবি তুই গোবিন্দ। পোলাও-কোপ্তা কাবাব—চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলবি। দেখি কে যায় ও বাড়ি।

৩

তবু যাচ্ছে বাবু।

আগুন হয়ে সুবল বলল, তুইও যা, চলে যা—

গোবিন্দ দাঁড়িয়ে আছে। গলা খাটো করে সুবল বললে, টিপিটিপি ওদের মধ্যে বসে দেখে আয়, কেমন খাওয়াচ্ছে।

ফিরে এসে গোবিন্দ বলে, ভাঙা মুসুরি আর ইয়া মোটা মোটা চালের খিচুড়ি আর কুচোচিংড়ি-ভাজা। থুঃ—থুঃ—

তবে মানুষে যায় কেন আমাদের পোলাও ছেড়ে ?

হেসে হেসে কথা বলে কিনা। হিংসুটে মেয়ে বাবু, কিন্তু হাসিটা ভারি মিষ্টি।

৪

কাজকর্ম চুকে যাবার পর গোবিন্দও অদৃশ্য হচ্ছে ইদানীং। রাগে রাগে সুবল চলে গেল নমিতার ওখানে।

হাতে বালতি, গোবিন্দ খিচুড়ি পরিবেশন করছে।

নমিতা বলে, চুকে সমস্ত গেছে। আমাদের খাওয়া-দাওয়া এইবার। বারান্দায় জায়গা হয়েছে, বসে যান।

ঘুরে দাঁড়িয়ে সুবল পা বাড়াল।

না খেয়ে যাবেন, সে হবে না। গেট বন্ধ কর, এই রামদীন।

রামদীন পৌঁছবার আগে নিজেই নমিতা ফটক আটকে দাঁড়াল।

শুধু হিংসুটে নয়, দস্তুরমত মিলিটারি মেজাজ মেয়েটার। খাওয়াচ্ছে সামনে বসিয়ে, যেন জঙ্গিলাট বাহাদুর হুকুম চালাচ্ছেন এক হাবিলদারের উপর।

৫

সন্ধ্যাবেলা কেউ যখন নেই, সুবল আবার গেল।

দেখুন, একটা পরামর্শ হওয়া উচিত, সেইজন্যে এসেছি। কম্‌পিটিশনে দু-পক্ষেরই লোকসান।

নমিতা বলে, লঙ্গরখানা আপনি একাই চালান। আমি বন্ধ করে দেব ভাবছি।

টাকাকড়ি ফুঁকে গেল ?

উল্টে হাজার দশেক দেনা। নালিশ করেছে। আদালতের সমন দিয়ে গেল এই।

সমন পড়ে দেখে, মামলার মাসখানেক বাকি এখনও।

৬

ভিখারি-ভোজন তুলে দিলে নাকি সুবল ?

একজনকেই দিয়ে দিলাম যা ছিল সমস্ত।

ভিতরে আসতে বোমার মতো ফেটে পড়ল নমিতা।

লোকের কাছে আমায় ভিখারি বলছ ?

নমিতার মাথায় সিঁদুর, হাতে লোয়া।

কানু গাঙ্গুলির কবর

খোঁড় এখানটায়। বেশি নয়, হাত তিন-চার খুঁড়লেই হবে। না পাও, আর একটু দক্ষিণে গিয়ে খোঁড়। যতক্ষণ না পাও খুঁড়ে খুঁড়ে চলে যাও দিকি। নিশ্চয় পাবে।

খুঁড়ছে ছেলেগুলো। কড়া রোদ, সর্বাঙ্গে ঘামের স্রোত বয়ে যাচ্ছে, খুঁড়ে যাচ্ছে তবু।

গুপ্তধন আছে নাকি শঙ্কর-দা ?

শঙ্কর-দা বুড়ো হয়েছেন এখন। একমুখ দাড়ি। ঘাড় নেড়ে তিনি হাসলেন। মুক্তার মতো পরিচ্ছন্ন সাদা সাদা দাঁত। হাসেন কথায় কথায়, হাসি ছাড়া আর কিছু জানেন না। আর যখনই হাসেন দু-পাটি দাত বিদ্যুতের মতো ঝিলিক দিয়ে যায়।

শঙ্কর-দা হাসতে হাসতে দেখাচ্ছেন, উঁহু—এদিকে আর নয় ভাই। ডোবা ছিল, ডোবার পাশে ছিল বাঁশবন।······কি হে, হাত-পা গুটিয়ে দাঁড়িয়ে কেন তোমরা ? তোমাদের ওদিকেই হবে।

কোদাল মারতে মারতে হাত রাঙা হয়ে গেছে দেখুন শঙ্কর-দা—

হাত মেলে দেখাল ছেলেটা। টুকটুকে ফর্শা বড়লোকের ছেলে—জীবনে ধরে নি কোদালের মুঠো। হাতের তলা সত্যি রাঙা হয়ে গেছে।

শঙ্কর-দা একটু অপ্রতিভ হয়ে বললেন, কি করব—ঠিক ধরতে পারছি না যে! তখন এরকম ছিল না—বনজঙ্গল বাঁশঝাড় ন্যাপলার মার দো-চালা কুড়েঘর একখানা। অন্ধকার রাত্রে তাড়াতাড়ি পুঁতে ফেলেছিলাম। জায়গার নিশানা রাখা হয় নি, আর সময়ও ছিল না ভাই। আবার কোনদিন যে দিনদুপুরে খুঁড়ে দেখবার আবশ্যক হবে, একালের সোনার ছেলে তোমরা কোদাল হাতে এসে জুটবে, সে কি ভাবতে পেরেছি সেদিন ?

অকৃত্রিম হাসিতে শঙ্কর-দার সমস্ত মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। তিনি বলতে লাগলেন, খোঁড়—খোঁড়াখুঁড়ি করতে করতে কলসি পেয়ে যাবে একটা। সোনার নয়, পিতলের নয়, মাটির কলসি।

কলসির ভিতর ?

সেই ফর্শা বাবু ছেলেটা বলল, সোনার মোহর—

আর একজন বলে, মোহর আসবে কোত্থেকে ? বড়লোক ছিলেন না তো এঁরা—

বড়লোকেরা দিত। টাকা নইলে এত সব কাজ চলত কি দিয়ে ?

না দিলে ডাকাতি করে আনতেন।

শঙ্কর-দা তখন কিছুদূরে গাছতলায় দাঁড়িয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছেন। এদের আলোচনা কানে যাচ্ছে না তাঁর। একেবারে অপরিচিতের মধ্যে এসে পড়েছেন, এমনি মুখের ভাব। এই গাছপালাবিহীন প্রশস্ত জায়গাটা, এই ছেলেগুলি, পীচের রাস্তা, বিদ্যুতের আলো আর বড় বড় বাড়িতে উদ্ধত এই মহকুমা শহর—সেকালের সঙ্গে কিছুতে এদের যোগ ঘটাতে পারছেন না। দু-তিন বছর পরে এক একবার জেল থেকে বেরিয়ে নূতন পরিচয় শুরু করেন, ভাল চেনাজানা হবার আগেই আবার ধরে নিয়ে যায়। এবারেই বা কতদিন থাকেন, তাই দেখ।

বিকাল অবধি বিশ-পঁচিশ জায়গায় খুঁড়েও শঙ্কর-দার মাটির কলসি পাওয়া গেল না। সন্ধ্যার পর তিনি অমূল্য ডাক্তারের বাড়ি গেলেন। ডাক্তার যথারীতি কলে বেরিয়ে গেছেন। দু-হাতে টাকা রোজগার করছেন—তাকে বাড়ি পাওয়া দুর্ঘট। আর মানইজ্জতও খুব, এখানকার হাসপাতালের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, গভর্নমেণ্টের পেয়ারের মানুষ।

তিনবার গিয়ে রাত্রি সাড়ে ন'টার পর দেখা হল অমূল্য ডাক্তারের সঙ্গে। গর্জমান মোটর থেকে নেমে উপরে উঠে যাচ্ছিলেন, শঙ্কর-দাকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে বারান্দায় এলেন।

চোখে কম দেখি, ঠিক ঠাহর করতে পারলাম না। তুমি নিশ্চয় জায়গাটা দেখিয়ে দিতে পারবে অমূল্য ভাই।

কোন্ জায়গা ?

মনে পড়ছে না? আপনার মার বাড়িতে সেই যে রাত্রি বেলা—

অনেক দিনের কথা, জীবনের এক বিস্মৃত অধ্যায়। অবশেষে অমূল্য ডাক্তারের মনে পড়ল। এদিক-ওদিক তাকিয়ে নিচু গলায় বললেন, আমাকে আর ওসবের মধ্যে কেন দাদা? ও. বি. ই. টাইটেল দিয়েছে এবার আমাকে।

শঙ্কর-দা বললেন, ভোরবেলা বেড়াতে গিয়ে তুমি একটু আন্দাজ দিয়ে এসো। কে দেখছে বলো সে সময়? ছেলেরা সমস্ত দিন জমি কুপিয়ে আধমরা হয়ে গেছে।

শঙ্কর-দার হাত কোনদিন কেউ এড়াতে পারে না, আজকে বুড়ো হয়ে পড়েছেন—এখনো নয়। অমূল্য ডাক্তারকে ঐখানে নিয়ে তবে ছাড়লেন। খুব ভোরবেলা—রাত আছে বললেই চলে—সেই সময় তাঁরা গেলেন। বাঁশবন কেটে ফাঁকা করে ফেলেছে। পাকাবাড়ি হবে—বাড়ির সীমানা ঠিক করে খুঁটো পুঁতেছে। ইট এনেছে—ঢালছে গাড়ি গাড়ি। খোয়া ভেঙে ভেঙে পাহাড় জমিয়েছে একদিকে।

অমূল্য ডাক্তার বললেন, উঃ—বিষম বাড়ি ফেঁদেছে তো এতটা জমি নিয়ে।

শঙ্কর-দার চোখের সামনে দিয়ে এ সমস্ত ভেসে যায়, মনে পৌঁছয় না। নিজের খেয়াল ছাড়া বিশ্বভুবনের আর সমস্ত নিরর্থক তার কাছে। অমূল্য বলতে লাগলেন, অ্যাসেম্বলির মেম্বর—মোটা মাইনে ভাতা, তার উপর চালের সাপ্লাই দিয়ে কম টাকা মেরেছে? ডাক্তারি না করে পলিটিক্সে নামলে মুনাফা অনেক বেশি ছিল। আর আমার সুযোগও ছিল—আধা-আধি তো নেমেই ছিলাম। কি বলেন?

শঙ্কর-দার সঙ্গে ঘুরে ঘুরে অমূল্য ডাক্তার জায়গাটার সন্ধান করতে লাগলেন।

কাঁঠালগাছের গর্তের ভিতর মৌচাক হয়েছিল—মনে আছে দাদা? এই যে সেই গাছের গোড়া। আপনার চোখ খারাপ, দেখতে পান নি। কাঁঠালগাছের গোড়া নিশানা করে খুঁড়তে বলুন তো আগে। ··খুঁড়তেও হবে না, ভিতের মধ্যে পড়ে গেছে, চুন দিয়ে দাগ দিয়েছে এই দেখুন। কত বড় বড় ঘর ফেঁদেছে—উঃ!

অমূল্য দেরি করলেন না, মানুষজন এদিকে এসে পড়বার আগেই অদৃশ্য হলেন।

কবে ওরা ভিত কাটবে, কি করবে,—সে অপেক্ষায় থাকবার মানুষ শঙ্কর-দা নন। একটু পরেই ছেলেদের নিয়ে এলেন।

খোঁড়—

প্রফুল্লর লোকজন হাঁ-হাঁ করে পড়ল। এখানে কি মশাই? আর যেখানে যা ইচ্ছে করুন গে, ভিতের উপর খোঁড়াখুঁড়ি চলবে না।

শঙ্কর-দা বললেন, তোমাদের মনিবকে খবর দাও গিয়ে। সে এসে মানা করলে তবে থামব। পথ বেশি নয়, ছুটে চলে যাও তার কাছে। কি বলে শুনে এসোগে।

ছুটেই চলল তারা। ছেলেরা এদিকে খুঁড়ে চলেছে। কিন্তু মানা করতে কেউ ফিরে এল না। প্রফুল্ল শুনে অবহেলার ভাবে বলল, থাক্‌গে, থাক্‌গে—বুড়োমানুষ যা করছেন তার উপর কিছু বলতে যেও না তোমরা।

বিস্ময়ে দু-চোখ কপালে তুলে সরকার বলল, বলেন কি? এদ্দিন এদিকে-ওদিকে হচ্ছিল, আজকে যে জায়গায় আরম্ভ করেছেন তাতে আমাদের প্ল্যান মতো বাড়ি তৈরির অসুবিধে হয়ে যাবে কিন্তু হুজুর।

প্রফুল্ল বলে, প্ল্যান বদলাতে হবে। চুপচাপ দু-চার দিন এখন তুমি বসে থাকগে, ওদিকে যেও না। ওঁর যা করবার করে চলে যান। তখন ভাবা যাবে, কোন্‌খানে বাড়ি তুললে অসুবিধা না হয়।

দু-চার দিনের আর দরকার হল না, কলসি সেই দিনই পাওয়া গেল। ঠুক করে একটু আওয়াজ হল কোদালের আগায়। গাছতলায় বসে আর দুটো ছেলের সঙ্গে সে আমলের গল্প করছিলেন শঙ্কর-দা। চোখে ভালো দেখেন না, কান অত্যন্ত সজাগ, ছুটে চলে এলেন।

বেরিয়েছে তা হলে? কানায় কোপ ঝেড়েছিস, দফাটি সেরে দিয়েছিস তো?

কলসির কানা একটুখানি ভেঙে গিয়েছে কোদালের কোপ লেগে। ছেলেরা নেড়েচেড়ে দেখবার চেষ্টা করছে, কি আছে এর ভিতর যার জন্য আজ দিন চারেক ধরে শঙ্কর-দা উঠে পড়ে লেগেছেন কলসি

আবিষ্কারের জন্য। কিন্তু দেখবার কিছু নেই আপাতত। মাটি ঢুকে কলসির ভিতরটা বোঝাই—সোনার মোহর ইত্যাদি যদি থাকে, সে ঐ মাটি চাপা পড়ে আছে। মাটি বের করে দেখবে, তারও আর উপায় নেই, শঙ্কর-দা এসে পড়েছেন। বলছেন, হ্যাঁ—এইটেই। এইটে বলেই মনে হচ্ছে। এক কাজ কর্—একখানা খোঁটা পুঁতে রাখ্ ঐখানটায়। কলসি তুলে নিয়ে আয়—দেখি, সেই কলসি কিনা—

কলসি উপরে আনা হল। শঙ্কর দা ভিতরে হাত ঢুকিয়ে মাটি বের করে ফেলছেন। ছেলেরা চারিপাশে ঘিরে দাঁড়িয়ে, নিশ্বাস পড়ছে না কারও যেন। কি তাজ্জব জিনিস না জানি এর মধ্যে, সাত রাজার ধন কোন মানিক। কিন্তু শঙ্কর দা মাটি বের করেই যাচ্ছেন—কলসির তলা অবধি শুধুই মাটি। এ কলসি নয় নাকি তবে? হঠাৎ কি কতকগুলো পেয়ে আনন্দোচ্ছ্বাসিত কণ্ঠে শঙ্কর-দা বলে উঠলেন, হ্যাঁ—এই বটে।

মুঠো খুলে দেখালেন—কড়ি কতকগুলো। বললেন, পাওয়া গেছে ওই সেই জায়গা। কলসি যেমন ছিল বসিয়ে এক টুকরা বাঁশের গোয় নিশান উড়িয়ে দে এখানে।

ছেলেরা অবাক হয়ে চেয়ে আছে।

শঙ্কর-দার চোখ চক-চক করে উঠল। ধরা গলায় বললেন, কাঙ্ক গাঙ্গুলির কবর এইখানটায়।

গাঙ্গুলির কবর?

শঙ্কর দা স্তিমিত দৃষ্টিতে দূরের দিকে এক নজরে কি দেখতে লাগলেন।

এই মহকুমা শহর তখন একটা বড়গোছের গ্রাম বললেই চলে। এখান থেকে মিটারগেজের লাইন বসিয়েছিল কেশপুরের গঞ্জ অবধি। খালধারে তার ওয়ার্কশপ ছিল। ওয়ার্কশপ কম্পাউণ্ডের ভিতরেই পাশাপাশি পাঁচ-ছ'খানা বাংলো প্যাটার্নের বাড়ি। বাড়িগুলো আজও আছে, উকিল মোক্তাররা থাকেন। সে আমলের নামটা কেবল রয়ে গেছে—সাহেবপাড়া। মোটরবাসের দৌরাত্ম্যে রেললাইন শেষাশেষি অচল হয়ে ওঠে। সাহেব কোম্পানি এক ভাটিয়ার কাছে

সবসুদ্ধ বিক্রি করে দিয়ে সরে পড়ল, এসব ভিন্ন এক কাহিনী। এখন ছোট রেলের কোনই চিহ্ন নেই এ অঞ্চলে, লড়াইয়ের সময় লোহার পাটিগুলো অবধি উপড়ে নিয়ে গেছে।

তখন শঙ্কর-দা দস্তুরমতো যুবাপুরুষ— ছাব্বিশ-সাতাশের বেশি বয়স নয়। অন্ধকারে পিছল মেঠো-পথ ধরে টিপিটিপি তাঁরা চললেন। আজকের স্বনামধন্য প্রফুল্ল মজুমদার মশায়ও সেই দলে। প্রফুল্লর বাড়ি থেকেই সব রওনা হয়েছেন। প্রফুল্লর বোন হাসিকে দেখেছেন আপনারা। মোটা থপথপে, গলায় সরু সোনার হার ঐ বিধবা মেয়েটা তখন নিতান্ত ছেলেমানুষ। কেমন করে টের পেয়েছিল বুঝি—যাবার সময় জোর করে একমুঠো সন্দেশ খাইয়ে দিয়েছিল কানুকে। কানু কিছুতে খাবে না, তখন হাসি তার হাত ধরে ফেলল। জীবনে প্রথম ঐ যে তার হাত ধরল—গা শিরশির করে উঠেছিল কিনা বলতে পারি নে সেদিনের কুমারী মেয়ে হাসির। যা হোক কিছু মুখে দিয়ে অন্ধকার বর্ষারাত্রে পা টিপে টিপে সকলে যাচ্ছে, গাইড ফিস-ফিস করে নির্দেশ দেয়, বুকের মধ্যে গুর-গুর করে ওঠে গাইডের কণ্ঠের মৃদু আওয়াজে।

কুলি-বস্তি উত্তীর্ণ হয়ে সাহেবপাড়ার ভিতরে পা দিলে মনে হয়, নন্দনকাননে এসে পড়লাম নাকি? ওদের সুস্থ ছেলেমেয়েগুলো লনের উপর ছুটোছুটি করে বেড়ায়, কোঁকড়ানো সোনালি চুল বাতাসে ওড়ে; রাত্রে জোরালো পেট্রোম্যাক্স জ্বলে প্রতি বারান্দায়, রেকর্ডে নাচের বাজনা বেজে ওঠে। আর রাস্তার অন্ধকার মোড় থেকে বস্তির ছেলেরা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে অকারণে উল্লসিত হয়, ঘরে এসে সাহেবপাড়ায় কি দেখে এল, সেই গল্পগুজব করে, দূরের গ্রাম থেকে আত্মীয়-কুটুম্ব যারা আসে, তাদের কাছে ঐসব বলে গর্ববোধ করে।

খবর এসেছিল, টমাস সাহেব অনেক টাকা নিয়ে সন্ধ্যার গাড়িতে সদর থেকে এসেছে। গাড়ি লেট ছিল, সাহেব পৌঁছবার আগেই ওয়ার্কশপ বন্ধ হয়ে গেছে, সেজন্য কুলিদের মাইনে দেওয়া হয় নি, সমস্ত টাকা বাড়িতেই আছে সাহেবের।

একটা কথা জেনে রাখুন—শঙ্কর-দা প্রায়ই বলেন কথাটা—সাদা চামড়ার মানুষগুলোর মধ্যে এমন কাপুরুষ আছে, যাদের জুড়ি দুনিয়ার

মধ্যে নেই। জালিয়ানওয়ালাবাগে আর আগস্ট আন্দোলনের সময় অনেক ক্ষেত্রে ওদের বীরত্বের বহর দেখা গেছে, আর শঙ্কর-দার কাছ থেকে শুনতে পাবেন সেই রাত্রে সাহেবপাড়ার বাসিন্দাদের বীরত্ব-কাহিনী। গুলি-বোঝাই ছয় সিলিণ্ডার রিভলবার হাতে রয়েছে, কিন্তু টমাস সাহেব ট্রিগার টিপল না। কাঁপতে কাঁপতে হাত থেকে রিভলবার পড়ে গেল। আর কানাই সেইটাই তুলে ধরল তার মুখের সামনে। রাত তখন বেশি নয়, দলের একজন দু-জন গিয়ে দাঁড়িয়েছে এক এক বাংলোয়, অতগুলো প্রাণীর তাতেই প্রায় মূর্চ্ছার অবস্থা। মোটের উপর এত নির্গোলে কাজ হাসিল হবে, কেউ এরা স্বপ্নেও ভাবতে পারে নি।

বেরিয়ে চলে আসছে—সাহেবেরা নিপাট ভদ্রলোক, হাতখানা উঁচু করবার শক্তিও যেন হারিয়ে ফেলেছে, তারা কিছু করে নি—পিছন দিক থেকে রাইফেলের গুলি কানুর পিঠে এসে বিঁধল। বাহাদুর বলে এক গুর্খা ছোকরা ছিল পাহারাদার—গুলি করেছে সেই। এর জন্য কেউ প্রস্তুত ছিল না আর অব্যর্থ টিপ কানাই মাটিতে পড়ে গেল। আর ওদিকে এই গোলযোগে বুলিবস্তি থেকে পিল পিল করে মানুষ বেরুচ্ছে। মানুষ দেখে সাহেবগুলোর হতভম্ব ভাব কাটল এতক্ষণে, তারাও বেরুল। কানু অসাড়, ক্ষতস্থান দিয়ে রক্তের ধারা বয়ে যাচ্ছে। দাঁড়ানো গেল না তার পাশে, পঙ্গপালের মতো মানুষ আসছে। বিষম হৈ-চৈ, টর্চের আলোয় রাস্তা আলোকিত হয়ে গেছে। মুহূর্তের মধ্যে ঘটে গেল। কানুকে কাঁধে তুলে নেবার সুযোগ পাওয়া গেল না।

প্রফুল্লর চিরদিনই সাফবুদ্ধি, সে এক চালাকি করল। ওদের ধাঁধা দেবার জন্য তিন চারজনে মিলে উল্টোমুখো সদর রাস্তা বেয়ে ছুটল। বুটজুতোর আওয়াজ তুলে সাহেবগুলোও পিছু ছুটেছে। বকুলতলার অন্ধকারে শঙ্কর-দা সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন। সবাই খুব খানিকটা এগিয়ে গেলে কানুকে কাঁধে নিয়ে টিপিটিপি বাগিচার ভিতর দিয়ে বিলের প্রান্তে এসে পৌঁছলেন।

নিরন্ধ্র অন্ধকার। কানুর মুখখানা শঙ্কর দা একবার দেখবার চেষ্টা করলেন, যে মুখে ওরা লাথি মেরে গিয়েছে। দেখা যাচ্ছে না। রক্তের ধারা গড়িয়ে পড়ছে তাঁর সর্বাঙ্গ বেয়ে। যখন ছুটছিল প্রফুল্লর পিছু

পিছু, বকুলতলা থেকে ওদেরই টর্চের আলোয় শঙ্কর-দা দেখলেন, ছুটতে ছুটতে থমকে দাঁড়িয়ে একজন বুটের লাথি ঝেড়ে দিয়ে গেল চেতনাহীন কানুর মুখে। ফুটফুটে ছেলে কানাই—কোদাল পাড়তে পাড়তে মুখ রাঙা হয়ে গেছে ঐ যে ফর্সা বড়লোকের ছেলেটির, ওরই মতো প্রায় দেখতে—সবে কলেজে ঢুকেছিল—পবিত্র পুণ্যবান বংশের ছেলে। শঙ্কর-দা নিঃশব্দে নিষ্পলক চোখ মেলে দেখলেন, লাথি মেরে আক্রোশ মিটিয়ে ওরা আবার ছুটল।

কানুকে নিয়ে এলেন এখানে। এই চৌরস মাঠ নয়—তখন কশাড় বাঁশবাগান, তার এক প্রান্তে জেলেদের এক বুড়ি কুঁড়ে বেঁধে বসতি করত, ন্যাপলার মা বলে তাকে ডাকত সকলে। কখন কখন শুধুমাত্র 'মা' বলে ডাকতেন এঁরা, 'মা' ডাকে বুড়ি গলে যেত। কত যে ঝঞ্ঝাট পোহাত! রাতবিরেতে যখনই দায় পড়ত, চলে যেতেন তাঁরা ন্যাপলার মার ওখানে। ন্যাপলার মা আজ বেঁচে নেই, তার ঘরখানার চিহ্নমাত্র নেই, ওঁদের কত সাহায্য করেছে, কত ঘটনার সাক্ষি ছিল সে! দশ বাড়ি ধান ভেনে, গোবরমাটি লেপে খাওয়া-পরা চালাত—বক-বক করা ছিল তার স্বভাব, কাজ করতে করতে কোন অদৃশ্য অলক্ষ্য শত্রুর উদ্দেশে গালি পাড়ত, যত কষ্ট হত, গালিরও জোর বাড়ত তত বেশি। কিন্তু আশ্চর্য এই, কখনো কোন অবস্থায় এঁদের বিষয়ে একটা কথা উচ্চারণ করে নি বুড়ি।

ন্যাপলার মার ঘরের ভিতর তো এনে নামালেন কানুকে। টেমি জ্বলছিল, ফুঁ দিয়ে বুড়ি সেটা নিভিয়ে দিল—কি জানি, খোঁজে খোঁজে কেউ যদি এসে পড়ে। কানুর তখন জ্ঞান ফিরেছে অল্প অল্প, অস্পষ্ট কণ্ঠে জল চাইল। ন্যাপলার মা সজল চোখে—বাসনপত্র তো নেই—নারিকেলের মালায় জল গড়িয়ে দিল। শঙ্কর-দা নামিয়ে রেখেই ছুটে বেরিয়েছেন ডাক্তারের সন্ধানে। ডাক্তার এনে ফল যা হবে, সে অবশ্য জানাই আছে। তবু মনকে প্রবোধ দেওয়া—ডাক্তার দেখানো হয়েছিল। আর ডাক্তারও সেই সময়টা সহজলভ্য ছিল, ঐ অমূল্য সরকার—তাকে খবর দেওয়ার মাত্র অপেক্ষা।

পুরোপুরি ডাক্তার নয় তখন অমূল্য, ফোর্থ ইয়ারে পড়ত, প্লুরিসির

মতো হয়—মাস ছয়েক তাই বাড়ি থেকে বিশ্রাম করছিল। এ ব্যাপারে বাইরের কাউকে ডাকা চলে না, অতএব অমূল্যর চেয়ে ভাল ডাক্তার আর কোথায়?

অমূল্য ঘুমুচ্ছিল। বাইরের চৌরিঘরখানায় সে শুত, শঙ্কর-দা জানতেন। দরজায় টোকা দিলেন, ঘুম ভাঙল না। তখন ছ্যাঁচা-বাঁশের বেড়া দু-হাতে একটু ফাঁক করে ফিস-ফিস করে ডাকতে লাগলেন, অমূল্য—অমূল্য! পাশ ফিরে শুল সে একবার। বাখারি ছিল একটা পড়ে, সেইটে ঢুকিয়ে খোঁচা দিতে ধড়মড় করে অমূল্য উঠে বসল।

কে?

চুপ! বেরিয়ে এসো—

মেঘ জমে এসেছে আকাশে, গুড়ি-গুড়ি বৃষ্টি পড়ছে। শঙ্কর-দা বললেন, বুলেট রয়ে গেছে, বের করে ফেলতে হবে। শিগ্‌গির চলো।

অমূল্য বলে, তাই তো—অপারেশনের যন্ত্রপাতি কিছু যে নেই আমার কাছে।

যেন যন্ত্রপাতি থাকলেই আর কোনরকম ভাবনার বিষয় ছিল না। যাই হোক, যন্ত্রও মিলল অবশেষে। খুঁজে পেতে ভোঁতা একটা ল্যানসেট পাওয়া গেল তার বাক্সর মধ্যে। সেইটে আর এক শিশি আইডিন পকেটে পুরে অমূল্য দ্রুতপায়ে শঙ্কর-দার সঙ্গে চলল।

গিয়ে তাঁরা অবাক। আশাতীত ব্যাপার—কানু বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠেছে ইতিমধ্যে, টর-টর করে কথা বলছে। প্রফুল্ল ফিরে এসেছে, হাঁপাচ্ছে সে তখনও—হাঁপাতে হাঁপাতে কৃতিত্বের গল্প করছে, কেমন করে ধোঁকা দিয়ে দলসুদ্ধ সে খেয়াঘাট অবধি নিয়ে গিয়েছিল। তারপর বোঁও করে দৌড় দিল পাটক্ষেতের দিকে—পুরোদমে ছুটলে তাকে ধরতে পারে কে? এ-ক্ষেত থেকে সে-ক্ষেতে—শেষকালে চারিদিক দেখেশুনে সন্তর্পণে এখানে চলে এসেছে।

আবার টেমি জ্বালতে হল ডাক্তারকে অবস্থা দেখাবার জন্য। হাসিতে উদ্ভাসিত কানুর মুখ, প্রফুল্লর গল্প খুব সে উপভোগ করছে। বুলেট আটকে রয়েছে পিঠের দিকটায়, এখনও রক্ত বন্ধ হয় নি, যন্ত্রণায়

মুখ এক একবার কালিবর্ণ হচ্ছে, দেহ আকুঞ্চিত হয়ে উঠছে—হাসির প্রলেপ কিন্তু ঠোঁট দু'খানার উপর।

টেমির আলোর তিন দিকে ভাল করে ঢেকে দেওয়া হল, কানুর দেহ ছাড়া বাইরে কোনদিকে আলোর রেশ না বেরোয়। প্রফুল্ল আর শঙ্কর-দা দু-পাশে তৈরি হয়ে বসেছেন, কানু ইশারায় মানা করল—ধরতে হবে না তাকে। দাঁতে দাঁত চেপে সে উপুড় হয়ে আছে, অমূল্য ডাক্তার হাঁটু গেড়ে বসে ল্যানসেট একবার আধ-ইঞ্চিখানেক বসিয়ে আবার তুলে নিল। যাচ্ছে না ঠিকমতো। নতুন হাঁড়ি চেয়ে নিয়ে তাতে ঘষে ঘষে ধার দিল যন্ত্রটায়। আগুন করে একটুখানি সেঁকে নিয়ে তারপর এমনভাবে চিরতে লাগল যে শঙ্কর-দা অবধি মুখ ফিরিয়ে নিলেন। চোখে আর দেখা যাচ্ছে না—কাজ সেরে টেমিটা নিভিয়ে দিতে পারলে বাঁচেন।

কিন্তু কিছুই করা গেল না, চামড়া চিরে খোঁচাখুঁচিই হল খানিকটা। নিঃশব্দে অমূল্য নাড়ি ধরে বসে আছে। একবার দেশলাই জেলে হাতঘড়ি দেখল—সাড়ে-তিনটে। মেঘভাঙা অল্প অল্প জ্যোৎস্না ফুটেছে তখন। তিনজনে ওঁরা মাটির উপর উবু হয়ে বসে আছেন। ক্যাপলার মা জল গরম করবার জন্য মাচার উপর থেকে টেনে টেনে শুকনো নারিকেল-পাতা বের করছে। শঙ্কর-দা ডেকে বললেন, থাক মা, আর দরকার হবে না।

ধপ করে দাওয়ার উপর সেইখানে বসে পড়ল ক্যাপলার মা।

বাঁশবনের বাসা থেকে এপারে হঠাৎ কাক ডেকে উঠল। আচ্ছন্ন-ভাব কাটিয়ে তাঁরা চমকে উঠলেন—রাত আছে আর মোটে দণ্ড দেড়েক। প্রফুল্ল ছুটল কানুর দাদা বলরামের বাড়ি—শেষ দেখা দেখতে দেওয়া উচিত। হ্যাঁ ভাই, সরকারি উকিল রায় সাহেব বলরাম গাঙ্গুলি—মহামহোপাধ্যায় হরিচরণ বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের বড় ছেলে বলাই। অমন অবাক হয়ে তাকাবার কি আছে? এমনি সর্বত্র—ঠগ বাছতে গাঁ উজাড় হয়ে যাবে। ইংরেজের খোশামুদি করে যারা দিন গুজরান করত, খোঁজ করলে দেখতে পাবে ইংরেজের প্রবলতম শত্রু হয়তো তাদের বাড়িতেই। লাঠি মেরে মাথা ফাটানো যায়,

কিন্তু মনের মাথায় যে শান্তি পড়ে না! শেষাশেষি আর এদেশে ইংরেজের নিরাপদ ভূমি একটুও রাও ছিল না—কেউ ভাল চোখে দেখত না ওদের। কম মুশকিলে পড়ে ওরা ভারত ছেড়েছে!

হাত তিনেক গর্ত খোঁড়া হয়েছে ইতিমধ্যে বাঁশতলায় নাটার ঝোপের আড়ালে। গর্তের ভিতর কানুকে এনে নামানো হল। এমনি সময় রায় সাহেব এলেন, ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে গভীর একটা নিশ্বাস চেপে নিলেন।

শঙ্কর-দা বললেন, আপনি একা এলেন গাঙ্গুলি মশায়, প্রফুল্ল মায়ের কথা বলে নি? তিনিও এসে দেখে যেতেন একটু।

বলরাম বিচলিত ভাবে না না করে উঠলেন। বললেন, মা দেখে তো কষ্টই পাবেন শুধু, হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠবেন। তার চেয়ে আমি রটিয়ে দেব, কানু নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে। বেড়াতও তো অমনি ভাবে!···না না শঙ্কর, কাজ নেই, এক কান দু-কান করে ছড়িয়ে যাবে। বাঘে ছুঁলে আঠার ঘা—একেবারে বংশসুদ্ধ টান পড়ে যাবে আমাদের।

পাতার ফাঁক দিয়ে চাঁদের ম্লান আলো এসে পড়েছে কানুর মুখের উপর। ঝুপ ঝুপ করে তিনজনে গুঁড়ো মাটি ছড়িয়ে দিচ্ছেন দেহের চারি পাশে। নিষ্পলক চোখে চেয়ে চেয়ে রায় সাহেব বলে উঠলেন, মহামহোপাধ্যায়ের ছেলের শেষটায় কবর দিলে শঙ্কর?

পরক্ষণেই সামলে নিয়ে তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, আমি কিছু বলছি নে এ নিয়ে। শ্মশানে নিতে গেলে জানাজানি হবে, উপায় কি বলো? যে যেমন অদৃষ্ট করে এসেছে। বলে নিশ্বাস ফেলে চুপ হয়ে গেলেন।

শঙ্কর দা বললেন, হিন্দু আর মুসলমান, শ্মশানঘাট আর কবরখানা—যারা খবরের কাগজের রাজনীতি করে, পাখার নিচে বসে টাকা-পয়সার কারবার হিসাব করে, তাদের। লড়াইয়ের মুখে জাত বেজাতের হিসাব থাকে না রায় সাহেব।

মাটির বড় চাঁইগুলো কানুর নরম গায়ে চাপাতে কষ্ট হচ্ছে বুঝি শঙ্কর-দার, মাথার ধারে বসে হাতের মুঠোয় গুঁড়িয়ে ফেলছেন। ভ্যাবলার মা এই সময়ে এই মাটির কলসি আর পাঁচ কাহন কড়ি এনে বলল, দাও বাবা এসব ওর সঙ্গে—দিতে হয়। কড়ি নইলে বৈতরণী পার হতে দেবে না যে।

ইহলোক আর পরলোকের মধ্যে দুস্তর ভয়াল বৈতরণী নদী। কানুর বিদেহী আত্মার পারানি কড়ি কলসির মধ্যে পুঁতে দেওয়া হল তার সঙ্গে। ধরণীর এত ঐশ্বর্যের মধ্যে পাঁচ কাহন কড়ি মাত্র শেষ সম্বল—তা ঐ হাতের মুঠোর মধ্যে নিয়ে শঙ্কর-দা পাষাণ-মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

গর্ত ভরাট হল। তার উপর নারিকেল-পাতা বাঁশ আর বাঁশের চেলা সাজিয়ে ঢেকে দেওয়া হল। অনেক দিন ধরেই আছে যেন এইরকম, কেউ সন্দেহ করতে না পারে।

সন্দেহ কেউ করে নি। সেই অমূল্য মস্ত বড় ডাক্তার—গভর্নমেন্টের তরফে অনেক নাম, রায় সাহেব বলরাম যথারীতি সেলাম বাজিয়ে রায় বাহাদুর রূপে সম্প্রতি রিটায়ার করেছেন, আমাদের প্রফুল্লও এম. এল. এ. হয়ে গত মন্বন্তরের সময় চাল-সাপ্লাইয়ের কাজে দেদার টাকা পিটেছে। ন্যাপলার মা বুড়ি কোন্‌কালে মরে গেছে। তার সেই বাড়ি আর আশপাশের অনেক জমি নিয়ে এক বিরাট বাগানবাড়ি ফেঁদেছে প্রফুল্ল। শঙ্কর-দা জেল থেকে এসে কানুর প্রসঙ্গ তুললেন, প্রফুল্লর মনে পড়ে গেল, তটস্থ হয়ে সে বলল, বটেই তো! জায়গাটা নিরিখ করে দিন—কবরের উপর বসতবাড়ি তোলা ঠিক হবে না। রেলিং দিয়ে একটা পিলার গেঁথে দেব আমি ঐ জায়গায়।

পিলার হয়তো প্রফুল্ল সত্যিই গেঁথে দেবে—কিন্তু ঐ পর্যন্ত। সে প্রফুল্ল নেই তো আর! মড়ার পাশে তাড়াতাড়ি ফুঁ দিয়ে টেমি নিভিয়ে দিয়েছিলেন কেউ দেখতে পাবে বলে—সে আলো আবার কেউ জ্বালাতে আসবে না কবরের উপর। কিংবা—ঠিক বলা যায় না, প্রফুল্লর বোন ঐ মোটা থপথপে হাসির ভাবটা যেন কেমন-কেমন। নাছোড়বান্দা তার কাছে শঙ্কর-দা সেবার বলেছিলেন এই কাহিনী। শঙ্কর-দার মতো মানুষ—তাঁরও মুখ খুলতে হয়েছিল দলের বাইরে ঐ বিধবা মেয়েটার কাছে। হাসি হাত ধরে জিজ্ঞাসা করেছিল, সেই যে চলে গেল—কোথায় গেল তার পরে শঙ্কর দা? মিথ্যা কথা অনেক সাধনা করে এঁদের অভ্যাস করতে হয়, জাঁদরেল পুলিস-অফিসারদের মুখের উপর অবাধে এঁরা মিথ্যা বলে যান, কিন্তু সজল-চোখ মেয়েটার সামনে শঙ্কর-দার মুখ দিয়ে কিছুতেই সেদিন মিথ্যা বেরুল না।

আধুনিকা

দু-দিন আজ বিষম বাদলা নেমেছে। বিকালে ঐ ঝুপঝুপে বৃষ্টির মধ্যে তিনটে সাতাশের লোকালে বেরিয়েছিলাম রোগি দেখতে। ফিরছি এখন। রাতের গাড়িতে ফিরতে হবে, তাই যাবার সময় বেডিং অর্থাৎ সতরঞ্চি ও দেশি কম্বলে জড়ানো বালিশটা স্টেশনে রেখে গেছলাম।

টিকিট বাবু বিশেষ চেনা আমার। হাসপাতালে রেখে সেবার এঁর কার্বঙ্কল অপারেশন করে দিয়েছিলাম। খাতির করে আমায় অফিস-ঘরে এনে বসালেন। বললেন, এ গাড়িতে কেন যাচ্ছেন ডাক্তার বাবু? পৌঁছুতে ধরুন—

তিনটে নিশ্চয় বাজবে। তা-ও পথে যদি আপনাদের রেলগাড়ি দয়া করে ঘুমিয়ে না পড়েন কোথাও—

তাই বলছি, শুয়ে থাকুন এখন স্টেশনে। ওয়েটিং-রুমের তালা খুলিয়ে দিচ্ছি। সকালবেলা খুঁ আগে চলে যাবেন।

হবার জো নেই মশায়। তা হলে কি এই ভোগ ভুগতে আসি?

দশ টাকার একখানা নোট বের করে দিয়ে বললাম, টিকিট দিন। শেষ রাত্তির থেকে রোগির ভিড় লাগে। টিউবওয়েল নেই বলে পানা পুকুরের জলই রঙ করে দাগ কেটে চালাচ্ছে ফটিক কম্পাউণ্ডার। তাই শেষ করে উঠতে দুপুর গড়িয়ে যায়।

টিকিট আর বাদবাকি টাকা-পয়সা হিসাব করে দিলেন টিকিট বাবু।

থার্ড ক্লাসের?

নয় তো আর আট টাকা সাড়ে নাবে। আর ফেরত দিচ্ছি? গুণে নিন।

কিন্তু বলছিলাম কি—ভোর থেকেই স্তেথোস্কোপ টুকে কসরৎ চালাতে হবে। আমার শুয়ে যাবার দরকার।

টিকিট বাবু বললেন, তোফা নাক ডাকাতে ডাকাতে যাবেন, আমি

বলছি। সেভেনটিন-ডাউন গেল, সেভেন-আপ গেল—সব খা-খা করছে, কাকস্য পরিবেদনা। এমন অভ্রায় কুকুর-বেড়াল ঘর থেকে বেরোয় না—

কিন্তু ডাক্তার বেরোয়। আর ডাক্তার আনতে যারা যায়, তারাও—

তা যা বলেছেন!

টিকিট বাবু হো-হো করে হেসে উঠলেন। গলা নামিয়ে বলতে লাগলেন, বুদ্ধি বাতলে দিই ডাক্তার বাবু। থার্ড ক্লাসে জায়গা না পান, যে ক্লাসে পাবেন উঠে পড়বেন—পরোয়া করবেন না। চেকার ধরে ফেললে হাতে কিছু গুঁজে দেবেন, না ধরল তো কথাই নাই। যদি বলেন, পজিসন থাকে না—এ দুর্যোগে কে দেখতে যাচ্ছে যে অমুক ডাক্তারবাবু থার্ডক্লাসে চলেছেন। আর দেখেই যদি, স্রেফ বলে দেবেন—পি. সি. রায় মশায়ও এই লাইনে কতবার গেছেন থার্ড ক্লাসে।

টরে-টক্কা করে টেলিগ্রাফের সঙ্কেত এল, টিকিট বাবু সেই দিকে দৌড়লেন। আর উপদেশ শোনা হল না।

গাড়ি এল। ফাঁকা সত্যি। টর্চ ছিল, অসুবিধা হল না। একটা কামরায় উঠে পড়লাম। বাইরে থেকে ভেবেছিলাম, জনপ্রাণী নেই। সেটা ঠিক নয় অবশ্য, তবে সজাগ অবস্থায় কেউ নেই। সাকুল্যে জন আষ্টেক হবে, সবাই বেঞ্চির উপর পড়ে পড়ে ঘুমুচ্ছে। মরে ঘুমুচ্ছে যেন। টর্চের আলো গায়ের উপর দিয়ে চালিয়ে চলে গেলাম, কেউ নড়ল না একটুখানি।

জায়গা যথেষ্ট আছে। একেবারে কোণের দিকে একটা বেঞ্চি পছন্দ করে সতরঞ্চি পেতে ফেললাম। নিরিবিলি থাকা যাবে। কেউ উঠে হঠাৎ বুঝতে পারে না, এ জায়গাটুকুতেও বেঞ্চি দিয়েছে। না—বেঞ্চি না হোক, বাঙ্ক আছে বুঝতে পেরেছে তো!

বাঙ্কের উপর জিনিসপত্র গাদি দিয়ে রেখেছে কে-একজন।

গেঁয়ো হাসপাতালের ডাক্তার আমরা—বেলা একটা অবধি হাসপাতালের কাজ করে পনের মিনিটের ভিতর নেয়ে খেয়ে প্রাইভেট

প্র্যাকটিসে বেরোই—সময়ের অপব্যয় খাতে সয় না। শতরঞ্চির উপর বালিশটা মাথায় গুঁজে তৎক্ষণাৎ শুয়ে পড়লাম। শীত-শীত করছিল—কম্বলটা গায়ে জড়িয়ে দিলাম ভাল করে। ঘুমও আমাদের সাধনা করে আয়ত্ত করা—যেখানে যে অবস্থায় হোক, গড়িয়ে পড়বার অপেক্ষা।

বৃষ্টি জোরে এল আবার। কড়-কড় করে মেঘ ডাকছে, বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। গাড়ি চুপচাপ দাঁড়িয়ে, কখন নড়বে গাড়িই জানে। আমার অবশ্য তাড়া নেই সেজন্য, নীলগঞ্জ স্টেশনে ভোরের আগে পৌঁছলে হল। বরঞ্চ যত দেরি হবে, ততই ভাল আমার পক্ষে। বাসায় গিয়ে আবার এক দফা ঘুমোবার সুবিধা হবে মনে হয় না। নিশ্চিন্ত আলস্যে চোখ বুজলাম।

স্বপ্ন দেখছি, মনে হচ্ছে। চুড়ির মৃদু আওয়াজ, শাড়ির খসখসানি। শাড়ির খানিকটা ঘোলাটের আবরণে আমার মুখ ঢেকে ফেলেছে, স্নিগ্ধ মিষ্ট গন্ধে চেতনা আরও আচ্ছন্ন হচ্ছে। একটি মেয়ে গা ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে আমার! মুখ দেখতে পাচ্ছি না। বাঙ্কের বিছানা-বস্তা-গুলোর মালিক তা হলে মেয়েটি! অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি-সব নাড়ানাড়ি করছে, মৃদু কণ্ঠে বারেকবার কি যেন বলল আপন মনে। স্বপ্ন আর জাগরণের মাঝে তখন আমি দোল খাচ্ছি, শোনবার বা ভাল করে চোখ মেলে দেখবার অবস্থা নেই। এটা ঠিক, আমি একটা পুরুষ মানুষ নিচে শুয়ে পড়ে আছি মেয়েটা টের পায় নি। এই লড়াইয়ের দিনে নূতন ব্যবস্থা হয়েছে, গাড়ির কামরায় আলো থাকে না; নিরন্ধ্র অন্ধকার। আর তার উপর যে রকম কালো কম্বল জড়িয়ে পড়ে আছি, চোখের যত জোর থাকুক ঠাহর করা সোজা নয়। ক্রমশ সজাগ হলাম, কিন্তু অদ্ভুত অবস্থা—নিশ্বাসটাও নিতে হচ্ছে অত্যন্ত সন্তর্পণে। মেয়েটা বুঝতে পারলে বড় অপ্রতিভ হয়ে যাবে।

বাঁচলাম রে বাবা—চলে যাচ্ছে। দম ধরে কুম্ভক করে থাকা কতক্ষণ পোষায়! সেন্টের সুবাস, শাড়ির আঁচল, গহনার ঝিনিঝিনি—সকল উপসর্গ নিয়ে অন্ধকারবর্তিনী মেয়েটা নেমে গেল।

গাড়ি জংশন-স্টেশনে এল। 'চা-গরম—' হাঁক শুনে বুঝতে পারছি। আধ ঘণ্টার উপর গাড়ি থাকে এখানে। শীত ধরেছে, মন্দ

হয় না এক কাপ চা পেলে। মাটির গ্লাসে কটু বিস্বাদ যে তরল বস্তু ফিফি করছে, ও নয়। প্লাটফর্মের উপরেই রেস্তরাঁ—হামেশাই এ পথে যাতায়াত করতে হয়, সমস্ত জানাশোনা। পাকা-দাড়ি ফোকলা দাঁত এক বয় আছে, কাপ পিছু দু পয়সা বেশি ধরে দিলে সে চমৎকার চা বানিয়ে দেয়।

শেডের নিচে লম্বা টেবিল। কাঁচের জারে কে-কবিস্কুট, দড়িতে টাঙানো মর্তমান কলা। বড় একটা তোলা-উনুন পিছন দিকে, উনুনের উপর ডেকচিতে টগবগ করে জল ফুটছে, গরম জল হাতা কেটে কেটে ঢালছে চায়ের কেটলিতে। আর পাশে বড় একটা প্লেটে করে চপ-কাটলেট সাজিয়ে রেখেছে, উনুনের আঁচে গরম থাকছে ওগুলো। এই হল জংশন-স্টেশনের সুবিখ্যাত রেস্তরাঁ। খদ্দেরের বসবার জন্য সামনে ক'খানা টিনের চেয়ার আছে। ভিড়ের চোটে কোনদিন কিন্তু চেয়ারে বসতে পারি নি, দাড়িয়ে দাঁড়িয়েই চায়ের কাপ হাতে নিয়ে চুমুক দিয়ে চলে গেছি। আজকে দুর্যোগের দরুণ ভাগ্য সুপ্রসন্ন। দিব্যি লাটসাহেবি মেজাজে বসে টবের উপর পা ছড়িয়ে ঢোঁকে ঢোঁকে চা খাচ্ছি। এক কাপ শেষ করে ফের এক কাপের ফরমায়েস করেছি, এমন সময়—

বঙ্কিম যে! তুমি কোথেকে এখানে?

হাতে টিফিন-কেরিয়ার, ছুটতে ছুটতে এসেছে বঙ্কিম। বলে, বলেন কেন দাদা। ডিউটিতে আছি।

টিফিন-কেরিয়ার এগিয়ে ধরে বলল, এদিকে—আমার এটা ভরতি করে দাও। যা তোমাদের ভাল আছে, সব রকম দাও দুটো চারটে করে। কুইক—

পুলিসে চাকরি করে বঙ্কিম। পুলিসরূপ বলয়ের মধ্যমণি আই. বি তে ঢুকেছে নাকি। কম বয়সে উন্নতি করেছে। কিন্তু হাবা-গবা ভালো মানুষটি কি কৌশলে যে উন্নতি করল, আমার কাছে এক প্রহেলিকা। আর দ্বিতীয় প্রহেলিকা হয়ে দাঁড়াল, তার মতো কৃপণ মানুষ রেস্তরাঁয় এসে ঢালা হুকুম ছাড়ছে। এখনো আমি ঘুমিয়ে নেই তো?

ব্যাপার কি হে?

বঙ্কিম বলে, এই ট্রেনে যাচ্ছেন? আসুন, আসুন। ক্ষিধে পেয়েছে কিনা বড্ড!

নোট দিয়েছে, তার বাকি পয়সা ফেরত নিতে সবুর সয় না, এমন ব্যস্ত। হাত ধরেছে আমার, আর এক হাতে টিফিন-কেরিয়ার। ছুটছে। বলে, মুখ ফুটে আমার ক্ষিধের কথা বলল। সেই মেয়ে দাদা। মনে পড়ছে না—লিলি মিত্তির।

অতঃপর মনে না পড়বার কথা নয়। চার-পাঁচ বচ্ছর ঐ চিজটি নাকানি-চোবানি খাওয়াচ্ছে বঙ্কিমচন্দ্রকে। একবার তো আমাকে সুদ্ধ। হাত-পা ধরাধরি করে বঙ্কিম আমাকে আর তার খুড়ো সম্পর্কের একজনকে পাঠাল ওদের বাড়ি মেয়ের বাপের কাছে বিয়ের প্রস্তাব করবার জন্য। মেয়েটাই গেট অবধি এগিয়ে এসে ধুলো-পায়ে আমাদের বিদায় করে দিল, উঠানে পা ফেলতে দিল না।

রাগ করে বললাম, লিলি মিত্তির তো জুতোর হিলে কাদা ছিটকে ছিটকে মুখে দেয়, এখনো পিছন ছাড় নি! আশ্চর্য মানুষ তুমি।

বঙ্কিম হেসে বলে, বড্ড রেগে আছেন দাদা, কিন্তু সে লিলি আর নেই। আসুন না, দেখবেন আলাপ করে। আমার সঙ্গেও আজ দৈবাৎ দেখা এই গাড়িতে। এখন সে-ই লেপটে রয়েছে আমার গায়ে। ডিউটিতে আছি, কিন্তু গল্প··গল্প···গল্প। সব স্টেশনে নেমে দেখাও আর হয়ে উঠছে না।

পরম দুঃখে বলতে লাগল, ভাদ্র মাস পড়ে গেল—নয়তো বা মন-মেজাজ দেখছি, নির্ঘাৎ এবার লাগিয়ে দেওয়া যেত। শুধু রাজি নয়—বিষম রাজি সে এখন। কিন্তু হলে কি হবে—অঘ্রাণ অবধি হা-পিত্তেশ ধরে থাকা ছাড়া উপায় নেই।

সেই লিলি বদলে এখন কি হয়েছে, দেখবার কৌতূহল কিছু আছেই—তার উপর বঙ্কিম হাত ধরে গ্রেপ্তার করে নিয়ে চলেছে, হাত এড়াবার উপায় নেই। তার ভাবী স্ত্রীর সম্পর্কে আমাকে রাগ করে থাকতে দেবে না, মিটমাট করে দেবেই।

বৃষ্টি একেবারে ধরে গেছে, মেঘ-ভাঙা জ্যোৎস্না উঠেছে। একটা

সেকেণ্ড ক্লাস কম্পার্টমেণ্টের সামনে দেখলাম মেয়েটা অধীরভাবে পায়চারি করছে। বঙ্কিম দেখিয়ে দিল, ঐ—

কাছে নিয়ে পরিচয় করিয়ে দেয়, এঁকে চিনতে পার লিলি?

লিলি চমকে তাকাল। মনে হল, তার চোখে বিরক্তি পুঞ্জিত হয়েছে। আবার এই সময়ে ছুটো গেঁয়ো স্ত্রীলোক ছুটতে ছুটতে তার গায়ে একরকম ধাক্কা দিয়ে গেল। এক পা হঠে দাঁড়াল লিলি, ভ্রূ কুঁচকে নাক সিঁটকে বলল, মানুষ না জানোয়ার? নোংরা কাপড়-চোপড়—কি দুর্গন্ধ মাগো!

জলের কল কাছেই, জল পড়ছিল। হয়তো হাতে ছোঁয়া লেগেছিল তাদের, রগড়ে বগড়ে হাত ধুয়ে এল। বদলেছে কি রকম, বুঝতে পারি না। ধুলোভরা নোংরা পৃথিবীতে সেই তো আগের মতন ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে হাঁটে। ধুলো না হয়ে যদি আগাগোড়া কার্পেট বিছানো থাকত, সোয়াস্তি পেত এই লিলির জাতের মেয়েগুলো।

হাত ধুয়ে এসে দাঁড়াতে বঙ্কিম নাছোড়বান্দা—আবার শুরু করল, চিনতে পারলে না দাদাকে? সেই যে সেবার—মনে পড়ছে না? শান্তিময়-দা গো—যাঁর বাড়িতে থেয়ে আমি মানুষ। আমার নিজের বড়-দার চেয়েও বেশি। প্রণাম করো।

লিলি হাত দু-খানা একটু তুলল—হাত জোড় হল না, কপাল অবধিও পৌঁছল না। তা যা-ই হোক, বদলেছে একটু সত্যিই। এ কালের মা-লক্ষ্মীরা গড় হয়ে প্রণাম করতে শেখেন না—কিন্তু যে হাত একদিন রাস্তা দেখিয়ে দিয়েছিল, কপালের দিকে সেই হাত উঠল তো উঁচু হয়ে!

ওদের গাড়িতে উঠে বসতে হল। বেশ জ্যোৎস্না ফুটেছে, জানলা দিয়ে এসে পড়েছে। বছর বাইশ বয়স মেয়েটার। রং খুব ফর্শা। সেটার কতখানি নিজস্ব, আর কতটা ক্রিম-পাউডারের মারফতে দাঁড় করিয়েছে—সঠিক বলা যাবে না। ঠোঁটে আর গালে রুজ, নখে রঙ, একহাতে চুড়ির গোছা আর একহাত খালি, রুক্ষ চুলের বোঝা···মুখের উপর 'হায়—হায়—' গোছের একটা ভাব, কত দিনের করুণ ক্লান্তি যেন জমে আছে সেখানে। চেয়ে চেয়ে দেখি, আর ভাবি—কত ঘণ্টা সময়

লেগেছে না জানি প্রসাধনে। ছবি আঁকার মতো এরা দেহখানি সাজিয়ে গুছিয়ে বুভুক্ষু চোখের সামনে তুলে ধরে। সিল্কের আঁটো ব্লাউজ গায়ে, শাড়ির গুটানো আঁচল আলগোছে আছে কাঁধের উপর। সুরার রক্তিম আভা কাঁচের পাত্র থেকে যেন বেরিয়ে আসছে। গা শির-শির করে ওঠে। দু-চোখে দেখতে পারি না এই চিঠি-লেখা চপল মেয়েগুলোকে —যারা দিনের অর্ধেক সময় ধরে সাজে, আর সাজ কতটা খুলল বাকি অর্ধেক সময় তারই পরখ করে বঙ্কিমের মতো হাদারামগুলোর উপর।

মনের ভিতরে যাই থাক, হেসে আলাপ জমানোর চেষ্টা করতে হয়। আলাপ করিই বা কি ছাইপাঁশ নিয়ে? বোঝে তো দুটো জিনিস পৃথিবীতে—সিনেমা আর টয়লেট, আর আমি নিতান্ত আনাড়ি ঐ দুটো জিনিস সম্পর্কে।

লিলি বলল, আপনার কথা শান্তিময় দা, অনেক শুনেছি। উঠেছেন কোন্ গাড়িতে?

বঙ্কিমই বলল, ও ধাবে কোথায়। ঘুম—ঘুম—ঘুম—এমন ঘুম-কাতুরে দাদা আমার। তোমার সঙ্গে দেখা করাতে আনব, ঘুম কামাই হবে বলে তা-ও আসতে চান না।

লিলি বলে, হাই তুলছেন। তাই তো—ওঁকে কষ্ট দেওয়া ঠিক হচ্ছে না। দেখাশুনা তো হল—যান শান্তিময় দা, ঘুমুনগে আপনি।

অর্থাৎ সরল বাংলায় ব্যাখ্যা করলে এই দাঁড়াচ্ছে, আপদ-বালাই বিদায় হও তুমি এখান থেকে। বর্ষা রাত্রে ফাঁকা গাড়িতে দু-জনে আছি, পাকা চুল আর ভারি গোঁফজোড়া নিয়ে দোহাই তোমার জেঁকে বসে থেকো না এর মধ্যে।

কিন্তু বঙ্কিমটা বুঝবে না এ সব কিছু। বলে, কষ্ট না আরো-কিছু! কি হয় মানুষের একরাত না ঘুমুলে? কত কথা জমে আছে, বসুন। দেখাশুনার পাট একেবারে উঠিয়ে দিয়েছেন, তার শাস্তি।

এই সময় খেয়াল হল টিফিন-কেরিয়ারের খাবার যেমন তেমনি রয়েছে।

কই লিলি, খাচ্ছ না যে?

এখন থাক—

ক্ষিধে পেয়েছে বললে—

লিলি মৃদু হেসে বলে, কখন ?

আমি জানি, বড্ড ক্ষিধে পেয়েছে তোমার। খাও।

আমি বললাম, খাওয়ানোই যদি মতলব, আমায় টেনে আনলে কেন এখানে ? আমি উঠি।

লজ্জিত হয়ে লিলি বলল, না না, বসুন আপনি, গল্প করুন। মেয়েদের ওয়েটিং-রুমে যাই আমি। হাত-টাত ধোবার দরকার, নিচে তো নামতেই হবে—

বঙ্কিমের দিকে চেয়ে বলে, বাপ রে, অত এনেছ কেন ? দাও অতি-সামান্য কিছু—

নিজেই সে একটা বাটিতে করে তুলে নিল। আড় চোখে তাকিয়ে দেখি, যা নিল নেহাৎ অতি-সামান্য নয়। যাক—একেবারে বেপরোয়া হয় নি তা হলে, পুরুষদের সামনে হাঁ করে গিলতে লজ্জা লাগে এখনো !

লিলি গেল তো ফাঁকা পেয়ে অতঃপর বঙ্কিম ছেঁকে ধরল। শতকণ্ঠে লিলির কথা। বাইরে একটু বেশি চটপটে হলেও মনে মনে সে অত্যন্ত সরল ও অমায়িক, অমন মেয়ে হয় না। অর্থাৎ প্রেমে গদগদ অবস্থা বেচারির। লিলি অলোকসামান্য নারী, পৃথিবীতে এমনটি দ্বিতীয় জন্মায় নি, বিনাতর্কে মেনে নিয়েও অব্যাহতি পাই নে। বঙ্কিম বিপুল-তর উৎসাহে আবার তার গুণের ফিরিস্তি দিতে লেগে যায়। এ পাগল দেখছি মাথা খারাপ করে দেবে।

লিলি ফিরে আসছে। দুটোয় মিলে গল্প করুক, এবার আমি পালাব। না ঘুমুলে চলবে না। অগ্নিবিন্দু···। জ্যোৎস্নার আলোয় দেখতে পাচ্ছি, হাঁ—লিলিই তো ! সর্বনাশ, আরে সর্বনাশ—মেয়েটা সিগারেট ধরিয়েছে নাকি ?

যখন কামরায় এসে উঠল, তখন অবশ্য ও-সব কিছু দেখলাম না। চুলোয় যাকগে। কতক্ষণ বা আছি এদের সঙ্গে, ক'দিনই বা দেখা হবে জীবনে !

বঙ্কিম বলে, এর মধ্যে হয়ে গেল ?

যাচ্ছেতাই খাবার। ফেলে দিতে হল প্রায় সমস্ত।

লজ্জায় মরে গিয়ে বঙ্কিম বলে, তাই নাকি ? সব তাতে জোচ্চুরি চলেছে আজকাল। আচ্ছা, মামুদপুর পৌঁছই। সেখানে—

মামুদপুর আমার নীলগঞ্জেরই ঠিক পরের স্টেশন। আট বছর আছি, আমার ঘরবাড়ি বললেই হয় নীলগঞ্জ-মামুদপুর ইত্যাদি ঐ অঞ্চলটা। আশ্চর্য হয়ে বললাম, ফ্লাগ-স্টেশন—এক ঢোক খাবার জল জোটানো যায় না, জলখাবার মিলবে কোথা মামুদপুরে ?

মুচকি হেসে রহস্যপূর্ণ চোখে বঙ্কিম বলল, আমাদের মিলবে দাদা, ষোড়োশোপচারে রাজভোগ। লোক আছে কিনা আমাদের !

আমি বললাম, এ গাড়ি আগে ধরতই না ওখানে।

আজকাল ধরে। মিলিটারি ঘাঁটি হয়েছে কিনা ! ক্যান্টিন থেকেই খাবারের ব্যবস্থা করা আছে। আর তা ছাড়া—কথার মাঝে বঙ্কিম থেমে গেল হঠাৎ।

আমি আর লিলি চেয়ে আছি। বঙ্কিম বলল—লিলির খাতিরেই নিশ্চয়—তা আপনাদের কাছে বললে আর দোষ কি ? বাইরে খবর ছড়াতে যাচ্ছেন না তো ?

গলা নিচু করে বলতে লাগল, কাল রাত্রে এক কাণ্ড হয়েছে। পেট্রোল দিয়ে পোস্টাফিস পুড়িয়ে দিয়েছে।

লিলি বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করে, সে কি ? পোস্টাফিস পোড়াতে গেল কারা ?

বঙ্কিম বলে, মাথা খারাপ যাদের। দেশ উদ্ধার হবে নাকি এই সমস্ত করে করে।

মুখ দিয়ে আমার বেরিয়ে গেল, করাচ্ছে যে তাদের দিয়ে—

লিলি সায় দেয়, ঠিক ! দেশদ্রোহী পঞ্চম বাহিনীরা—

না, সরকারি লোক তারা—

বঙ্কিম হাঁ করে আমার মুখে তাকাল।

হাঁ—সরকারই দায়ি এ সমস্তর জন্য। বোম্বাই প্রস্তাব নিয়ে কংগ্রেস কি করে, দেখবার জন্য সবুর করল না। কেন ধরল গান্ধিজী ও নেতাদের ? সর্বস্ব দিয়ে যারা পরাধীনতার অবসান চাচ্ছে, আর এক নতুন বিদেশি-জাপানির পায়ে মাথা বিকোবার কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারে তারা ?

লিলি উত্তেজিত হয়ে ঘাড় নাড়ল। না না—ঘুণোরে শত্রু ওসব চুল-চেরা বিচারের সময় এ নয়। ধরা পড়েছে কেউ বঙ্কিমবাবু?

বঙ্কিম পরমোৎসাহে বলে, গোটা দুই এখন পর্যন্ত। কিন্তু যাবে কোথা? বেড়া-জালে আটকানো হয়েছে। এ গাড়িটায় আমার নজর রাখবার কথা। স্টেশনে স্টেশনে নেমে যাচ্ছি, দেখছ না? মামুদপুর থেকে ছ-সাতজন আমাদের উঠবে। গাড়ি তন্ন তন্ন করে দেখা হবে তার পরে।

লিলি বলে, ধরে সব গুলোকে ফাঁসিতে লটকে দেবেন। সেই উচিত শাস্তি।

উঠে দাঁড়ালাম, আর নয়। মনে মনে বলি, বিলাতি পারফিউ-মারির জীবন্ত বিজ্ঞাপন বই তো নও—তোমরা একথা বলবে বই কি! সূর্যের চেয়ে বালির উত্তাপ বেশি। তোমাদের পরম উপাস্য বিদেশি দেবতারাও নিশ্চয় ঘর পোড়াবার দায়ে ফাঁসির হুকুম দিতে চাইত না।

বঙ্কিম পিছনে ডাকতে লাগল, আমি কানে নিলাম না।

কামরায় ঢুকে নিজের জায়গায় যাচ্ছি, জুতোসুদ্ধ পা হড়কে গেল। পড়তে পড়তে সামলে নিলাম। ব্যাপার কি? টর্চ জেলে দেখি, কলার খোসা। আর দেখি, কেক আর কাটলেটের টুকরো ছড়িয়ে আছে আমার সতরঞ্চি-কম্বলের উপর।

কি করে এ সব এখানে আসে? একটা কথা ধ্বক করে মনে উঠল। কিন্তু না—এত জায়গা থাকতে লিলি বেছে বেছে এই থার্ডক্লাসের কামরায় জলযোগ করতে আসবে কি জন্য? সরকারি গাড়ি—যার ইচ্ছে খেয়ে গেছে। তবে আমার বিছানায় ছড়িয়ে না গেলে বলবার কিছু থাকত না।

শুয়ে পড়লাম ঝেড়ে-ঝুড়ে নিয়ে। সেই স্বপ্ন আবার। নিঃশব্দ-গতিতে ঢুকল, পাখীর মতো উড়ে এল যেন। ঘুমোই নি, এক মুহূর্তে নিঃসন্দেহ হয়ে গেলাম।

ফিস-ফিস করে লিলি ডাকছে, অজিত-দা ঘুমিয়ে পড়লে আবার?

ডাকতে ডাকতে বেডিং ও বস্তার মাঝ থেকে শব্দ বেরুল, উঁ?

খেয়েছ ?

তুমি খাইয়ে দিয়ে গেলে না তো।

খাও নি তাই বলে নাকি ?

ফেলে দিয়েছি, রাগ করে ছড়িয়ে দিয়েছি সব—

নিশ্বাস রোধ করে উৎকর্ণ হয়ে শুনে যাচ্ছি। বটে রে! লগেজের সঙ্গে জলজ্যান্ত প্রেমিক একটি নিয়ে চলেছ, ফাঁক মতো এসে এসে প্রেম করেও যাচ্ছ, আর বঙ্কিম হতভাগা ওদিকে খাবার বয়ে বেড়াচ্ছে তোমাদের

লিলি অনুনয়ের সুরে বলে, কি করব। একটা তো পিছনে ফেউ লেগেই আছে। আবার দু-নম্বর জুটেছে—বঙ্কিমেরই কোন বাউণ্ডুলে দাদা। বেশিক্ষণ কাছে থাকতে ভরসা হয় না। মিথ্যে তুমি রাগ করছ।

খুব চুপি চুপি বলছে, তবু শুনতে পাচ্ছি প্রতিটি কথা।

এবার কোমল স্বরে ছেলেটি জবাব দিল, না গো, রাগ করব কেন ? ঠাট্টা করে বললাম। যদ্দুর পারি খেয়েছি। হাত দিয়ে তুলে খাবার জো আছে কি ?

জল এনেছি, জল খাও অজিত দা। হাত-মুখ মুছিয়ে দি তোমার—

আস্তে আস্তে আমি উঠে বসলাম। এমন আবিষ্ট, এখনো টের পেল না। শুধু হাত ধোওয়ানো নয়—ও কি! মুখ এগিয়ে নিয়ে যায়, কি করছে রে ? হাতে-নাতে ধরে ফেলব।

টর্চ জ্বাললাম। বাঙ্কের উপর ঝুঁকে পড়ে লিলি তার শাড়ির আঁচলে হাত-মুখ মুছিয়ে দিচ্ছে। বেডিং-বস্তার আড়ালে মানুষটাকে ঠিক দেখতে পেলাম না।

লিলির মুখ শুকিয়ে এতটুকু। খপ করে আমার হাত জড়িয়ে ধরল।

ঘাড় নেড়ে আমি বললাম, বলে আমি দেবোই। সমস্ত ফাঁস করে দেবো।

সহসা বিছানার স্তূপ ঠেলে মানুষটা খাড়া হয়ে বসল, চলুন—আমিই যাচ্ছি।

লিলি বলে উঠল, উঠো না, উঠো না তুমি অজিত-দা—

শুধু ওঠা নয়, লাফিয়ে নেমে পড়বার চেষ্টা করছে ছোকরাটি। হঠাৎ অসহ আর্তনাদ করে সে গড়িয়ে পড়ল।

শিউরে টর্চ ফেললাম তার দিকে। জীবনে অমন বীভৎস চেহারা দেখব না। সর্বাঙ্গ পুড়ে গেছে, ঘা দগদগ করছে, ঝাঁকুনিতে রক্তের ধারা বেরুচ্ছে ক্ষতমুখ দিয়ে। সেই অবস্থায় অজিত বলতে লাগল, আমার তো ক্ষমতা নেই নিজে গিয়ে ধরা দেবার। ওদের ডাকুন মশাই, চাই নে আমি এই পোড়া-দেহ নিয়ে পড়ে থাকতে।

লিলি সজল কণ্ঠে বলে, না অজিত-দা, না।

দু-জনে আস্তে আস্তে ধরে নামালাম অজিতকে। আমি জল আনতে ছুটলাম স্টেশনে। এসে দেখি—নিজের চোখে না দেখলে কখনো আমি বিশ্বাস করতাম না—সেই নাক-সিঁটকানো শৌখিন মেয়ে লিলি, যার বিলাসিতা ও উচ্ছৃঙ্খলতার কথা পোস্ট-গ্রাজুয়েট ক্লাসের ছেলেদের মুখে মুখে ঘোরে—দামি সবুজ একখানা রুমাল অজিতের ঘায়ের উপর চেপে ধরেছে। রুমাল ভিজে গিয়ে ঘায়ের রসরক্ত গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে তার পাউডার-বুলানো সুশুভ্র হাতের উপর দিয়ে, রাঙানো নখগুলোর উপর দিয়ে। আর কি আকুলতা দেখলাম তার চোখে-মুখে!

স্টেশনের কেরোসিনের আলোর নিচে হঠাৎ বঙ্কিমকে দেখা গেল। ঘুরে ঘুরে ডিউটি দিচ্ছে বোধ হয়। অজিতকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করি, কি বঙ্কিম?

'আসছি—' বলে কোথায় যে লিলি চলে গেল, অনেকক্ষণ দেখতে পাচ্ছি না। গাড়ি ছাড়বে, ঘণ্টা দিতে যাচ্ছে এবার—

হেসে বললাম, লিলিকে আমার এখানে টেনে এনেছি। বড়-ঘরের মেয়ে—দেখে যাক থুতু-কাশি শাল-পাতা পোড়া-বিড়ির মধ্যে কেমন আনন্দ ভ্রমণ হয় আমাদের। যাও লিলি, গাড়ি ছেড়ে দিচ্ছে—

তার কানের কাছে মুখ নিয়ে চুপি-চুপি বলি, মামুদপুর পৌঁছবার আগেই আমি ব্যবস্থা করে ফেলব। নিশ্চিন্ত হয়ে চলে যাও দিদিভাই—

লিলি নেমে গেল। বঙ্কিমের সঙ্গে যাচ্ছে। যেতে যেতে ঘনপক্ষ্ম দৃষ্টি তুলে তাকাল একবার আমার দিকে। জ্যোৎস্নায় দেখতে পেলাম।

নীলগঞ্জ স্টেশনে স্ট্রেচার নেই। জন চারেক কুলিকে দিয়ে অফিসের ইজিচেয়ারটা আনালাম। সবাই আমার চেনা, ডাক্তারবাবু বলে খাতির খুব, একেশ্বর সম্রাট বলতে পারেন আমাকে এ জায়গার। সেই ইজিচেয়ারে অজিতকে শুইয়েছি, আমার কালো কম্বলে ঢেকে দিয়েছি আগাগোড়া। ইচ্ছে করেই বঙ্কিমদের গাড়ির সামনে দিয়ে যাই। লিলি খুব গল্প জমিয়েছে, একখানা হাত এলিয়ে দিয়েছে বঙ্কিমের কোলের উপর। জানলা দিয়ে উঁকিঝুঁকি দিয়েই বঙ্কিম যথাসম্ভব তার ডিউটি করছে।

আমায় দেখে বলে, চললেন দাদা?

হ্যাঁ। আর যেবো কেমন ঐ দেখ। রোগ দেখতে গিয়ে রোগীটাও পিছনে নিয়েছে। ত্রিসংসারে কেউ নেই, হাসপাতালে ভরতি করে নিতে হবে।

লিলি উঠে দাঁড়াল।

প্রণাম করে আসি দাদাকে—

আধুনিকা মেয়ে এসে কাদা ভরা প্লাটফর্মে আমার পায়ের গোড়ায় উপুড় হয়ে প্রণাম করল। মুখ তুলল যখন, দেখি, সাবান দিয়ে ফাঁপানো চুলে ভ্রূর কাজলে ঠোঁটের রুজে কাদা লেপটে গেছে। কুলিরা ততক্ষণে আমার রোগীকে প্লাটফর্মের গেট পার করে নিয়েছে।

কুম্ভকর্ণ

শম্ভু আমার সহপাঠী। কাজেম পণ্ডিতের পাঠশালায় একসঙ্গে তালপাতা লিখেছি, এক সুরে কড়াকিয়া বুড়িকিয়া আবৃত্তি করেছি। রাঙা ঘুনসিতে বুনট-করা দডাহারের মতো একটা জিনিস সে গলায় পরে থাকত—ইমান আলি ফকিরের মন্ত্রপূত তাগা। ভূত-প্রেত চোর-

ডাকাত সাপ-শুয়োর কেউ কোন ক্ষতি করতে পারবে না যতক্ষণ এই তাগা ধারণ করা আছে দেহে। আমার কাছে শম্ভু অনেকবার ঐ তাগার অসামান্য গুণ বর্ণনা করেছে, প্রলুব্ধ করেছে আমায়। ইচ্ছে হয়েছে, নিকারির বাঁধাল পার হয়ে ফকিরের থানে চলে যাই একদিন, গিয়ে তাগা নিয়ে আসি। পয়সাকড়ির খাঁই নেই ফকিরের, যে যা ইচ্ছে করে দেবে তাই নেবেন। ঝাঁড়ফুঁক করেন, জলপড়া দেন, তাগা দেন। দূর-দূরান্তর থেকে মানুষ আসে। রান্নাবান্নাও করতে হয় অনেকের, সেজন্য ফকির লম্বা এক দোচালা বেঁধে দিয়েছেন। নূতন পুকুর কেটে ঘাট বাঁনিয়ে দিয়েছেন। দোকান-পাট রয়েছে পুকুরের ধারে উঠানের পূর্ব-সীমানায়। কোন অসুবিধা নেই। দোকান থেকে হাঁড়ি চাল-ডাল কেনো, প্রচুর বাঁশ ও কাঠ চেলা করে বোঝাই দেওয়া আছে—ইচ্ছা মতো নিয়ে উনুন ধরাও রান্না করো খাও-দাও থাকো। যতদিন ইচ্ছা থাকতে পার, কেউ কিছু বলবে না। এমন কি প্রতি শুক্রবার জুম্মা-নমাজের পর হিন্দু মুসলমান সর্বশ্রেণীর অতিথি-অভ্যাগতের মধ্যে বাতাসা-বিতরণের ব্যবস্থা রয়েছে ফকিরের নিজের খরচে।

একটা ব্যাপার আমরা অহরহ প্রত্যক্ষ করেছি—শম্ভু আশ্চর্য রকম মার খেতে পারত। ফকিরের তাগার গুণেই সম্ভবত। যত মারই মারো, কিছুই যেন তাকে স্পর্শ করত না। পড়াশুনো সম্পর্কেও অবিকল এই রকম। দু-বছর অবিশ্রাম নামতা পড়িয়ে দেখা গেল তিনের ঘরটাও রপ্ত হয় নি। মুখেই পড়ে যায়, মনে তিলমাত্র আঁচড় কাটে না। কাজেম পণ্ডিতের তখন নূতন বয়স, মাঝে মাঝে ক্ষেপে গিয়ে তিনি বেদম পিটোতেন।

নির্বিকার শম্ভু। এক ফোঁটা চোখের জল পড়ত না। কাজেমের হাত ব্যথা হত শুধু। তিনিও নাছোড়বান্দা—শেষটা আর এক উপায় ধরলেন। শম্ভুর মাথা বাঁ-হাতে নিচু করে ধরে গোড়ালি দিয়ে পিঠে মারতেন। ফল ইতরবিশেষ হল না পণ্ডিতের কষ্টের কিছু লাঘব হওয়া ছাড়া। আরও রোখ চড়ে যেত। একদিন, মনে আছে, পালাক্রমে হাত ও পা দিয়ে পিটোলেন মিনিট কুড়িক ধরে। অবশেষে ছেড়ে দিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে এসে টুলের উপর বসলেন। শম্ভু দু-হাঁটুর

মধ্যে মুখ গুঁজে আছে। কাজেম পণ্ডিত এক দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে হাঁপাতে লাগলেন।

একটু সামলে নিয়ে হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন, ধারাপাত নিয়ে পড়তে বললাম, গ্রাহ্য হল না?

জবাব না পেয়ে পণ্ডিত পুনশ্চ উত্তেজিত হলেন। কাছে গিয়ে শম্ভুর ঝুঁটি ধরে নাড়া দিতে সে গড়িয়ে পড়ল। পাঠশালা সুদ্ধ আমরা ভয় পেয়ে গেছি। মারা গেল নাকি পিটুনি খেয়ে? পণ্ডিতের আবার কবিরাজিও একটু-আধটু জানা আছে। নাড়ি দেখলেন, মুখের দিকেও তীক্ষ্ণ নজরে চাইলেন। তারপর হেসে উঠলেন।

ঘুমিয়ে পড়েছে। ভয় ধরিয়েছিল হতভাগা। শম্ভু নয়—বেটা কুম্ভকর্ণ। ঘুমোতে শিখেছে বটে—মার খেতে খেতেও ঘুম।

বড় হয়ে কলকাতায় কায়েমি বসবাস করি। আগে গ্রামের সঙ্গে তবু যা হোক যোগাযোগ ছিল, বছরে দু-একবার যেতাম—ইদানীং কয়েক বছর তা-ও আর হয়ে উঠছে না। বাবার অসুখ নিয়ে নাজেহাল হয়ে যাচ্ছি। তারপর তিনি মারা গেলেন। বাবা অতি সামান্য অবস্থা থেকে বড় হয়েছিলেন। কাজকর্মে শহরে থাকতে হলেও গ্রামের সকলের সঙ্গে তাঁর হৃদ্যতা ছিল। তাঁর আত্মার তৃপ্তি হবে এই রকম মনে করে ধড়া-গলায় গ্রামে গেলাম, ঐখানে শ্রাদ্ধশান্তির আয়োজন করতে।

শম্ভুর বাড়ি গেলাম। চেনা যায় না, বিরাট দশাসই পুরুষ। জিজ্ঞাসা করলাম, কি খেয়ে এমন দেহটা করলি বল দিকি? বোকার মতো সে হাসে। গলার আওয়াজও এমন হয়েছে যে কথা শুনলে বুকের মধ্যে গুর-গুর করে ওঠে। তবে কথা বলে অত্যন্ত কম—নিতান্ত যা নইলে ঘর-সংসার করা চলে না। সৎ ও পরিশ্রমী বলে তার সুনাম শুনেছিলাম, বাড়ির চারিদিকে চেয়ে চেয়ে তার পরিচয় পাওয়া গেল। পৈতৃক জমাজমি জঙ্গল হয়ে পড়েছিল, সমস্ত কারকিত করে সোনা ফলাচ্ছে সে এখন। খানাখন্দ যা ছিল ভরাট করেছে, ডাঙা জায়গার মাটি কেটে নাবাল করেছে। এক ছটাক কোথাও পতিত নেই।

বাড়ির সীমানার মধ্যে পা দিয়ে মন প্রসন্ন হয়ে উঠল, লক্ষ্মীশ্রীতে ঝলমল করছে যেন চারদিক।

চাষবাস ছাড়াও সে ছুতোর মিস্ত্রির কাজ করে। বেরুবার উদ্যোগ করছিল, হাতিয়ার-পত্র বের করে জলযোগের অপেক্ষায় বসে ছিল। বউ এই সময়ে মাঝারি গোছের এক পাকা কাঁঠাল এনে সামনে দিল। শম্ভু বিয়ে করেছে আমাদেরই পাড়ার মেয়ে, নাম ক্ষুদি।

কাঁঠাল রেখে ক্ষুদি এক ঘটি জল আর নারিকেল-মালায় করে একটুখানি তেল এনে রাখল। তেল লাগবে খাওয়ার পর হাত ও ঠোঁট থেকে কাঁঠালের আঠা ছাড়াতে। কাঁঠালটা ভেঙে শম্ভু দুটো-একটা করে সব কোষগুলো খেয়ে ফেলল। আমি হাঁ করে দেখতে লাগলাম। প্রথমটা অত্যন্ত তাড়াতাড়ি। বেগ ক্রমে মন্দীভূত হয়ে এল, শেষটা আস্তে আস্তে রস করে খাচ্ছে, সিটে ফেলে দিচ্ছে। তবু ছাড়বে না।

কাজেম পণ্ডিতের সেই কুম্ভকর্ণের উপমা মনে পড়ে গেল। রামায়ণে আছে, কুম্ভকর্ণ জেগে উঠে—কি খাই কি খাই হুঙ্কার তুলত, ভূরি ভূরি আয়োজন ও অসংখ্য জীবজানোয়ারের প্রয়োজন হত তার জঠরানল নির্বাপণের জন্য। বললাম, পুরো কাঁঠালটা সাপটে দিলি—পেট কামড়াবে না?

শম্ভু বলল, সন্দেশ-রসগোল্লা কোথায় পাব? কে খাওয়াচ্ছে বল।

আমি খাওয়াব। কতগুলো খেতে পারবি?

খেয়ে দেখেছি নাকি? নারিকেল-নাড়ু খেয়েছি একদিন। দু-কুড়ি খাওয়ার পর চোয়াল ধরে গেল, গিলতে কষ্ট হচ্ছিল। নইলে কত যে খেতে পারতাম বলতে পারি নে।

বললাম, দেখা যাবে আমার বাড়ি ভোজের দিন পরখ করে। আজকে যা, কাজে বেরুচ্ছিস—আজ, আর নয়। কাল থেকে আমার ওখানে লেগে পড়বি। তোদের সাহসেই তো গ্রামে কাজ করতে এলাম।

শম্ভুকে দিয়ে আশাতীত কাজ পেলাম। দিনরাত্রি সে খাটত। এই জিনিস-পত্র বওয়াবয়ি, দু-ক্রোশ দূর থেকে সামিয়ানা ঘাড়ে করে নিয়ে আসা, পুকুরের মাছ-ধরানো, সমস্ত রাত্রি জেগে সেই মাছ

কোটা-বাছা ও ভাজার ব্যবস্থা করা, উনুনের ধারে এক আঁটি উলুখড় টেনে নিয়ে তার উপরে বসে ঠায় পাহারা দেওয়া—এক টুকরো মাছ যাতে সরে না যায় কোনক্রমে। যেখানে আটকাচ্ছে, সেইখানে শম্ভু। আমায় থাকতে দিল না, শুতে পাঠাল। বলে, হবিষ্যি করে করে শরীর খারাপ হয়ে গেছে, ওর উপর রাত জাগলে অসুখ করবে। শুয়ে পড়গে তুমি, কিচ্ছু ভাবনা নেই।

ভাবনা নেই, বেশ ভালভাবেই জানি। নিজে বসে থাকলে যা হত, তার চেয়ে অনেক বেশি তদারক হবে। এত খায় আর এমন ঘুমকাতুরে মানুষ—কিন্তু তিনটে দিন ও রাত্রি কেটে গেল, ফাঁক মতো হয়তো দু-গ্রাস মুখে দিয়েছে উঠে, বসে বসেই হয়তো চোখের পাতা বুঁজে এসেছে দু-পাঁচ মিনিটের জন্য। তারপরেই লাফ দিয়ে উঠেছে।

শম্ভু হেসে বলে, কাজ চুকে-বুকে যাক, এর শোধ তুলব। বড়-ভোজে পেট পুরে খেয়ে বিষ্যুদের হাটবার অবধি ঘুমুব। লাঠি মেরেও তুলতে পারবে না।

অসম্ভব নয়। কুম্ভকর্ণও তো ছ-মাস জেগে থেকে মরণ-ঘুম ঘুমাত বাকি ছ-মাস।

ভোজের দিন শেষ দফায় গ্রামের বিশিষ্টেরা বসেছেন উঠানে সামিয়ানার নিচে। সবাই বসে গেছেন, আমি বললাম, তুমিও বসে যাও শম্ভু।

শম্ভু ইতস্তত করে।

বললাম, সকাল থেকে তো দাঁতে কুটো কাটোনি। এ ছাপ্পা মিটতে ঘোর হয়ে যাবে। আর তরকারিপত্তর কদ্দুর কি থাকে, বলা যাচ্ছে না। তুমি খেয়ে নাও এই সঙ্গে। আমি খেতে বসব, সে সময় তুমি এদিকে থাকলে অনেক সুবিধা হবে।

জোর-জবরদস্তি করে তাকে বসালাম। পাতে লুচি পড়েছে, কেউ কেউ একটু-আধটু ভেঙে গালে দিচ্ছেন। বিষ্টু চক্রবর্তী দেখি হাত গুটিয়ে বসে আছেন।

পাশের লোক জিজ্ঞাসা করে, হল কি চক্রবর্তী মশায়?

আমি খাব না বাপু। বাপের শ্রাদ্ধ তো নয়—অজাত-কুজাতের

সঙ্গে খাইয়ে জাত মারবার ষড়যন্ত্র। ওর কি—আমাদের দফাটি সেরে কলকাতায় চলে যাবে দু দিন পরে।

বেশ চেঁচিয়েই বললেন তিনি। আমার দলে ছেলেরা ছিল—তারাও পাড়াগেঁয়ে ছেলে, শিষ্ট-সভ্য নয়। তারা রুখে উঠল, একপাশে একটু বসেছে, মাঝে দু-তিন হাত ফাঁক, এক সামিয়ানার নিচেও নয়—অত ঠুনকো জাত নিয়ে চলে না আজকাল। কসবায় যান তো মামলা করতে, হোটেলে পাতড়া পাড়েন, সেখানে কি হয়ে থাকে জিজ্ঞাসা করি।

আমি ছুটে গিয়ে করজোড়ে বললাম, দেখুন বাবার বয়সি বলতে আপনি একমাত্র বর্তমান। পিতৃস্থানীয় আপনি, কাকা বলে ডাকি—আমি তো আশা করি, আপনিই অভিভাবক স্বরূপ হয়ে সকলকে মানিয়ে নিয়ে চলবেন।

বিষ্টু চক্রবর্তী কাকুতি-মিনতি গ্রাহ্য করলেন না, রাগে গরগর করতে করতে উঠে দাঁড়ালেন। আরও দু-একজন উঠল তাঁর দেখাদেখি। আমি হাত জড়িয়ে ধরলাম।

তাদেরই বচসার ফলে দক্ষযজ্ঞ হতে যায় দেখে ছেলেরা বেকুব হয়ে গেছে। বিষ্টু চক্রবর্তী হুঙ্কার ছাড়লেন, উঠিয়ে দাও তবে শম্ভুকে—ঘাড় ধরে তাড়িয়ে দাও।

বলতে বলতে সারি ছেড়ে উঠানের প্রান্তে চলে এলেন। শম্ভুকে কিছু বলতে হল না, নিজেই সে উঠে এসে চক্রবর্তীর পথ আটকে দাঁড়িয়েছে।

যাচ্ছ কোথা ?

চক্রবর্তী থতমত খেয়ে দাঁড়ালেন। খাওয়া নেই, নাওয়ারও ফাঁক পায় নি শম্ভু। চেহারা দুশমনের মতো হয়েছে, কাঁসরের মতো গলার আওয়াজ।

ছোটবাবু বিদেশ-বিভূঁয়ে থাকে, তোমাদের কাণ্ডবাণ্ড দেখে তাজ্জব হয়ে গেছে। যাও, জায়গায় গিয়ে বোসগে—

চক্রবর্তী ক্ষীণ কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, জায়গায় বসে পড়ে ভোজ খেতে হবে ?

হ্যাঁ—

কি দেখলেন শম্ভুর মুখে, চক্রবর্তী সুড়সুড় করে আবার গিয়ে বসে

পড়লেন। শোনা গেল, অর্ধস্বগতভাবে বলছেন, জবরদস্তি করে নেমন্তন্ন খাওয়াবে? কি মুশকিল!

এদিক-ওদিক তাকালেন সহানুভূতির আশায়। কিন্তু সকলেই ইতিমধ্যে ঘাড় নিচু করে আহারে রত হয়েছেন, কেউ চেয়ে দেখলেন না। বিরস মুখে বসে পড়ে চক্রবর্তী আচমন করলেন। আমি হতভম্ব হয়ে গেছি। তারপর সামলে নিয়ে তাকিয়ে দেখি, শম্ভু ঐ যে উঠে পড়েছিল—আর এদিককার ত্রিসীমানায় নেই।

পুনশ্চ পরিবেশন আরম্ভ হল। শম্ভু না থাকায় চক্রবর্তীর কোট পুরোপুরি বজায় রইল, আর বলবার কিছু নেই। আমার বিষম অস্বোয়াস্তি লাগছিল। শম্ভু বেচারা সমস্তটা দিন খায় নি, আমিই জোর করে বসিয়েছিলাম, পাতা পেতে মাটির গেলাসে জল নিয়ে বসেছিল, লুচিও পড়েছিল পাতে, পাতা ফেলে চলে যেতে হল তাকে এমনি ভাবে। খুব রাগ হল ঐ চক্রবর্তীদের উপর। আমি আর থাকলাম না ওদিকে, ঐ নিমন্ত্রিতদের আপ্যায়নের জন্য থাকতে প্রবৃত্তি হচ্ছিল না আমার। শম্ভুর খোঁজে তার বাড়ি গেলাম।

বাড়িতে সে নেই। সমস্ত শুনে দিদি বিষম ব্যস্ত হল। তাই তো, গেল কোথায়? খিদে সে সইতে পারে না। একবার গাউটি পূজোর দিনে সকলের দেখাদেখি উপোস করতে গিয়ে মুখ থুবড়ে পড়েছিল সে রাস্তার উপর। কোথায় মুখ লুকাল আজকের এই অপমানের পর? খুঁজে খুঁজে আমরা হয়রান।

অবশেষে একটি ছেলে খোঁজ দিল। কাঠকুটো-রাখা চালাঘরের এক পাশে ছুটো খালি বস্তা পেতে সে অঘোরে ঘুমুচ্ছে। ভোজের ব্যাপার সমাধা হয়ে গেছে, গণ্ডগোল হৈ-চৈ আর নেই। শম্ভুকে ডেকে তুললাম। সলজ্জ হাসি হেসে সে বলল, খেতে দিল না, কাজকর্মও ছিল না কোন-কিছু। বসে বসে কি করব—ঘুমিয়ে নিলাম।

শম্ভুর মুখের দিকে চেয়ে অবাক হই। এক বিন্দু দুঃখ বা অপমানের ছায়া নেই সেখানে। চক্রবর্তী আপত্তি করেছেন, এ যেন অতিশয় স্বাভাবিক। বর্ষাকালে বৃষ্টি হলে আমরা বিস্মিত হই নে, এ ব্যাপারেও তেমনি মনে করবার নেই কিছু।

হাত ধরে নিয়ে যাচ্ছি। সে বলল, আর কেউ বাকি নেই তো? আবার গণ্ডগোল না বাধে।

বললাম, বাইরের সব হয়ে গেছে। নিজেরা যে ক-জন আছি এবার একসঙ্গে বসব।

শম্ভু বসে গেছে, আমি জোড়জোড় করে নিয়ে বসতে যাচ্ছি, ক্ষুদি এই সময় এসে উপস্থিত। শুকনো মুখে বলল, কোনখানে তো পাওয়া যাচ্ছে না মোড়লকে। খোঁজ পেলেন বাবু?

খেতে বসেছে।

খাচ্ছে? কোথায় বসেছে সে বাবু?

রণরঙ্গিণীর মতো ছুটে সে গোয়ালের ধারে গেল।

গলা দিয়ে ভাত নামছে এত কাণ্ডের পর? ঘেন্না করে না?

স্ত্রীর কাছে শম্ভুর ভিন্ন মূর্তি। চোখ পাকিয়ে বলল, ভর সন্ধ্যেবেলা কার হুকুমে এদ্দূর ভাঙাড় বেয়ে এলি শুনি?

একটু ঘাবড়ে গিয়ে ক্ষুদি বলে, বাড়ি এস।

ফ্যাচ-ফ্যাচ করিস নে বলছি। বেরো।

না—

সঙ্গে সঙ্গে শম্ভু জলের ঘটি নিক্ষেপ করল তার দিকে। ক্ষুদি সরে গেল, তাই লাগল না।

চলে যা হারামজাদি। উঠি তো আস্ত রাখব না তোকে।

ক্ষুদি কেঁদে পড়ল। আমায় সাক্ষি মেনে বলে, শুনলে ছোটবাবু? কি অন্যায় বলেছি যে দশের মধ্যে ঘটি ফেলে মারল আমায়?

শম্ভু গজাচ্ছে, ভুল হয়ে গেছে, শিকল তুলে দিয়ে আসি নি। ফাঁক পেয়েছে কি অমনি বেরিয়ে পড়বে।

ক্ষুদিকেও এক পাশে বসিয়ে খাইয়ে দিলাম। খাওয়া-দাওয়ার পর দু-জনে চলে গেল। অন্ধকার পথ—সঙ্গে একটা হেরিকেন দিয়ে দিলাম।

শ্রাদ্ধের কাজকর্ম চুকিয়ে তারপর বিষয়আশয় সম্বন্ধে বিলিব্যবস্থা করবার জন্য সদরে গিয়েছিলাম। ফিরে এসে সাংঘাতিক খবর শুনলাম। গরু কোরবানি নিয়ে ইতিমধ্যে ছোটখাট এক দাঙ্গা হয়ে গেছে গ্রামে।

শম্ভুর মাথায় চোট লেগেছে, সে শয্যাশায়ী। এতেই শেষ নয়—সামাদ মিঞা অর্থবান লোক, তার হাত থেকে গরু কেড়ে নিয়ে এসেছে, এ অপমানের সে শোধ তুলবে। ফৌজদারি করতে গেছে, টানা-হেঁচড়া এখন অনেক দূর অবধি চলবে।

আমি দেখতে গেলাম। ক্ষুদি কেঁদে ফেলল।

বিষ্টু চক্কোত্তি করল এটা। সকাল-সন্ধ্যে এসে ফিসফাস করত, তখনই জানি কাণ্ড ঘটাবে একখানা।

ন্যাকড়া দিয়ে মাথা বাঁধা অবস্থায় শম্ভু মাদুরের উপর নিঃসাড়ে শুয়ে ছিল। সেই অবস্থায় হুঙ্কার দিয়ে উঠল, এই ও—

আমি বললাম, সকলের আগে তোমারই বা মাথা বাড়িয়ে দেবার গরজটা কি ছিল শুনি? চক্কোত্তির গায়ে তো কই একটা আঁচড়ও লাগে নি। এর উপরে ঐ ফৌজদারির ব্যাপারে যদি পাঁচ সাতটা দিনও ঘোরাঘুরি করতে হয়, শুধু রোজ-গণ্ডার দিক দিয়েই তোমার কত লোকসান হবে হিসেব কর তো।

চুপ করে থেকে মনে মনে বোধকরি ক্ষতি লোকসানেরই হিসাব করল শম্ভু। তারপর মৃদু কণ্ঠে অনেকটা যেন নিজের কাছে কৈফিয়তের ভাবে বলল, কি করা যাবে? ভগবতীর হেনস্থা হিঁদু হয়ে চোখের উপর দেখি কি করে?

আমার কথাবার্তায় ক্ষুদি সাহস পেয়েছিল। মুখ ভেংচে শম্ভুর স্বরের অনুকৃতি করে বলল, হিঁদু। পাতের কোল থেকে ঘাড় ধরে তুলে দিল, তাদের সঙ্গে এখন সায় হিঁদুগিরি ফলাতে।

রক্ত চক্ষু মেলে শম্ভু ক্ষুদির দিকে তাকাল।

ফোড়ন কাটবি নে বলছি মাগি—

আমি বুঝিয়ে বলি, ওদের পাড়ার মধ্যে ওরা কি করছে না করছে—চোখে দেখবার জন্য দলবল নিয়ে না ঢুকলেই হত। সাহেবেরা এই যে হরদম গরু মারছে সৈন্যদের রসদ জোগাতে, তার কি প্রতিবিধান করতে পারছ?

শম্ভু বলে, পাড়ার মধ্যে হলে কি হয়—সাঁড়াতলার জমিতে কোরবানি করবে ঠিক করেছিল। চক্কোত্তি মশায়ের খাস জমি ওটা।

এই সেদিনও আমাদের ছোঁড়ারা শুব লাগোয়া চাতরার বিলে আউশ বুনে এসেছে। এ হল রেষারেষির ব্যাপার—বুঝতে পারলে না? আমরাই বা কম হলাম কিসে?

বলে সে চোখ বুজে পাশ ফিরে শুল। অর্থাৎ এ সম্বন্ধে আর কথা বাড়াতে ইচ্ছুক নয়।

ক-দিন পরে আবার শম্ভুর বাড়ি গিয়েছি, কানাচ থেকে সামাদ মিঞার গলা পেলাম। পৌজদারি রুজু করে দিয়ে সামাদ ফিরে এসেছে, সেই লোক শম্ভুর দাওয়ায় উঠে কথাবার্তা বলছে দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলাম। টাকা হয়েছে তালুক মুলুক হয়েছে—নিচু গলায় কথা বলার লোক সামাদ মিঞা নয়। আর এ নিয়ে রসভঙ্গ করতে ইচ্ছা হল না, ঐখানে দাঁড়িয়ে একটা বিড়ি ধরালাম।

সেদিনকার মতন প্রায় ক্ষদিরই সেই সুরে সামাদ বলছিল, ভাবি আমার হিঁদু বো। ঘরে ঢুকতে দেয়? শেয়াল-কুকুরের চেয়ে ঘেন্না করে, জল ফেলে দেয় যদি দাওয়ার উপর উঠিস। চক্কোত্তি-বাড়ি আমাদের মোছলমানের যেটুকু খাতির, তোদের তা-ও নয়।

শম্ভুর কণ্ঠ শুনতে পেলাম, ক্ষুদিকে ডেকে বলছে, কি করিস বউ? চৌকি এনে এখনো বসতে দিলি নে মিঞা সাহেবকে?

সামাদ মিঞা ঔদার্য ভরে বলে, থাকলামই না হয় একটু দাঁড়িয়ে। তাতে কি হয়েছে? শোন মোড়ল, মামলা তো দায়ের করে এলাম। তোমাদের পাড়ার কাউকে জড়াই নি। তা ওতায় পড়ে গিয়েছিলে, মনোগত ইচ্ছে কারো ছিল না। কেন হবে? ধরতে গেলে আমাদের সঙ্গেই সম্বন্ধ বেশি তোমাদের—যারা কাছে গিয়ে দাঁড়ালে বামুনেরা দুর-দুর করে। সাক্ষি দিতে হবে তোমাদের—বুঝলে তো? যেমন যেমন এসে বলেছিল চক্কোত্তি, সে নিজে দাঁড়িয়ে হুকুম দিয়েছিল—সমস্ত বলবে। চক্কোত্তি-পাড়ার পাঁচ জন আর তাদের চাকর-মাহিন্দার চার—মোট ন-টাকে আসামি করেছি। যা সমস্ত শিখিয়ে দেব, পারবে তো বলে আসতে?

শম্ভু হাঁক দেয়, ওরে বউ, কলকেটায় তামাক ধরিয়ে দিয়ে যা মিঞা সাহেবকে।

দেখা না দিয়ে আমি সরে পড়লাম। দেখলে হয়তো লজ্জিত হত। মনটা খারাপ হয়ে গেল। কাজকর্ম মিটিয়ে বেরুতে পারলে বাঁচি। এদের এই গেঁয়ো ঘোঁট একেবারে অসহ্য আমার কাছে।

মামলার দিন পড়েছে। ইতিমধ্যে একদিন বিষ্টু চক্রবর্তীর পদধূলি পড়ল আমার বাড়ি। পড়বে তা অনুমান করেছিলাম। এসে তিনি হাহাকার করে পড়লেন।

গেল, গেল—এ জাতের দফা নিকেশ হয়ে গেল, আর আশা নেই। তুমি আমি হা-হুতাশ করে কি করব? শুনেছ তো মোড়লপাড়ার ওদের কাণ্ড? হিঁদু হয়ে হিঁদুর মুখে চুনকালি দিতে ছুটছে সদরে। তুমি একটু বলে দাও না শম্ভুকে—পাড়ার সবাই ওর কথা শোনে।

আমি ঘাড় নাড়লাম। আমায় এ সবের মধ্যে জড়াবেন না কাকা, আমি কোন পক্ষে নেই। আর আমার কথা যদি শোনেন, মিটমাট করে নিনগে সামাদ মিঞার সঙ্গে। অনেক তো হল। দেশ স্বাধীন হতে যাচ্ছে, অনেক কিছু করবার আছে আমাদের। নিজেদের মধ্যে এই সব মারামারি ছেড়ে দিন এবার।

অনেকবার অনেক রকমে বলেও ভরসা না পেয়ে চক্রবর্তী অবশেষে বিরস মুখে উঠে গেলেন।

ইমান আলি ফকিরের ওখানে বাৎসরিক মেলা, সেই উপলক্ষে জারি গান হবে। ফকির নিজে ঘুরে ঘুরে ইতর ভদ্র সকলের নিমন্ত্রণ করে গেছেন। গান শোনার শম্ভুর বড় পুলক! সন্ধ্যা অবধি সে কাজকর্ম করে। পাড়া-গাঁয়ের ছুতোরগিরি—শহরের ছুতোরের কাজ দেখে কেউ আন্দাজ করতে পারবে না। এক বিশাল কাঁঠাল গাছ বড় করাত দিয়ে চার ফালি করা আছে, তাই এনে সামনে ফেলে দিল—চৌকাঠ গড়ে দাও মিস্ত্রি। বাইশ ধরে সমস্তটা দিন কুপিয়ে তবে তা থেকে এক খণ্ড সাইজে এল। কাঠের কুচি এই পর্বত প্রমাণ হয়েছে, গৃহস্থের দশ বারো দিন উনুন জ্বালানো চলবে ঐ কাঠে। সারাদিন এমনি কাঠ কুপিয়ে সন্ধ্যাবেলা বাড়ি ফেরে শম্ভু। বাড়ির সামনে ডোবা—শেওলাগুলি সরিয়ে, স্নান সেরে আসে সেখান থেকে। তারপর ভাত খেয়ে গান শুনতে বেরিয়ে পড়ে।

কীর্তন যাত্রা জারি ঢপ—যে রকম গান যত দূরেই হোক, সে যাবে। তিন ক্রোশ চার ক্রোশ দূর অবধি চলে যায়। নিতান্ত কোন-কিছুর খবর না পেলে পাশের গ্রামে এক যাত্রার দল করেছে—তাদের আখড়ায় গিয়ে পেরাক্ত শোনে। 'শোনে' বললে ঠিক হয় না—গান শুনবার নাম করে বেরোয় বটে, কিন্তু গিয়েই ঘুমোতে শুরু করে। ঠেস দেবার কিছু না পেলে অমনি খাড়া অবস্থায় ঘুমোয়, সে অভ্যাসও আছে। নাসা-গর্জনও হয় মাঝে মাঝে। আসর ভাঙবার মুখে কেউ ডেকে জাগিয়ে দেয়, ওরে শম্ভু ওঠ্—গান তো খুব শুনলি, বাড়ি যা এবার। ঘুম-চোখে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে শম্ভু বাড়ি গিয়ে ওঠে। দোর খোলবার জন্ম ক্ষুদিকে ডাকাডাকি করে কষ্ট দেয় না, তার এক উপায় করেছে। বেরুবার সময় ক্ষুদিকে ঘরে ঢুকিয়ে তালাচাবি দিয়ে যায়। ফিরে এসে তালা খুলে ঢুকে পড়ে।

শম্ভু গেছে ফকির-বাড়ি। আসর থেকে কিছু দূরে এক চারা আমতলা পছন্দ করে সেইখানে গামছা পাতল। গান শুনতে অসুবিধা হবে অত দূর থেকে—কিন্তু বুঝতে পারলাম, নিরালায় আরামে ঘুমোতে পারবে, এইটেই হল ঐ জায়গা পছন্দের কারণ। একটা ছোকরাকে দিয়ে ডাকিয়ে আমি তাকে কাছে এনে বসালাম। বসেই সে দীর্ঘচ্ছন্দে একবার হাই তুলল। একটা ব্যাপার দেখে অবাক হলাম। অনতি-দূরে এক বেঞ্চির উপর পাশাপাশি বিষ্টু চক্রবর্তী ও সামাদ মিঞা। ফকির সাহেব তটস্থ তাঁদের সামনে। মুহুর্মুহু তামাক আসছে। পান কিনে কিনে এনে দিচ্ছে। কি কথাবার্তা বলছেন আর হাসাহাসি করছেন দু-জনে। একবার শম্ভুর দিকে নজর পড়ল। দেখি, ঘুম উবে গেছে, কটমট করে তাকিয়ে আছে সে ওদের দিকে।

গান ভাঙলে ফিরে চলছি। শম্ভু আছে সঙ্গে। চলতে চলতে শম্ভু বলল, কানাঘুসো শুনতে পেলাম ছোটবাবু, সামাদ মিঞা নাকি নিকারির বাঁধাল চক্কোত্তি মশায়কে বন্দোবস্ত দিচ্ছে। গরিবুল্লা নিকারির 'পরে চক্কোত্তির রাগ, হাটের মধ্যে একবার খালুই থেকে মাছ ঢেলে নিয়েছিল। বাগে পেলে ওদের দেখে নেবে। শুনছি, চাঁদাডাঙার জেলেরা এরই মধ্যে হাঁটাহাঁটি লাগিয়েছে চক্কোত্তির কাছে।

আমি বললাম, বাজে কথা। নিকারি-পাড়ার পীর-পয়গম্বর হল সামাদ মিঞা—খাজনা বলে যে যা দেয়, তাই খুশি হয়ে নেয়। এত টান জাত-ভাইয়ের উপর—তাদের যে চক্কোত্তির হাতে তুলে দিচ্ছে, বিশেষ সেদিনের অত কাণ্ডের পর—এ আমার বিশ্বাস হয় না শম্ভু।

খানিকটা পিছনে চক্রবর্তীর গলা পাচ্ছিলাম। ওঁরাও বাড়ি যাচ্ছেন। দাঁড়িয়ে গেলাম। কাছে এলে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনাদের মিটমাট হয়ে গেছে বুঝি কাকা? বেশ হয়েছে, চমৎকার হয়েছে।

বিষ্টু চক্রবর্তী বললেন, তুমি বললে কথাটা—ভেবে দেখলাম, তাই উচিত। সামাদ মিঞা মামলা তুলে নিয়েছে। আমিও সাঁড়াতলার ভুঁইটা লেখাপড়া করে দিলাম ওকে।

হেসে উঠে বলতে লাগলেন, মিঞা পাড়াটা গাঁয়ের ভিতরেই একটা পাকিস্তান হল আর কি। ওখানে যাচ্ছে-তাই করুকগে ওরা, তাকিয়ে দেখব না। ভুঁইটুকুর জন্য যেতে হত সেটা একেবারে ঘুচিয়ে দিলাম।

তা তো হল। সামাদ মিঞা এর পর নিকারিদের কাছে মুখ দেখাবেন কি করে?

চক্রবর্তী বললেন, তা জানি না, জুম্মাঘর করে দেবে ঐ সাঁড়াতলার ভুঁইয়ে। সমাজে কত নাম হবে—ত্রুদশ ঘর হাজারে নিকারি কি বলল না বলল, তাতে কি আসে যায় সামাদের? সে যাক গে বাবা, সামাদের ব্যাপার সামাদ বুঝবে—আমায় যা বলেছিলে আমি তো করলাম। স্বাধীন হতে যাচ্ছি, কত কি দায়িত্ব এসে পড়ছে, হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা করে আর মরব না।

শম্ভু জিজ্ঞাসা করে, আমরা স্বাধীন হচ্ছি চক্কোত্তি মশায়?

হ্যাঁ, হ্যাঁ—কত সুখ হবে দেখিস। কোন কষ্ট থাকবে না।

শম্ভু পরমোৎসাহিত হয়ে উঠল, কথার ভাবে টের পেলাম। সহানুভূতির একটুখানি স্পর্শে গলে গিয়ে আমায় বলতে লাগল, কি কষ্টে যে আছি ছোটবাবু। খাওয়ার চাল জোটানো যায় না, পরবার একটু তেনা নেই। এই এক কাচা পরে চালাচ্ছি আজ আট মাস। সামাদের ছেলে আব্বাস মিঞা হল কাপড় দেবার কর্তা। ন-মাসে ছ-মাসে যদিই

যা দু-দশ জোড়া কাপড় এল, মিঞা-পাড়ায় দিতেই ফুরিয়ে যায়—এ অবধি পৌঁছয় না।

চক্রবর্তী ভরসা দিয়ে বললেন, এবারে সে ভয় নেই রে! দেশ স্বাধীন হয়ে গেল। ওদের হাতে কিছু থাকছে না আর—

শম্ভু সভয়ে বলে, তুমি কর্তা হচ্ছ বুঝি চক্কোত্তি মশায়?

আমি হই কি আমাদের নিতাই হয়—সে একই কথা। মোটের উপর পাড়ার মধ্যে থাকবে। ভাইয়ে ভাইয়ে বনিবনাও না হলে বাঁটোয়ারা হয়ে যায় জানিস তো? তাই হচ্ছে আমাদের। চাটগাঁ-ঢাকায় গিয়ে ওরা মাতব্বরি ফলাক গে—হেঁ হেঁ, এ পাইতকে আর নয়।

আর একটি কথা বলল না শম্ভু। এই সময়ে বাঁ-হাতি বাড়ির রাস্তায় সে মোড় নিল। জ্যোৎস্নার আলোয় দেখলাম, সে ঝিমোতে ঝিমোতে চলেছে।

তারপর সেই পরম দিন এল—১৫ই আগস্ট। যে দিন স্বাধীন হলাম। খুব জাঁকালো উৎসব হল গ্রামে। সহজ ব্যাপার নয়—মনে করুন, কত রকম নির্যাতন ভোগ করতে হয়েছে এই দিনের প্রত্যাশায়। বিষ্টু চক্রবর্তী সমস্ত সাধারণ কাজে মাতব্বরি করেন, এ ব্যাপারেও মোটা চাঁদা দিয়েছেন। খাটছেনও খুব। তাঁর হাত এড়াতে না পেরে ক-দিনের জন্য আমি কলকাতায় গিয়ে মাঝারি গোছের একজন বক্তাকে নিয়ে এসেছি সভাপতিত্ব করবার জন্য। বড়দের কাউকে পাওয়া গেল না—বলতে গেলে প্রাণ-সারা অবস্থা তাদের, এক একজনকে চারটে পাঁচটা মিটিঙের তাল সামলাতে হবে। এমন দিনে এই ধাপধাড়া-গোবিন্দপুর জায়গায় আসতে যাবেন কেন? যাঁকে নিয়ে এসেছি তিনিও অবশ্য কম যান না। ফাঁসিকাঠে ঝুলতে ঝুলতে বেঁচে গিয়েছিলেন, পুলিস বেদম পিটেছিল। জামা খুললে পিঠের উপর তার চিহ্ন মেলে হয়তো আজও।

কিন্তু সভাক্ষেত্রে গিয়ে দেখি, সামান্য লোক হয়েছে, তার অধিকাংশই নাবালক শিশু। পাঠশালার ছুটি ছিল স্বাধীনতা-লাভের উপলক্ষে। কাজেম পণ্ডিত এখনো আছেন—বয়সের ভারে দেহ বেঁকে গিয়েছে,

শনের মতো সাদা চুল-দাড়ি। তাহলেও প্রতাপ অব্যাহত আছে এখনো তাঁর। চক্রবর্তী বলে দিয়েছিলেন, ছেলেদের যথাসময়ে সভায় হাজির করে দেবার দায়িত্ব তাঁর উপর। তদনুযায়ী সব ছেলে ধোপদস্ত কাপড় পরে এসেছে—পাঠশালা পরিদর্শনের জন্য যেদিন ইন্সপেক্টরের শুভাগমন হয় সেদিন যেমন তারা সাফসাফাই হয়ে আসে তেমনি। পাঠশালায় হাজির হয়ে ছিল সবাই, সেখান থেকে পণ্ডিত তাদের সভাক্ষেত্রে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন। জোড়া বাঁধন ছাটি যথারীতি হাতে আছে—ছাত্রদের মাঝখানেই পণ্ডিত বসেছেন. মাঝে মাঝে যখন গণ্ডগোল বেশি হচ্ছে, পণ্ডিত মাটির উপর সশব্দে ছাটের বাড়ি মেরে বলছেন, এই—। ছেলেরা সভয় দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে কাজেম পণ্ডিতের দিকে। এই ধরনের ছেলেগুলোর জন্যই কি এমন একজন বক্তাকে নিয়ে এসেছি কলকাতা থেকে? দেখলাম, বক্তাও বিরক্ত হচ্ছেন। অনেকবার শুনেছি এঁর বক্তৃতা, ভাল ভাল কথার ঝঙ্কারে আবেগময় সুরে যেন ঘোড়া ছুটিয়ে চলে যান। এই শিশুরা তার এক বর্ণ বুঝবে না।

বিষ্টু চক্রবর্তীকে একান্তে নিয়ে বললাম, মানুষজন জমেছে কই কাকা?

চক্রবর্তী বললেন, এই একটু ভয় পাচ্ছে। যাত্রাগান-টান হলে মানুষ ভেঙে পড়ত। বক্তৃতা আরম্ভ হলে আবার কিছু হবে।

আমি রাগ করে বললাম, আমাকে কলকাতায় পাঠিয়ে দিয়ে ঘুমুচ্ছিলেন আপনারা নাকে সর্ষের তেল দিয়ে। ভাল প্রচার হলে নিশ্চয় আসত অনেকে।

চক্রবর্তী বললেন, হাটে হাটে ঢাড়া দিয়েছি যে দেশ স্বাধীন হয়ে যাচ্ছে! হ্যাণ্ডবিল বিলি করা হয়েছে। হপ্তা ভোর খবরের কাগজ পড়িয়ে শোনানো হচ্ছে হরিগোলায় বসে। আর কি করতে হবে? পায়ে ধরে বলতে হবে নাকি যে আপনারা সভায় এস। তা-ও হয়েছে। কাজেম পণ্ডিতকে হুকুম দিয়ে দিয়েছি। শম্ভু মোড়লকে বলেছি, কেউ যেন কাজে না বেরোয়—মোড়লপাড়ার সবাইকে জুটিয়ে নিয়ে আসবি সভায়। না এলে আমি কি করব বাপু?

বক্তাকে না জানিয়ে আমি ও চক্রবর্তী পাড়ায় বেরুলাম লোক

ডাকাডাকি করতে। শম্ভু কতদূর কি করেছে—তার উঠানেই আগে গেলাম।

শম্ভু, ওরে শম্ভু—

অনেক ডাকাডাকির পর ক্ষুদি বেরিয়ে এসে বলল, ঘুমুচ্ছে—

চক্রবর্তী রাগ করে উঠলেন।

ঘুমুচ্ছে কি রে? এমন একটা দিন—আর ঘুমুচ্ছে এখন? বোঝ বাবাজি, তা হলে মানুষ হবে কোত্থেকে? সামাদ মিঞারা এল না, সে না হয় বুঝতে পারি। তাদের আর জুত খাটবে না, সেই দুঃখে এল না। কিন্তু এদের দায়িত্বজ্ঞান দেখ তো—

চক্রবর্তীর উপর ক্ষুদির রাগ আছে সেই আমার বাড়ির ভোজের ব্যাপার থেকে। বলল, তা চক্কোত্তি মশায়দের সভা ওঁরাই করুন গে ছোটবাবু, আমাদের কি?

আমি বললাম, সে হয় না। ডেকে তুলে দাও। আমার নাম করে বলোগে তুমি।

সজোরে ঘাড় নেড়ে ক্ষুদি বলল, পারব না বাবু। এই এত বেলা অবধি কাঠ কুপিয়ে ফিরেছে। চাল বাড়ন্ত ছিল, চাট্টি খই খেয়ে ঘুমিয়েছে। জেগে উঠলে খিদের জ্বালায় সমস্ত ভেচে-চুরে তছনছ করবে।

গভীর নাসাগর্জন উঠল ঘরের মধ্য থেকে। সচকিতে আমি ও চক্রবর্তী দরজার দিকে তাকালাম। প্রকাণ্ড পাহাড় যেন ভূমিশায়ী হয়ে আছে মেজের উপর। চক্রবর্তী বলে উঠলেন, মরে ঘুমুচ্ছে যেন বেটা।

আমি তাঁর হাত ধরে টানলাম।

ও কুম্ভকর্ণকে জাগিয়ে কাজ নেই কাকা। খিদের চোটে তোলপাড় করবে। চলুন, নিজেরাই মীটিং করিগে। ঠাণ্ডা হয়ে শোনা যাবে সমস্ত কথা। ছেলেপিলেগুলো রয়েছে—তা তাদের মধ্যে কাজেম পণ্ডিত মশায়ও বসে আছেন বেত নিয়ে, গোলমাল হবে না।

মাথুর

মাসখানেক মাত্র নিরুদ্দেশ থাকিয়া উমানাথ বাড়ি ফিরিয়াছে কাল রাত্রে। এত শীঘ্র ফিরিবার কারণ, মঠবাড়িতে মেলা লাগিয়াছে, ভাল ভাল কীর্তনিয়ারা আসিয়াছে, বিশেষ করিয়া এবার সোনাকুড়ের বালক-সঙ্কীর্তনের আসিবার কথা। খবরটা কাকপক্ষীর মুখে কি করিয়া তাহার কানে পৌঁছিয়াছিল।

বড় ভাই ক্ষেত্রনাথ দাওয়ায় বসিয়া সকালবেলার মিষ্ট রোদ সেবন করিতে করিতে একখানা দলিলের পাঠোদ্ধারের চেষ্টায় ছিলেন। দলিলটি বহু পুরানো, পোকায় কাটা, জায়গায় জায়গায় ছিঁড়িয়া এমন পাকাইয়া গিয়াছে যে, এক একটা জট খুলিতেই একটি বেলা লাগে।... উমানাথ সোজা সেইখানে উঠিয়া তড়বড় করিয়া আপনার বক্তব্য বলিতে লাগিল।

বিস্মিত চোখে ক্ষেত্রনাথ একবার মুখ তুলিয়া দেখিলেন। কথা শেষ হইলে প্রশ্ন করিলেন, জগদ্ধাত্রীর বাড়ি কবে গিয়েছিলে?

কুড়ি-বাইশ দিন আগে।

হৃদয় ছিল সেখানে?

না।

হুঁ—বলিয়া ক্ষেত্রনাথ চুপ করিয়া নিজের কাজ করিতে লাগিলেন। তারপর হাতের দলিল সযত্নে ভাজ করিয়া রাখিয়া বলিলেন, আমি জগদ্ধাত্রীর চিঠি পেয়েছি পরশুদিন। এখন তোমার ঐ বিশ দিনের বাসি খবর শুনে লাভালাভ নেই।

দলিল বাক্সবন্দি করিয়া ধীরে সুস্থে পরম নিশ্চিন্তভাবে তিনি তামাক ধরাইয়া বসিলেন। এবার বলিবার পালা তাঁহার। কণ্ঠ চিরদিনই প্রবল, আজও তাহার অন্যথা হইল না। বাক্যের তূণ একেবারে নিঃশেষ হইয়া গেলে ক্ষেত্রনাথ অন্য কাজে চলিয়া গেলেন, তাহার পরেও উমানাথ সেখানে একই ভাবে বসিয়া রহিল।

ঘণ্টা দুই পরে বাড়ির মধ্যে গিয়া তরঙ্গিণীর মুখোমুখি দেখা। তরঙ্গিণী ভালমানুষের ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, বট্‌ঠাকুরের সঙ্গে কি কথা হচ্ছিল ?

অর্থাৎ এবার দ্বিতীয় কিস্তি। উমানাথ চুপ হইয়া রহিল।

তরঙ্গিণী আবদারের ভঙ্গিতে মোলায়েম সুরে বলিতে লাগিল, তা বল, বল না গো—মেয়েমানুষ, ঘরের কোণে পড়ে থাকি, কামাই-ঝামাই করে এলে এদ্দিন পরে, ভালমন্দ কত কি নিয়ে এলে, দেখে এলে, শুনে এলে—বল না দুটো কথা, শুনি—

উমানাথ বলিল, জগদ্ধাত্রী-দিদি ওঁরা দেশে ঘরে ফিরেছেন, তাই বলছিলাম দাদাকে—

গুরুকন্যে ? মস্তবড় খোশখবর, গামছা বখশিস দিই ? তরঙ্গিণী হাসিয়া যেন গলিয়া পড়িতে লাগিল। গামছা হাতে সে মাথা মুছিতে-ছিল, সেটাকে পরম পুলকে স্বামীর দিকে আগাইয়া ধরিয়া বলিতে লাগিল, পুরুষের তো সুবোধ হল না যে জন্মের মধ্যে পরিবারের হাতে একটা কিছু দিই এনে তা আমি দিচ্ছি এই গামছাখানা বখশিস—

মনে মনে আহত হইয়া উচ্চকণ্ঠে উমানাথ বলিল, গামছা বখশিস কেউ আমায় দেয় না।

তরঙ্গিণী তৎক্ষণাৎ স্বীকার করিয়া লইল, না, তা-ও দেয় না। হাসিয়া কহিতে লাগিল, গামছা তো দেয় না, উত্তম-মধ্যম দেয় কি-না বোলো তো একদিন—

উমানাথ এ কথায় একেবারে ক্ষেপিয়া গেল। মহামিথ্যুক তোমরা। বখশিসের কত শাল দোশালা এনে দিয়েছি এ-যাবৎ, তবু বার বার ঐ কথা। উত্তম-মধ্যম দেয় --দিলেই হল অমনি। ডাকো দিকি দশগ্রামের সভা, ডাকো একবার এদিককার যত কবিওয়ালা—

বলিতে বলিতে উত্তেজনার মুখে কবিতা বাহির হইয়া আসিল—

> হরেক কবি হরবোলা
>   সবার উপর ময়রা ভোলা,
> তাঁর শিষ্য সহায়রাম,
>   গুরুর পায়ে কোটি প্রণাম—

গুরু সহায়রামের উদ্দেশে প্রণাম করিয়া সে কিঞ্চিৎ শান্ত হইল।

তরঙ্গিণী কিন্তু একবিন্দু রাগ করে নাই তেমনি হাসিভরা মুখ। খানিক পরে উমানাথের রাগ পড়িয়া আসিলে পুনরপি প্রশ্ন হইল, ঠাকরুনের ওখানে স্থিতি হয়েছিল ক'দিন, ওগো?

উমানাথ সদম্ভে বলিতে লাগিল, ক'দিন আবার, যাবার পথেই পড়ল বলেই তো। দলের সমস্ত লোক হাটখোলার পাশে উনুন খুঁড়ে নিল, আমি তো তা পারি নে? হাজার হোক পজিশন আছে একটা—

বলিয়া পজিশন মাফিক গম্ভীর হইল।

তবু তরঙ্গিণী সমীহ করিল না। বলিল, তা জানি। কিন্তু জিজ্ঞাসা করছি, পজিশনটা টিকল কি করে? অতিথ হলে হাতজোড় করে গিয়ে তাঁর উঠোনে দাঁড়ালে?

কথাবার্তার ধরনে মনে মনে শঙ্কিত হইলেও উমানাথ মুখের আস্ফালন ছাড়িল না।

আমার বয়ে গেছে। হঠাৎ দেখা হল, তারপর আমারই হাত ধরে টানাটানি। সে কি নাছোড়বান্দা! কিছুতে শুনবে না—

তারপর?

তারপর বিরাট আয়োজন। জগদ্ধাত্রী দিদি আর বাকি রাখেন নি কিছু। দুধ-ঘি সন্দেশ-রসগোল্লা মাছ-মাংস বাটির পর বাটি আসছে পাতের ধারে। ফুরোয় না—

গম্ভীর কণ্ঠে তরঙ্গিণী কহিল, খাওয়া-দাওয়ার পরে?

উমানাথ চমকিয়া গেল। ঝড় প্রত্যাসন্ন। সে পলাইবার পথ খুঁজিতে লাগিল। কিন্তু তাহার আবশ্যক হইল না। ছোটবউ আসিয়া ঢুকিল; তার পিছনে মেজবউ। দু'টিই অল্পবয়সি। ক্ষেত্রনাথের মেজ ও ছোট ছেলের বউ। বিয়ে এই বছর দুই-তিন মাত্র হইয়াছে।

জলচৌকির পাশে তেলের বাটি নামাইয়া রাখিয়া ছোটবউ বলিল, নাইতে যান কাকাবাবু, রাত্তিরে তো উপোস করে আছেন। ঘুমিয়ে পড়েছিলাম—তা, আমাদের ডাকতে পারলেন না—এমনি আপনি। একদৌড়ে নেয়ে আসুন—নয় তো দেখবেন কি করি—

এই বলিয়া দু'টি বউ মুখোমুখি চাহিতেই ছোটবউ খিল-খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

দেয়াপাড়া-ঝাপ্তলগাছি অঞ্চলে যাঁহাদের গতায়াত আছে, উমানাথ চাটুজ্জে অর্থাৎ ছোট-চাটুজ্জের পরিচয় তাঁহাদিগকে দিবার দরকার নাই। বর্ষার সময়টা এই সর্বসমেত মাস চারেক বাদ দিয়া বাকি দিনগুলি ছোট-চাটুজ্জের দলের গাওনা লাগিয়াই আছে। দলটা কিন্তু হিসাবমতো উমানাথের নয়, সে বাঁধনদার মাত্র। এবং খাহাখরচ ও টাকাটা-সিকেটা ছাড়া প্রাপ্তিও এমন কিছু নাই। তাই ঘর-বাহিরের ক্রমাগত হিতোপদেশ শুনিতে শুনিতে এক এক সময়ে উমানাথ প্রতিজ্ঞা করিয়া বসে, ছোট লোকের সমাজে ছড়া কাটিয়া বেড়াইয়া পিতৃপুরুষের মান ইজ্জত যা ডুবিয়াছে তা ডুবিয়াছে—আর ডুবাইবে না। দিন কতক বেশ চুপচাপ কাটিয়া যায়, সে দিব্য বাড়ি বসিয়া খাইতেছে, বেড়াইতেছে, ঘুমাইতেছে,—হঠাৎ কেমন করিয়া খবর উড়িয়া আসে, অমুক গ্রামে ভারি হৈ-চৈ—তিন দলে কবির লড়াই, কাতিক দাস তার শিষ্য অভয় চরণ আর বেহারী ঢুলিকে লইয়া পুব অঞ্চলের সমস্ত বায়না ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া আসিতেছে। পরদিন সকাল হইতে আর ছোট-চাটুজ্জের সন্ধান নাই, খেরো-বাঁধা খাতাখানাও ঐ সঙ্গে অন্তর্ধান করিয়াছে।

বিকালের দিকে মঠবাড়ি হইতে খোলের আওয়াজ আসিতে উমানাথ শশব্যস্তে ঘরে ঢুকিয়া চাদর কাঁধে ফেলিল। বগলে যথারীতি গানের খাতা রহিয়াছে।

দাঁড়াও ছোটদাদু, আমি যাচ্ছি।

ছ-সাত বছরের নিতাইচন্দ্র, কাল মারামারি করিতে গিয়া ফুলপাড় শৌখিন ধুতিখানার ক'জায়গায় ছিঁড়িয়া আসিয়াছে, তরঙ্গিণী তাহাই মেরামত করিতে লাগিয়াছে। উবু হইয়া বসিয়া বসিয়া নিতাই মনোযোগের সঙ্গে শিল্পকার্য দেখিতেছিল, তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল. আজকে আর থাক রাঙাদিদি, উ-ই দাও। ছোটদাদু মেলায় যাচ্ছে, আমি যাব—

তরঙ্গিণী মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল, যাও তাই। ছোটদাদু সন্দেশ কিনে খাওয়াবে।

তারপর তরঙ্গিণী নাতিকে কাপড় পরাইয়া সুন্দর করিয়া কোঁচা

দিয়া দিল। গায়ে পরাইয়া দিল সবুজ একটি ছিটের জামা। ফুটফুটে মুখখানি অতি যত্নে আঁচলে মুছাইয়া মুগ্ধচোখে কহিল, বর-পাত্তোরটি চলছেন। বউ নিয়ে আসা চাই কিন্তু নিতু বাবু।

উদ্দেশ্যে কিল তুলিয়া নিতু বলিল, বুড়ি।

বুড়ি বলেই তো বলছি মাণিক। কাজ করতে পারি নে, তোমার কাকীবা মনে মনে কত রাগ করে। এমন বউ নিয়ে আসবে যে দু-বেলা আমাদের কাজকর্ম রান্নাবান্না করে খাওয়াবে, কোলে করে সকাল-বিকাল তোমায় পাঠশালায় দিয়ে আসবে। কেমন?

নিতু লজ্জা পাইয়া একদৌড়ে পলাইয়া গেল। তারপর হাসিতে হাসিতে উমানাথের দিকে ফিরিয়া বলিল, তুমিও একটা জামা গায়ে দাও। শীতের দিন—এতে মহাভারত অশুদ্ধ হবে না গো—

উমানাথের অত অবকাশ নাই। কাঁধের চাদরের উপরেই একটা কামিজ ফেলিয়া সে পা বাড়াইল।

পিছন হইতে তবু বাধা। শোন—

তরঙ্গিণী কহিতে লাগিল, ভাসুর ঠাকুর খেতে বসে বড্ড দুঃখ করছিলেন। আমায় শুনিয়ে শুনিয়ে সব বলছিলেন—

ভূমিকার রকম দেখিয়া উমানাথের মুখ শুকাইল। এক কথায় হাঁ-না করিয়া সরিয়া পড়িবার ব্যাপার ইহা নহে। ওদিকে খোল-করতালের ধ্বনি ক্ষণপূর্বে থামিয়া গিয়াছে। অর্থাৎ গৌরচন্দ্রিকা সারা হইয়া নিশ্চয় এবার পালা আরম্ভ হইল।

তরঙ্গিণী বলিল, তুমি সাতেও থাক না, পাঁচেও থাক না। অমন দাদা—বাপের মতন বললেই হয়—তাঁর সঙ্গে এ সবের কি দরকার ছিল বল তো?

উমানাথ সাহস সঞ্চয় করিয়া বলিল, কিন্তু কথাটা মিথ্যে নয়। সহায়রামের ভিটে থেকে এক সবাসেই বিক্রি হয় বছরে কত টাকার? এত কাল জগদ্ধাত্রী-দিদি বিদেশে পড়ে ছিলেন, নিতে-থুতে আসেন নি —এখন কিছু না দিলে চলবে কেন?

তরঙ্গিণী ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া তীব্রকণ্ঠে কহিল, এই যুক্তিগুলো কার শেখানো? জমাজমি আমাদের কি আছে না আছে—কোন দিন

তুমি চোখ মেলে দেখেছ, না খবর রাখ? জগদ্ধাত্রী-দিদির মায়ায় আজ বড্ড টনক নড়ল। আর তাও বলি, অনাথা বিধবা মানুষ—নিজের পেটে ভাত জোটে না, নেমন্তন্ন করে চর্বচোষ্য খাইয়ে এই যে ভাইয়ে ভাইয়ে ঘর ভাঙাবার মতলব—এ দুষ্টবুদ্ধি কি জন্যে তোর?

কিন্তু শেষ কথাগুলি উমানাথ বোধকরি শুনিলই না। সহসা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। কহিতে লাগিল, সত্যি বউ, দিদি বড্ড অনাথা, সত্যিই তাঁর পেটে ভাত জোটে না। সমস্ত শুনেছ তা হলে? কোত্থেকে শুনলে?

তরঙ্গিণী আঙুল তুলিয়া দেখাইল।

ঐ ভাঙা দেরাজটা খুলে দেখ। দেশে এসেছেন শ্রাবণ মাসে, সেই থেকে হপ্তায় হপ্তায় চিঠি। হৃদয় ঠাকুর-পো পৈতৃক শত্রুতা সাধতে লেগেছে, ও-ই হয়েছে আজকাল মন্ত্রী। সে যা শিখিয়ে দেয়, ঠাকরুন তাই-লেখেন।

উমানাথ আর্দ্র স্বরে বলিল, কিন্তু অবস্থা দিদির সত্যিই বড় খারাপ। সাক্ষি আমি নিজে। নিজের চোখে দেখে এসেছি। দেখে জল আসে চোখে।

তারই মধ্যে তো এই নেমন্তন্ন-আমন্ত্রণ দুধ-ঘি মিষ্টি-মিঠাই। বুঝতে পার? ওগো বুদ্ধিমন্ত মশাই, মানে বোঝ এর? তরঙ্গিণী সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাহিল।

কিছু না, কিছু না। উমানাথ ঘাড় নাড়িয়া কহিতে লাগিল, সমস্ত বাজে কথা বউ, আমি ওঁর বাড়ি নিজেই গেছলাম। খেতে বসেছি হঠাৎ বৃষ্টি এল। তারপর বাইরের বৃষ্টি থামল তো ঘরের বৃষ্টি আর থামে না। ভাতের থালা নিয়ে কোথায় গিয়ে বসি—লজ্জায় দুঃখে দিদি মুখ তুলতে পারেন না। আর সেই মোটা মোটা বীরপালা চালের ভাত—সহায়রাম রায়ের মেয়ে, গুরু সহায়রামকে গড় না করে তিনটে জেলার কেউ কবির আসরে নামতে সাহস করে না—তাঁর মেয়ের এই রকম হাল। বলিতে বলিতে উমানাথের কণ্ঠ ভারি হইয়া আসিল, হঠাৎ অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া জামাটা পরিয়া লইবার অত্যন্ত তাড়াতাড়ি পড়িয়া গেল।

গান চলিতেছে। বকুল ও মাধবীলতার কুঞ্জবন, তাহারই পাশে হাটু গাড়িয়া বসিয়া মূল-গায়েন মুখরা বৃন্দাদূতীর বিদ্রূপ-বাণী বিনাইয়া বিনাইয়া বলিতে লাগিল—

বৃন্দা কহিতেছে, সুখে আছ তো মথুরার রাজা? তোমার নব-সঙ্গিনীকে পাশে লইয়া ত্রিভঙ্গ ঠামে একবার দাঁড়াও—দেখি, বাঁকা-শ্যাম আর কুব্জা-নায়িকায় মিলিয়াছে কেমন? মনে কি পড়ে বন্ধু, কোথায় কবে এক রাখাল ছেলে বাঁশী বাজাইত—আর কাঞ্চনলতা কুলের বধূ কুল ভাসাইয়া কলসি ভাসাইয়া ছুটিয়া আসিয়া পায়ে লুটাইত? আজিকার এই সুখবাসরের মধ্যে গন্ধদীপের আলোয় হঠাৎ যদি একটি ম্লান মুখ-চন্দ্র তোমার মনের দরজায় সসঙ্কোচে পলকের জন্য উঁকি দিয়া যায়, তাহাকে দূর করিয়া দিও মহারাজ, দুঃস্বপ্নকে মনে ঠাঁই দিতে নাই...

শ্রোতাদের মুখে মুখে ম্লান হাসি। যুগান্ত পারের একটি সর্বব্যাপী বিরহ-ব্যথা গানের সুরে কাঁপিয়া কাঁপিয়া শীতক্লিষ্ট ক্ষীণ জ্যোৎস্নার মধ্যে সকলের বুকের মধ্যে পাক খাইয়া বেড়াইতে লাগিল। উমানাথ তদ্‌গত হইয়া শুনিতেছিল। নিতাই ফিস ফিস করিয়া ডাকিল, ছোটদাদু?

উমানাথ কহিল, চুপ।

মিনিট কতক চুপ করিয়া নিতাই ছেঁড়া কানাতের ফাঁকে আকাশের দিকে চাহিয়া আপন মনে কত কি বকিতে বকিতে আঙুল ঘুরাইতে লাগিল। আবার প্রশ্ন করিল, শোন ছোটদাদু, জয়ন্তী বলে কি, আগে নাকি আকাশ হাতে পাওয়া যেত—একদিন এক বুড়ি ঝাঁটার বাড়ি মেরেছিল—সত্যি?

উমানাথ টানিয়া তাহাকে আরও কোলের কাছে আনিল।

ঐ শোন্ খোকা, গান শোন।

না, বাড়ি চল।

মুখ না ফিরাইয়া উমানাথ বলিল, হু—

আরও খানিক বসিয়া থাকিয়া নিতাই আস্তে আস্তে সামিয়ানার বাহিরে আসিল। তাকাইয়া দেখিল, ছোটদাদু কিছুই টের পায় নাই, তেমনি এক মনে গান শুনিতেছে।

গায়ক তখন গাহিতেছে—

ওগো মাধব, গোকুলে চাঁদ ওঠে না, ভ্রমরের গুঞ্জন নাই, যমুনা কলধ্বনি ভুলিয়া গেছে, আর তোমারি গরবিনী রাই আজ ধুলায় পড়িয়া আছে। দশমী দশায় কণ্ঠ তাহার নিরুদ্ধ, শ্বাস বহে কি না বহে। কবরী খুলিয়া পড়িয়াছে, চোখের জলে শতধারা নদী বহিতেছে; সখীরা তাহাকে ঘিরিয়া তোমার নাম কত শোনায়, ক্ষীণ কাঞ্চন-রেখা তনু ঈষৎ কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠে—কিন্তু চোখ মেলিবার ক্ষমতা নাই। অভাগিনী এতদিনে মরিয়া জুড়াইল বুঝি!

কৃষ্ণ অভয় দিলেন, ভয় করিও না। সখি বৃন্দে, তোমাদের কিশোর রাখাল আবার ফিরিয়া যাইবে···

একজন দোয়ার আসরের পাশে সরিয়া তামাক খাইতেছিল, হাত নাড়িয়া উমানাথকে কাছে ডাকিল। কহিল, কেমন গান শুনছেন ছোট-চাটুজ্জে মশাই?

উমানাথ বলিল, খাসা।

উঁহু—বলিয়া লোকটা ঘাড় নাড়িল। বলিল, আরে মশাই, মাথুর পালা হল এর নাম—চোখের জলে এতক্ষণ সতরঞ্চি ভিজে যাবার কথা। এ পালা কিচ্ছু বাঁধতে পারে নি। আর এ যা শুনলেন, শুনলেন; শেষটা একেবারে কিচ্ছু হয় নি। আপনাকে মশায়, পালাটা আগাগোড়া একবার ঠিক করে দিতে হবে। কর্তাবাবু বলছিলেন আপনার কথা—

উমানাথ ঘাড় নাড়িল।

ইতিমধ্যে নিতাই ছুতারপটি লোহাপটি তরকারির হাট পার হইয়া সার্কাসের তাঁবুর চারিদিকে বার আষ্টেক ঘুরিল। কিন্তু সুবিধা কোনদিকে নাই, তাঁবুর কোথাও একটু ছেঁড়া রাখে নাই। দরজার সামনে পরদা টাঙানো, তার ফাঁক দিয়া একটু-আধটু নজর চলে বটে, কিন্তু সেখানে জনকয়েক এমন মারমুখি হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে ভিতরে চাহিতে সাহস কুলায় না।

ওদিকে এক সারি দোকানে বড় বাহার করিয়া গ্যাসের আলো জ্বালিয়া দিয়াছে, ঠিক যেমন দিনমান। ছেলে-ছোকরার ভিড় সেই-খানটায় কিছু বেশি। একটা দোকানের সামনে গিয়া নিতু অবাক হইয়া গেল, তাহার বয়সি আরও তিন-চারিটি ছেলে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতেছে। অত্যাশ্চর্য ব্যাপার, একটা ইঞ্জিন আর তার সঙ্গে খান তিন-চার রেলগাড়ি—পূজার সময় মামার-বাড়িতে যে গাড়িটা চড়িয়া

গিয়াছিল, অবিকল তাই—তবে অতিশয় ছোট। আবার লাইনও পাতা রহিয়াছে। দোকানি দম দিয়া ছাড়িয়া দেয়, গাড়ি লাইনের উপর গড়-গড় করিয়া একবার আগাইয়া যায়, আবার পিছাইয়া আসে

মজা আরও আছে অনেক। এদিকে নাগরদোলা ঘুরিতেছে, পাশের একটা দোকান হইতে রকমারি বাঁশীর সুর আসিতেছে, মাঠে বাজি পোড়ানো হইতেছে, শোঁ-শোঁ করিয়া হাউই আকাশে উঠিয়া তারা কাটিতেছে· অন্য ছেলে কয়টি ছুটিয়া বাজি দেখিতে গেল। নিতাই আগাইয়া গিয়া ইঞ্জিনের গায়ে সন্তর্পণে একটু আঙুল বুলাইয়া দেখিল।

নেবে খোকা? পয়সা আছে কাছে?

হুঁ—বলিয়া আসিবার সময় বাড়াদিদির কাছ হইতে কয়টা পয়সা আনিয়াছিল, তাহাই সে বাহির করিয়া দেখাইল।

দোকানি কহিল ওতে হবে না তো, টাকা লাগবে। কার সঙ্গে এসেছ? যাও বাবাকে নিয়ে এস, দশটা অবধি আমার দোকান খোলা আছে। যাও –

নিতুর অদৃষ্ট ভাল, ছোট দাদু অবধি যাইতে হইল না, সামনেই পড়িয়া গেলেন ক্ষেত্রনাথ। রোজ বিকালেই ক্ষেত্রনাথকে মেলায় আসিতে হয়। সঙ্কীর্তনের আকর্ষণে নয়—মেলার মধ্যে চারিদিককার গ্রাম হইতে বিস্তর খেজুর গুড় আমদানি হয়, প্রতিবছর এই সময়টায় তিনি কিছু গুড় কিনিয়া রাখিয়া বর্ষাকালে দক্ষিণের ব্যাপারিরা আসিয়া পড়িলে ছাড়িয়া দেন। এইপ্রকারে দু পয়সা লাভ হইয়া থাকে।

নিতাই ক্ষেত্রনাথকে জড়াইয়া ধরিল। ক্ষেত্রনাথ কহিলেন, এসেছ আজ আবার? কি বলবে বলে ফেল—দেখি কেমন দাদা! ক্ষিদে? বাড়ি থেকে পা বাড়ালে ক্ষিদে অমনি সঙ্গে সঙ্গে পিছু নেয়—

নিতাই হাসিয়া আবদারের সুরে কহিল, কর্তাদাদু ইদিকে একবার এসো—শিগগির এসে দেখে যাও—

গাঁট খালি—এই দেখ। আজ কিছু হবে না।

কিন্তু উল্টাগাঁট উঁচু হইয়া রহিয়াছে, নিতুর সেদিকে নজর আছে। বলিল, না কর্তাদাদু, আমার ক্ষিদে পায় নি—সত্যি পায় নি—বিষ্টুর কিরে। তুমি একটিবার এসে দেখে যাও।

গাড়ি ও ইঞ্জিনের দাম দোকানি হাঁকিল পাঁচ সিকা।

অগ্নিমূর্তি হইয়া ক্ষেত্রনাথ বলিতে লাগিলেন, দিনে ডাকাতি করতে এসেছ এখানে? ঐ তো টিনের পাত, জিল-জিল করছে, তিনটে দিনও টিকবে না। আয় খোকা, চলে আয়—কি হবে ও নিয়ে। আমরা নেবো না—

দোকানি নিরুত্তরে স্প্রিঙে দম দিতেছিল। ছাড়িয়া দিতে ইঞ্জিন লাইনের উপর ছুটিতে শুরু করিল।

চলে আয়। বলিয়া ক্ষেত্রনাথ নিতুর হাত ধরিয়া টানিলেন। কিন্তু সে নড়ে না। আর একবার টান দিতে দোকানের খুঁটি জাপ্টাইয়া চিৎকার শব্দে নিতাই কান্না জুড়িয়া দিল।

সব তাতে তোমার ইয়ে—না? পাজি কাঁহাকা!

ক্ষেত্রনাথ যত টানেন, তত জোরে নিতু খুঁটি আঁটিয়া ধরে। তারপর খুঁটি ছাড়িয়া গেল তো ঝাঁপ ধরিতে যায়। নাগাল না পাইয়া সেইখানে সে মাটির উপর আছড়াইয়া পড়িল।

হঠাৎ শঙ্কিত ব্যস্ত স্ত্রীকণ্ঠ।

ছুঁস নি, ছুঁস নি—অ হতচ্ছাড়া ছেলে, দিলে বুঝি এই রাত্তিরে ছুঁয়ে?

মেয়েলোকটি ঠিক মেলায় আসে নাই, রাস্তার ধারে ছইওয়ালা একখানা গরুর গাড়িতে বসিয়া অপেক্ষা করিতেছিল। গণ্ডগোল ও ছোটছেলের কান্না শুনিয়া কয়েক পা আগাইয়া উঁকি দিয়া ব্যাপারটা দেখিতেছিল। একদিকে স্তূপাকার বাঁশের চাচাড়ি পড়িয়াছিল, সেইখানে বসিয়া মেলার যাবতীয় বাঁশের কাজকর্ম হইয়াছে—স্পর্শদোষ বাঁচাইতে তাড়াতাড়ি সে ছুটিয়া তাহার উপর উঠিল। লোক জমিয়া যাইতেছে দেখিয়া ক্ষেত্রনাথ নিতুকে ছাড়িয়া এক পাশে দাঁড়াইলেন।

জনমত ক্ষেত্রনাথের প্রতিকূলে। যার যেমন খুশি মন্তব্য করিতে লাগিল। আচ্ছা গোঁয়ার গোবিন্দ হে! মেরেই ফেলেছিল ছেলেটাকে··· শাসন করতে হয় বলে এমনি শাসন?···রক্ত পড়ছে যে—লোকটা কে হে?··· ধরে জেলে দেওয়া উচিত।

নিতুর হাতে-পায়ে আঁচড় লাগিয়া লাগিয়া দু-এক ফোঁটা রক্ত পড়িতেছিল, তাহা ঠিক।

ক্ষেত্রনাথকে যাহারা চিনিত, তাহারা অত দরদ দিয়া সম্বর্ধনা করিতে পারিল না। বলিল, যা হবার হয়েছে চাটুজ্জে মশায়, রাগ না চণ্ডাল—আর দাঁড়িয়ে থাকবেন না, তুলে নিন নাতিকে, বাড়ি গিয়ে কাটা-জায়গায় তেল-টেল দিন গে। হাঁটিয়ে নেবেন না যেন—গাড়ি করে চলে যান।

স্ত্রীলোকটি ইতিমধ্যে নির্বিঘ্ন স্তূপ হইতে নামিয়া নিতুকে কোলে তুলিয়া শান্ত করিতে বসিয়া গিয়াছে। প্রৌঢ়া বিধবা। দেহ ক্ষীণ বটে, কিন্তু কণ্ঠস্বরের জোর যেমন অসামান্য, তেমনি উহা যেন মধু ছড়াইতে ছড়াইতে বহিয়া যায়। ক্ষেত্রনাথের দিকে এক পলক তীব্র দৃষ্টি হানিয়া বিধবা কহিল, পয়সাকড়ি চিতেয় সঙ্গে নিয়ে উঠবে নাকি ?

অতিশয় সঙ্গিন প্রশ্ন। উচিতমতো উত্তর দিতে গেলে আবার একদফা দুর্যোগ ঘটিবার সম্ভাবনা। বিশ গাঁয়ের লোকের সম্মুখে ক্ষেত্রনাথের আর তাহাতে উৎসাহ নাই। কিন্তু আশ্চর্য এই, যাহাকে লইয়া এত লোকের এমন দুশ্চিন্তা, চক্ষের পলকে সেই নিতাইচন্দ্র লাফ দিয়া উঠিয়া পুনশ্চ দোকানের খুঁটি আঁটিয়া ধরিয়া দাঁড়াইল।

বিধবা বলিল, দাও না গো দোকানি, ছেলেমানুষ ধরে বসেছে—দিয়ে দাও সস্তা করে।

দোকানি বলিতে লাগিল, এক টাকার কম দেওয়া যায় না মা, কল বলেই না এত দাম! এই গাড়িটা নিন, চার পয়সায় দিচ্ছি। চাকা আছে, চোঙ আছে, কিন্তু টানতে হবে দড়ি বেঁধে।

আমরা দড়ি বেঁধেই টানব, কি বল খোকা? বলিয়া চার পয়সার গাড়িটা তুলিয়া সে নিতুর হাতে দিল।

ক্ষেত্রনাথ চিনিতে পারেন নাই, কিন্তু রঙ্গস্থলে হৃদয় বাবু আসিয়া পড়িতেই পরিচয় প্রকাশ পাইল। হৃদয়ের হাতে একবোঝা হাটের বেসাতি। বলিল, আমার কেনাকাটা হয়ে গেছে। এইবার গাড়িতে চলুন দিদি—

অর্থাৎ চল্লিশ বছর পরে জগদ্ধাত্রী বাপের বাড়ির গ্রামে ফিরিতেছে, হৃদয় মুরুব্বি হইয়া লইয়া যাইতেছে। দূর জ্ঞাতিসম্পর্কের এই দিদিটির

প্রতি ভক্তি তাহার যেরূপ, গুরুজনদিগের প্রতি সেই প্রকার ভক্তি এই কলিযুগের দিনে লোকে যেন শিক্ষা করিয়া রাখে।

জগদ্ধাত্রী ডাকিল, গাড়িতে এস খোকা।

এবং নিতুকে কোলে তুলিয়া গাড়িতে উঠিয়া বসিল।

নিঃশব্দ গ্রামপথ। ক্বচিৎ কখন মেলার ফিরতি দু-একটি লোকের সঙ্গে দেখা হইয়া যায়। বালুপথে গরুর গাড়ির শব্দ হইতেছে না। গাড়ির পিছনে ক্ষেত্রনাথ ও হৃদয় পাশাপাশি চলিয়াছেন।

খানিকক্ষণ পরে হঠাৎ ক্ষেত্রনাথ কথা কহিয়া উঠিলেন, তাই তো বলি, ব্যাপার কি? ভটচায-বাড়ি এত বড় খাওয়া-দাওয়া, তার মধ্যে আমাদের হৃদয় নেই। তোমার সেজছেলেকে জিজ্ঞাসা করলাম, বলল, বাবার পেটের অসুখ, নেমন্তন্নে আসবে না। নিজে না গিয়ে গাড়ি পাঠালেই তো জগদ্ধাত্রী আসতে পারত।

হৃদয় অপ্রস্তুতের ভাবে নানা প্রকার কৈফিয়ৎ দিতে লাগিল, সে জন্য নয়, এমনি গিয়েছিলাম ওদিকে। দিদি বললেন, এত বড় মেলা হচ্ছে, দেশবিদেশ থেকে মানুষজন আসছে, দেখে আসিগে একবার।···গাড়ি ভাড়া-টাড়া ওঁরই সব—আমার কি গরজ পড়েছে বলুন—

ওদিকে ছইয়ের মধ্যেও মৃদুকণ্ঠে কথাবার্তা শুরু হইয়াছে।

নিতুর মতে এ জগতের একটি লোকও ভাল নয়।

কর্তাদাদু?

মারে।

মেজ কাকা, ছোট কাকা?

তারাও।

বাবা এবং কাকাবাবুরা বাড়ি আসিবার সময় তার জন্য নানারকম জিনিষ লইয়া আসে, সে হিসাবে ভালই। কিন্তু অপরাধ তাদের, আবার চাকরি করিতে চলিয়া যায়। বাড়ি থাকিতে বলিলে কথা শোনে না—মিছা কথা বলিয়া ফাঁকি দিয়া ভুলাইয়া চলিয়া যায়।

আর আমি? জগদ্ধাত্রী সমস্যাময় প্রশ্ন করিয়া বলিল, আমি কেমন লোক, বল তো নিতুবাবু।

নিতাই চুপ করিয়া রহিল।

জগদ্ধাত্রী বলিল, এই গাড়ি কিনে দিলাম তোমায়, আমি ভাল না?

নিতাই কহিল, তোমার গাড়ি মোটে চলে না, কলের গাড়ি ভাল।

আচ্ছা কিনে দেব ঐ কলের গাড়ি। হাসিমুখে জগদ্ধাত্রী বলিল, কিনে দেব, যদি এক কাজ করতে পার—

উৎসাহের প্রাবল্যে নিতাই খাড়া হইয়া বসিল। দাও।

বললাম তো, একটা কাজ করতে হবে।

কি বল, এক্ষুণি করব। নিতাই গরুর গাড়ি হইতে লাফাইয়া তখনই কাজে প্রবৃত্ত হইতে যায় আর কি।

জগদ্ধাত্রী হাসিয়া তাহার হাত ধরিয়া ফেলিয়া বলিল, আমায় যদি বিয়ে কর নিতুবাবু। করবে?

সঙ্কীর্ণ গ্রামপথ, পথের ধারে ছোট ছোট ঝোপজঙ্গল আকাশে শীতের নির্জীব অস্পষ্ট চাঁদ নিকটে দূরে এখানে ওখানে ক'খানা ঘুমন্ত খোড়ো ঘর·· হঠাৎ তাহার মধ্যে কোথা দিয়া কি হইয়া গেল—যেন এক বৈঠার আঘাতে একটি ডিঙা চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর উজান ঠেলিয়া গেল। গাড়ির পিছনে চলিতে চলিতে ক্ষেত্রনাথ সেই কথা কয়টি শুনিতে লাগিলেন, আমায় বিয়ে করবে, আমায় বিয়ে করবে গো?

বছর চল্লিশ পরে লোকনাথ ঠাকুরের মেলার জনারণ্যের মাঝখানে ক্ষেত্রনাথ কয়েক মুহূর্তের জন্য আজ জগদ্ধাত্রীকে দেখিয়াছেন, দেখিয়াছেন বটে—তাহাও বড় ঝাপসা রকম, ধরসকালের চোখের সে দৃষ্টি নাই— রাত্রিবেলা কোন-কিছু ভাল করিয়া দেখিতে পান না, সেই ক্ষণিকের দেখা মূর্তি ভুলিয়া গিয়াছেন কোন কালের কোন মূর্তিই মনে নাই। কেবল মনে আসিতেছে, কারণে অকারণে খিল খিল করিয়া হাসি, আবার সঙ্গে সঙ্গেই জলভরা অভিমানাহত ডাগর ডাগর চোখ দু'টি

আমায় বিয়ে করবে? ও দাদা, বিয়ে করবে আমায়?

ক্ষেত্রনাথের বউদি সম্পর্কের এক নিঃসন্তান বিধবা তাহাদের বাড়িতে থাকিতেন। এতটুকু মেয়ে জগদ্ধাত্রী বেড়াইতে আসিলে বউদিদি আদর করিয়া চুল বাঁধিয়া কপালে টিপ পরাইয়া গিন্নির ঝাঁপি হইতে আলতাপাতায় পা ছোপাইয়া অনেক শিখাইয়া পড়াইয়া তাহাকে

ক্ষেত্রনাথের কাছে পাঠাইতেন। ক্ষেত্রনাথের বয়স বেশি, বুদ্ধিও বেশি। নায়িকার শুভ প্রস্তাবের প্রত্যুত্তরে স্বামিত্বের প্রথম সোপানস্বরূপ তার পিঠের উপর যে বস্তু উপহার দিত তাহাতে জগদ্ধাত্রী ব্যথায় যত না হউক অভিমানে চতুর্গুণ কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিত সেই সব কথা মনে পড়িতে লাগিল।

সেদিন উমানাথ বাড়ি ফিরিল, তখন চাঁদ ডুবিয়াছে। অত রাত্রেও ক্ষেত্রনাথের ঘরে আলো। উমানাথ খিড়কি খুলিয়া বাড়ির মধ্যে ঢুকিবার মতলবে টিপিটিপি কয়েক পা পিছাইয়াছে, কিন্তু ক্ষেত্রনাথের চোখকে হয়তো ফাঁকি দেওয়া যায়, কান ভারি সজাগ। বলিলেন, কে? কে ও? এই ঘরে এসো। তোমার জন্যে বসে আছি কেবল—

হয়তো সত্যই তাহার অপেক্ষায় বসিয়াছিলেন, কিন্তু নিতান্ত যে হাত পা কোলে করিয়া বসিয়াছিলেন তাহা নহে। তিনটা দলিলের বাক্সই খুলিয়া ডালা তুলিয়া রাখা, প্রদীপে এক সঙ্গে অনেকগুলা সলিতা ধরাইয়া দেওয়া হইয়াছে, চোখে চশমা আঁটা, স্তূপীকৃত দলিলের মধ্য হইতে একখানা বাছিয়া ক্ষেত্রনাথ মেজের উপর উবু হইয়া যেন ঐ দলিলখানির উপর স্তিমিত চোখের সকল দৃষ্টিশক্তি ঢালিয়া দিয়া পড়িতেছিলেন।

উমানাথ কহিল, এখনো শোন নি আপনি?

এটা কিছু নূতন ব্যাপার নয়, আশ্চর্য হইবার কিছু নাই ইহাতে। বৈষয়িক ব্যাপারে ক্ষেত্রনাথের সতর্কতা চিরদিনই অপরিসীম, এ বিষয়ে দিনরাত্রি জ্ঞান নাই। দলিলের বাক্সগুলি থাকে শোবার ঘরে ঠিক শিয়রের কাছবরাবর, প্রত্যেকটি দলিলের গায়ে একটুকরা করিয়া কাগজ আঁটা, তাহাতে ক্ষেত্রনাথের স্বহস্তে লেখা স্থূলমর্ম। শীতকালে এক-একদিন কাগজপত্র ঝাড়িয়া ঝুড়িয়া রৌদ্রে দেন, সমস্ত বেলা নিজে পাহারা দিয়া পাশে বসিয়া থাকেন, আবার নিজের হাতে সমস্ত গোছাইয়া নূতন কাপড়ের দপ্তরে সাজাইয়া বাঁধিয়া রাখেন। এমন অনেক দিন হইয়া থাকে, নিষুপ্ত গভীর রাত্রি—এক ঘুমের পর ক্ষেত্রনাথের মনে কি রকম একটা গোলমাল লাগিল, উঠিয়া আলো

জ্বালিয়া বাক্স খুলিলেন, তারপর দু-চারিটা দলিল বাহির করিয়া নিবিষ্ট মনে খানিক পড়িয়া দেখিয়া তবে নিশ্চিন্ত হইয়া শুইতে পারেন। গৃহিণী গত হইবার পর হইতে ইদানীং রোগটা আরও বাড়িয়া গিয়াছে।

উমানাথ কহিল, রাত একটা-দুটো বেজে গেছে। আর রাত জাগবেন না দাদা।

ক্ষেত্রনাথ বাহিরের পানে চাহিলেন। কিন্তু জানলা বন্ধ, কি দেখিবেন? বলিলেন, রোসো। তাড়াতাড়ি কাগজপত্র তুলিয়া রাখিলেন। বলিলেন এসো এদিকে, সিন্দুকটা ধরো দিকি—

কোন সিন্দুক?

বিরক্ত মুখে ক্ষেত্রনাথ বলিলেন, সিন্দুক ক'টা আছে হে আমাদের বাড়ি? বাক্সর কথা বলছি নে, ঐ যে — ঐ সিন্দুক।

অনেক পুরানো সেগুনকাঠের একটা সিন্দুক, বয়সগুণে কালো পাথরের মতো হইয়া গিয়াছে। এমন জিনিষ আজকাল আর তৈরি হয় না। আগে উহার মধ্যে [illegible] অপরাপর [illegible] বিস্তর কাগজপত্র ছিল, দু একটা করিয়া খুলিয়া পড়িতে পড়িতে এখন তার চিহ্নমাত্র নাই। ইদানীং ইহা বড় কেহ ব্যবহার করে না। এখানে সেখানে তক্তার জোড় আলগা হইয়া ঘরের এক কোণে অবহেলিত ভাবে পড়িয়া রহিয়াছে।

খানিক টানাটানি করিয়া উমানাথ বলিল, চার পাঁচ মণের ধাক্কা দাদা, নড়ে চড়ে না একটু—

ভাল করে ধরো। বলিয়া ক্ষেত্রনাথ সিন্দুক ধরিয়া প্রাণপণ বলে ঝুলিয়া পড়িলেন। কিছুতে কিছু হয় না। পরিশ্রমের ফলে হাঁপাইতে লাগিলেন। বলিলেন, দেবীদাস রায়ের সিন্দুক এক নামে—নড়বে কি সহজে? মধ্যে আবার তোমার ঐ সম্পাদক আর সার্বভৌম ঠাকুরের গুষ্টির পিণ্ডি বোঝাই করা। এই বাক্স খুলে যে সব বের করে ফেলা, সে-ও তো মহা হাঙ্গামের ব্যাপার—

চিন্তান্বিত মুখে ক্ষেত্রনাথ চুপ করিলেন। উমানাথ বলিল, এখন কি হয়? দরকার হলে সকালবেলা না হয় মানুষ-জন ডেকে সরিয়ে ফেলা যাবে।

বুদ্ধির জাহাজ! ক্ষেত্রনাথ চটিয়া উঠিয়া বলিতে লাগিলেন, খুব কথা বললে তুমি! সকালবেলা লোক জানাজানি হয়ে যাবে না? যা করবার এখুনি করতে হবে।

সহসা যেন সমাধান দেখিতে পাইয়া বলিলেন, এক কাজ কর দিকি, চালির থেকে বালিশ-বিছানা সব পাড়ো। ঐগুলো সিন্দুকের উপর সাজিয়ে রেখে দাও, বাইরে থেকে সিন্দুক যাতে দেখা না যায়। মনে হবে, এখানে কেবল বিছানাপত্তোর গাদা করা রয়েছে।

সিন্দুক ঢাকা হইয়া গেল। ক্ষেত্রনাথ আলো ধরিয়া এদিক-ওদিক ভাল করিয়া দেখিলেন। দেখিয়া খুশি হইলেন। বলিলেন, জগদ্ধাত্রী তো জগদ্ধাত্রী, শ্মশান থেকে সহায়রাম রায় উঠে এলেও আর ধরতে হচ্ছে না।

সিন্দুকের ইতিহাস উমানাথ সমস্ত জানে এবং আজ জগদ্ধাত্রী যে গ্রামে আসিয়াছে সে কথাও তাহার কানে গিয়াছে। অতএব এখনকার আয়োজন দেখিয়া ব্যাপার বুঝিতে বিলম্ব হইল না। বলিল, এই তো ভাঙাচোরা খানকতক তক্তা—কি ই বা জিনিষ—এ দেখে তারপরে কি আর জগদ্ধাত্রী-দিদি দাবি করতে আসবেন? আর করেনই যদি, অনাথা বিধবার জিনিষ—দিয়ে দেওয়া উচিত।

রুক্ষ দৃষ্টিতে চাহিয়া ক্ষেত্রনাথ বলিলেন, কোনটা কার জিনিষ—সে আমাদের সেকেলে স্বত্বাস্বত্বির কথা। তুমি তার কি খবর রাখ যে বলতে এসেছ?

তাড়া খাইয়া উমানাথ নিরুত্তর হইল। ক্ষেত্রনাথ তামাক সাজিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। মুখ ফিরাইয়া দেখিলেন, উমানাথ ধীরে ধীরে চলিয়া যাইবার উদ্যোগে আছে। কিঞ্চিৎ হাসিয়া সদয় কণ্ঠে কহিলেন, ভায়া আমার মনে মনে ভাবেন, দাদা দেশের লোককে ফাঁকি দিয়ে বিষয়-আশয় করেছে। জগদ্ধাত্রী আমায় এক চিঠি দিয়েছে—দেখেছ?

হ্যাঁ।

আশ্চর্য হইয়া ক্ষেত্রনাথ কহিলেন, কোন চিঠি দেখেছ? কি লেখা আছে বল তো?

দেশে ফিরে অবধি দিদি তো ঢের চিঠি লিখেছেন। সেই যে সহায়রাম কাকার ভিটেবাড়ির দরুন টাকা চেয়ে লিখেছিলেন—

ক্ষেত্রনাথ বলিলেন, ও তো হৃদয় রায়ের চিঠি—হৃদয় লিখিয়ে দিয়েছে, জগদ্ধাত্রীর হাতের লেখাটা কেবল। আগের চিঠি দেখেছ?

তাতেও ঐ। লিখেছেন, বসতবাড়ির দরুন না দাও—ঘর সারাতে হবে, তারই সাহায্য বলে দাও গোটা পাঁচেক টাকা।

ক্ষেত্রনাথ অসহিষ্ণু ভাবে ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, সে আগের কথা বলছি নে। তুমি সে সময় বিষ্ণুপুরে বেহালা বাজিয়ে বেড়াও। সহায়রাম রায় মারা গেলেন। জগদ্ধাত্রী সেই সময় দিল্লি থেকে চিঠি লিখেছিল। চিঠি নয়, সে আমার দলিল। দেখেছ?

উমানাথ তাহা জানে না। ক্ষেত্রনাথ বলিতে লাগিলেন, গোড়া না জেনে বলতে নেই। বিয়ের পর-বছর জগদ্ধাত্রীকে নিয়ে গেল পশ্চিমে। সহায়রাম খুড়ো মারা গেলে খবর দিলাম, কেউ এল না। জগো লিখল, বাবার জিনিষপত্তর যা আছে—তুমি নিও, তুমি নিলেই বাবার তৃপ্তি হবে। ঐ হৃদয়ের বাপ বরদাকান্ত রায় মশায় তখন বেঁচে। তিনি এসে বাদি হলেন। বলেন, আমরা হলাম নিকট জ্ঞাতি, সহায়রামের অস্থাবর আমাদের ডিঙিয়ে ক্ষেত্তোর চাটুজ্জে পর্যন্ত পৌঁছয় কি করে? লোক ডাকাডাকি, হুলস্থূল কাণ্ড। জিনিসের মধ্যে তো খানকতক পিঁড়ি-বারকোষ আর ঐ দেবীদাস রায়ের সিন্দুক—ছাইভস্মে বোঝাই। আমারও জেদ—তাই বা ছাড়ব কেন?

ছাইভস্ম? এই অঞ্চলের একটা বিখ্যাত বস্তু এই সিন্দুক, যা লইয়া সহায়রাম রায় পালা বাঁধিয়াছিলেন। এখনও ক্ষেত নিড়াইবার মরসুমে চাষাভুষার মুখে উহার দশ-বিশটা কলি মাঝে মাঝে শুনিতে পাওয়া যায়। ক্ষেত্রনাথ সিন্দুক খুলিয়া দেখেন নাই, খুলিলে হয়ত দেখিতেন ছাইভস্ম নয়, তাল তাল সোনা ফলিয়া আছে। সহায়রামের গানের দু'টি ছত্র উমানাথের মনে ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল—

সিন্দুকের মধ্যে সোনার বৃক্ষ, বৃক্ষে ফলে সোনা
আকাশের চাঁদ দিব পেড়ে (ও বাবা) সিন্দুক খুলিব না।

নিজের ঘরে আসিয়া উমানাথ দেখিল, তরঙ্গিণী জানালা ভেজাইয়া অঘোরে ঘুমাইতেছে। একটা জানলা খুলিয়া দিতেই টাটকা বুনো ফুলের গন্ধ আর সঙ্গে সঙ্গে সিন্দুকের পালার কথাগুলি একটির পর একটি

যেন বাহিরের ঘন অন্ধকারের মধ্য হইতে ভাসিয়া আসিতে লাগিল। কত রাত্রি অবধি সে আপনার মনে গুণ-গুণ করিতে করিতে অবশেষে এক সময় ঘুমাইয়া পড়িল। ঢাকা-দেওয়া খাবার পড়িয়া রহিল, খাওয়া হইল না।

দেবীদাস রায় সম্পর্কে জগদ্ধাত্রীর ঠাকুরদাদা—সহায়রাম রায়ের কি রকমের খুড়া হইত। বাপ ছিলেন দশকর্মান্বিত ব্রাহ্মণ, দু-দশঘর যজমানের কল্যাণে কায়ক্লেশে সংসার চলিত। কিন্তু দেবীদাস ওপথেই গেল না, দিনরাত কেবল কুস্তি লড়িয়া লাঠি ভাঁজিয়া বেড়াইত। মজা টের পাইল—বাপের জীবনঅন্তে। বয়স তাহার তখন কুড়ি-বাইশ। নিত্যকর্ম-পদ্ধতি খুলিয়া অবাধ্য স্মরণশক্তিকে বশে আনিবার রীতিমতো প্রয়োজন পড়িয়া গেল। ঠিক এই সময়ে এক যজমান বাড়ি কি-একটা ব্যাপারে যৎপরোনাস্তি অপদস্থ হইয়া আসিয়া মনের ঘৃণায় দেবীদাস নিরুদ্দেশ হইয়া যায়। লোকে বলিত—নবদ্বীপের কোন টোলে পড়িতে গিয়াছে। পড়াশুনা কতদূর কি হইয়াছিল জানা নাই, মাস ছয়েকের মধ্যেই একদিন সকালবেলা দেখা গেল, দেবীদাস ফিরিয়া আসিতেছে—সঙ্গে দু-খানা গরুর গাড়ি। একটা হইতে নামিল, বেশ গোলগাল গড়ন হাসিমুখ একটি বধূ, অন্যটি হইতে নামাইল ঐ বিশালকায় সিন্দুক।

মেয়েরা আড়ি পাতিতে গিয়া দেখিয়াছে, নববধূ গভীর রাত্রি পর্যন্ত প্রদীপের সামনে তালপাতার পুঁথি লইয়া নিবিষ্ট মনে বসিয়া থাকিত, আর দেবীদাস খাটের অপর প্রান্ত অনেকটা দূরে অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া ঘুমাইত কি, কি করিত কে জানে? মোটের উপর বোঝা যাইত, সরস্বতী-সম্পর্কিত ব্যাপারগুলাকে তখনও দেবীদাস সসম্ভ্রমে পাশ কাটাইয়া চলে।

তারপর কেমন করিয়া বলিতে পারি না, বধূর সঙ্গে ভাব জমিয়া আসিল। এক একদিন রাত্রে টিপিটিপি ঘরে ঢুকিয়া দেবীদাস অধ্যয়নরত বধূর যৌবনস্নিগ্ধ উদ্‌গত মুখের দিকে প্রলুব্ধ চোখে ক্ষণকাল চাহিয়া রহিত। তবু সম্বিত হয় না দেখিয়া একটানে বালিশ বিছানা বধূ ও পুঁথিসুদ্ধ খাটখানি জানালার দিকে হুড়মুড় করিয়া টানিয়া লইত, বধূ

চমকিয়া সলজ্জভাবে তাড়াতাড়ি বই বন্ধ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইত, মুখে ঈষৎ বিরক্তির ছায়া। তখনই সে ভাব সামলাইয়া একটু হাসিয়া বলিত, অমনি করতে হয়? এসে সাড়া দাও নি কেন?

দেবীদাস হাসিমুখে চাহিয়া থাকে।

বধূ বলিত, খাট সমেত টেনে নিলে, তোমার গায়ে জোর তো খুব—

দেবীদাস সগর্বে পেশীবহুল সুস্পষ্ট হাত দুখানি নাড়িয়া বলিত, ভারি তো। এতে আর জোরটা কি লাগে? আচ্ছা ঐ সিন্দুকটাও চাপিয়ে দেও খাটের উপর। তারপর যেমন বসেছিলে তেমনি থাক। দেখ—

আবার হাসিয়া বলিত, এ বসে বসে কেবল তালপাতা নাড়া নয়।

বিস্ময়ে বধূর চোখ কপালে উঠিত। সত্যি পার?

দেখ—বলিয়া দেবীদাস বধূকে ছোট্ট একটি তুলার পুঁটুলির মতো শূন্যে তুলিয়া ধরিত। তারপর লুফিয়া টানিয়া বুকের মধ্যে আনিতে গেলে বধূ কাঁপিয়া চেঁচাইয়া উঠে।

তখন মাটিতে নামাইয়া দিয়া হাসিয়া দেবীদাস বলে, ভয় পেয়েছ বড্ড? তারপর সদয় কণ্ঠে বলে, আর ভয় দেব না।

একদিন দুপুর রাত্রে দু-জনে শুইয়া আছে। খুট খুট শব্দ হইতেছে। বধূ জাগিয়া উঠিয়া ভয়ে স্বামীর বুকের মধ্যে লুকাইল। ফিস-ফিস করিয়া কহিল, শুনছ?

দেবীদাসেরও ঘুম ভাঙিয়াছে। আস্তে আস্তে উঠিয়া বসিল। বলিল, চোরে সিঁধ কাটছে বোধ হয়। কিছু ভয় নেই, তুমি আমায় ছাড় একটু লক্ষ্মী—

অনেক করিয়া বধূকে সে ঠাণ্ডা করিল।

খস-খস ভস ভস—মাটি ঝরিয়া পড়িতেছে। যে সরু জানালা তাহারই নিচে সিঁধ কাটিতেছে। অন্ধকারের মধ্যে অনেকক্ষণ তাহারা জানলার পাশে বসিয়া আছে। ক্রমে গর্ত কাটা হইয়া গেল। খানিকক্ষণ চুপচাপ, তারপর একটা কালো মাথা সিঁধের মুখের ভিতরে আসিতেছে।

বধূ ব্যস্ত হইয়া আঙুল দিয়া দেখাইল, ঐ—

চুপ—বলিয়া দেবীদাস তাহাকে থামাইয়া দিল। বলিল, মানুষ নয়,

ও লাঠির মাথায় কালো হাঁড়ি। আগে ঐ পাঠিয়ে পরখ করে, কেউ পাহারা দিয়ে বসে আছে কি-না। চুপ, চুপ।

হাঁড়ি ঘরের মধ্যে অনেকখানি আসিয়া এদিকে-ওদিকে নড়িয়া-চড়িয়া আবার বাহির হইয়া গেল।

আবার চুপচাপ। তারপর দেখা গেল, অতি সন্তর্পণে গর্তের আলগা মাটির উপর দিয়া ধীরে ধীরে আগাইয়া আসিতেছে সত্যকার মাথা। অন্ধকারে দেবীদাসের মুখে তীক্ষ্ণ হাসি খেলিয়া গেল। চোর আর একটু আসিতেই তাহাকে ঝাপটাইয়া ধরিয়া হো-হো করিয়া সে হাসিয়া উঠিল।

নিতান্ত ছেলেমানুষ চোর, একেবারে ডাক ছাড়িয়া কাঁদিয়া উঠিল। আমি কিচ্ছু জানি নে ঠাকুর মশাই, আমায় ওরা ঠেলে পাঠিয়েছে। আমি নতুন লোক—

সঙ্গে সঙ্গে শোনো গেল, জন দুই-তিন দাওয়া হইতে উঠানে লাফাইয়া পড়িল।

দেবীদাস হাসিয়া বলিল, যা হতভাগা বেকুব বেল্লিক—আর কাঁদিস নে। যা চলে। বলিয়া দোর খুলিয়া তাহাকে ঠেলিয়া দিয়া পলায়মান একটি আবছা মূর্তি লক্ষ্য করিয়া দেবীদাস ছুটিল।

বাড়ির সীমা ছাড়াইয়া বিল। লোকটি ছুটিতে ছুটিতে বিলে গিয়া পড়িল। শুকনার সময় বিলে জল কাদার সম্পর্ক নাই। দেবীদাস তীরের মতো ছুটিয়াছে। কাছাকাছি আসিয়া বলিল, আর পালাবি কতদূর? বিলে এসেই যে ভুল করলি বেকুব গাধা কোথাকার? এখানে গা-ঢাকা দিবি কোথায়?

কিন্তু সে ভাবনা ভাবিবার আগেই চোর একটা উঁচু আ'ল বাধিয়া পড়িয়া গেল। দেবীদাস কাছে আসিয়া পড়িল, কিন্তু গায়ে হাত দিল না। বলিল, এখন ধরব না। ওঠ্ বেটা, ছোট্—শেষে তুই ভাববি, পড়ে না গেলে দেবীদাস বাপ ধরতে পারত না—

লোকটি কিন্তু উঠিল না, পড়িয়া পড়িয়াই কাতরাইতে লাগিল। পড়িয়া গিয়া তাহার পা ভাঙিয়াছে। অতএব দৌড়িয়া ধরিবার বাসনা স্থগিত রাখিয়া দেবীদাস আপাতত চোরকে কাঁধে করিয়া আসিল।

দিন তিনেক ধরিয়া স্বামী-স্ত্রীতে বিস্তর তদ্বির করিয়া তাহাকে খাড়া করিয়া তুলিল।

একদিন বধূ সেই চোরকে জিজ্ঞাসা করিল, কি মতলবে এসেছিলি বাবা ? জানিস তো আমরা ভিখিরি বামুন—

অনেক রকমে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া জানা গেল, এদেশে গুজব রটিয়াছে—দেবীদাস রায় বিবাহ করিয়া সিন্দুক ভরিয়া বিস্তর টাকা আনিয়াছে। লোভে পড়িয়া অনেকে তাই নিশিরাতে এই বাড়ি হাঁটাহাঁটি করে।

বধূ বলিল, টাকা নয় রে বাবা, সোনার তাল। সিন্দুকে সোনার গাছ আছে—তাল তাল সোনার ফলন হয়···সে আমি দেখাব না তো—কিছুতেই না।

তারপর হাসিতে হাসিতে সিন্দুকের ডালা উঁচু করিয়া তুলিয়া ধরিল। অগণিত তালপাতার পুঁথি। তাহারই কয়েক বোঝা তুলিয়া উল্টাইয়া পাল্টাইয়া সিন্দুকের ভিতর দেখাইল। অজস্র পুঁথি, তা ছাড়া আর কিছু নাই।

বধূ বলিল,—আমার বাবা মস্ত বড় সার্বভৌম পণ্ডিত। মরবার সময় সিন্দুক-বোঝাই এই সব ধনরত্ন দিয়ে গেছেন, এর এক টুকরা আমি কাউকে দিতে পারব না বাপু—

এক বছরের আগ পাছ স্বামী স্ত্রী অপুত্রক মরিল। দেবীদাসের স্থাবর অস্থাবর সকল সম্পত্তি সহায়রামে বর্তাইল। সহায়রামের পৈতৃক তেজারতির কারবার ছিল, কিন্তু এক দুরারোগ্য রোগে সমস্ত মাটি করিয়া দিল। সহায়রাম পালা লিখিতেন—যাত্রার পালা, কীর্তন-কথকতার পালা—দুই কানে যাহা শুনিতেন পালায় বাঁধিয়া বসিয়া থাকিতেন। বন্ধকি কাগজ পত্র অন্দরে গিন্নির বাক্সে তালাবন্দি হইয়া থাকিত, দেবীদাস রায়ের সিন্দুকটি কেবল সহায়রামের নিজস্ব সম্পত্তি—ওটি থাকিত বাহিরের চণ্ডীমণ্ডপে। ভোরবেলা সকলের আগে উঠিয়া আসিয়া সিন্দুকের উপর বসিয়া বসিয়া তিনি সুর ভাঁজিতেন। খাগের কলম ও হলদে কাগজের খাতা বাহির হইত। লোকজন আসিতে শুরু হইলে খাতাকলম আবার সিন্দুকে ঢুকিত।

প্রৌঢ় বয়সে সহায়রামকে বড় শোকতাপ পাইতে হয়। তিনটি ছেলে ওলাউঠায় মরিয়া গিয়া একেবারে নির্বংশ হইলেন। আগে যা একটু কাজকর্ম দেখিতেন, ইহার পরে তাহা একেবারে বন্ধ হইয়া গেল—বড় একটা বাড়ির মধ্যেই আসিতেন না, সমস্ত দিন ও অনেক রাত্রি অবধি সিন্দুকের উপর চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতেন। এক এক সময়ে গানের খাতা খুলিয়া সুর ধরিতেন। সুর খুলিত না, গলা আটকাইয়া যাইত, চোখের জল খাতার উপর টপ-টপ করিয়া ঝরিয়া পড়িত।

এই সময়ে জগদ্ধাত্রীর জন্ম হয়।

মেয়ের যতদিন বিবাহ হয় নাই, মেয়ে ছাড়া কিছুরই তিনি খোঁজ রাখিতেন না। গিন্নি মারা গেলেন, মেয়ে শ্বশুরবাড়ি চলিয়া গেল, সহায়রামের যাহা-কিছু ছিল মেয়ের বিবাহে উজাড় করিয়া দিয়া দিলেন—দিলেন না কেবল ঐ সিন্দুক। নিরালা পোড়ো-ঘরে কর্মহীন বৃদ্ধের জীবনান্তকাল পর্যন্ত ঐ সিন্দুক ও গানের খাতা সম্বল হইয়া রহিল। উমানাথ সেই সময়ে রাতদিন বুড়ার সঙ্গে লাগিয়া থাকিত। তার অনেক দিন পরে সহায়রামের মৃত্যুর পর তাঁহাকেই গুরু বলিয়া ভণিতা দিয়া উমানাথ কবির দলে গান বাঁধিতে শুরু করিয়াছে।

পরদিন বেলা বোধ করি প্রহরখানেক হইবে, জগদ্ধাত্রী সন্তর্পণে পা ফেলিতে ফেলিতে ভিতরের উঠানে দাঁড়াইল। পরনে তাহার অতি জীর্ণ একখানি মটকার থান। স্নান হইয়া গিয়াছে, ভিজা চুলের উপর ফেরতা দিয়া আঁচল জড়ানো।

কই গো, মানুষ-জন কোথা ?

প্রথমটা জবাব আসিল না। আরও দু একবার ডাকাডাকি করিতে তরঙ্গিণী বাহিরে আসিল। দাওয়ায় পিঁড়ি পাতিয়া দিয়া মুখ কালো করিয়া প্রণাম করিতে গেল। জগদ্ধাত্রী তাড়াতাড়ি পা সরাইয়া বলিল, ছুঁয়ে দিও না দিদি। তোমাদের কর্তাদের সঙ্গে কাজ রয়েছে, কাজ সেরে এই পথে অমনি মঠবাড়ির মন্দিরে যাব। তুমি তো উমানাথের বউ—বাড়ির গিন্নি হয়েছ এখন। দেখি, দেখি—সেদিনকার উমানাথ—

তার আবার বউ, সে হল গিন্নিঠাকরুন—বলিয়া হাসিতে গিয়া তেমন করিয়া হাসিতে পারিল না। বলিল, কি সুন্দর সোনার সংসার আগলে বসে আছিস বউ, দেখে যে হিংসে হয়।

সেজবউ ও ছোটবউ ঘাটে গিয়াছিল। সমস্ত ঘাটের পথ বকবক করিতে করিতে এখন আসিয়া রান্নাঘরে কাঁখের কলসি নামাইল। অচেনা মানুষ দেখিয়া কপাটের আড়ালে দাঁড়াইয়া গেল। জগদ্ধাত্রী ডাকিল, ইদিকে আয়, ঘোমটা দিচ্ছিস যে বড়। আমায় কুটুম্ব ঠাওরালি নাকি? মুখ তোল্—তোল্ শিগগির—

ঘোমটা টানিয়া শান্ত সভ্যভব্য হইয়া থাকা ছোটবউর পক্ষেও দুরূহ ব্যাপার। মুখ তুলিয়া একবার চাহিয়া আবার সে ঘাড় নামাইল।

জগদ্ধাত্রী বলিল, আমার যে ছোবার জো নেই, ওগো ও গিন্নি-ঠাকরুন, এখানে এসে দে দিকি এই দুষ্টু মেয়ে দুটোর পিঠে দুটো কিল বসিয়ে—

তরঙ্গিণী আসিয়া উভয়ের ঘোমটা খুলিয়া দিল। খুশি হইয়া জগদ্ধাত্রী বলিতে লাগিল, বাঃ বাঃ, চাঁদের মতো মেয়ে—লক্ষ্মী সরস্বতী দু'টি বোন। হ্যালা ও মেয়েরা, টিপিটিপি হাসছিস যে বড়। জানিস আমি কে?

বধূরা বোকা নয়। ছোটবউ বলিল, আপনি পিসিমা—

কৃত্রিম রাগ দেখাইয়া জগদ্ধাত্রী বলিল, জবাব শোন একবার। পিসিমা! গুণের নিধি শ্বশুরঠাকুর বলে দিয়েছেন বুঝি? কেন, শুধু মা হলে দোষটা কি? হ্যাঁরে, মা বেঁচে আছেন তো?

ছোটবধূর মুখ মলিন হইয়া গেল।

জগদ্ধাত্রী বলিল, নেই? খেয়ে দেয়ে অবসর হয়েছিস?

নানা কথায় বেলা বাড়িয়া আসিল। বহুকাল পূর্বে যখন এ যুগের এই সব নূতন মানুষের দল পৃথিবীকে দখল করিয়া বসে নাই, তখন এই গ্রামের মধ্যে এই বাড়ির চতুঃসীমায় এই উঠানের ধলার উপর অতীতের আর এক দল কিশোর-কিশোরী দিনের পর দিন যে সব হাসি ও অশ্রু ছড়াইয়া বেড়াইত সেই ক্ষীণ বিস্মৃত কণিকাগুলি একজনে কুড়াইয়া ফিরিতেছে, আর দুইজন তাহারই মুখের দিকে চাহিয়া একেবারে মগ্ন

হইয়া বসিয়া আছে। হঠাৎ বাহিরে অনেকগুলি গলার আওয়াজ শুনিয়া জগদ্ধাত্রী চুপ করিল।

ছোটবউ খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল, গল্পে গল্পে ফাঁকি দিয়ে কত বেলা করে দিলাম, আপনি কিচ্ছু টের পান নি। এত বেলায় মচ্ছবে গিয়ে আর হবে কি?

জগদ্ধাত্রী উত্তর করিল না। কান পাতিয়া ক্ষণকাল বাহিরের কথাবার্তা শুনিয়া একসময়ে সে উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল, হৃদয়ের গলা চিনিস তোরা? ও কি হৃদয় কথা বলছে? উঁহু···এখনও এলো না, আচ্ছা মানুষ!

মেজবউ বলিল, আপনি এসে বসে গল্প করুন মা, আমি কাপড় ছেড়ে জল-টল এনে দিচ্ছি, তারপর রান্না চাপিয়ে দেবেন। বেশ তো হচ্ছিল, আপনি ব্যস্ত হয়ে উঠে পড়লেন।

মৃদু হাসিয়া জগদ্ধাত্রী বলিল, গল্প করব বলে আসি নি মা, রান্না করব বলেও আসি নি—এসেছি কাজে। হৃদয়ই মুশকিল করল। ক্ষণপরে বলিল, বাড়িতে ট্যা-ভ্যা করছে না—তোদের বুঝি সে পাট হয় নি এখনও?

ছোটবউ ভালমানুষের মতো মেজবউকে দেখাইয়া কহিল, হয়েছে মেজদির একটা—সাত বছরের খোকা। মেজদি নিজেও এবার সতেরয় পড়েছে।

তাহার কানের পাশে কতকগুলি চুল উড়িতেছিল, খপ করিয়া তাই ধরিয়া আচ্ছা করিয়া টানিয়া মেজবউ ছোটবউকে শাস্তি দিল। সম্পর্কে ছোট জা, বয়সেও বোধ করি কিছু ছোট, শাস্তির কষ্টে সে হাসিয়া ফেলিল।

মেজবউ বলিতে লাগিল, ছেলে একলা আমার নয় মা, ওর-ও। বল্ তুই আভা, ছেলে তোর নয়? বল্—

আভা তাহা বলিতে পারিল না। বলিল, ছেলে আমাদের তিন শাশুড়ি-বউর। বলিয়া রান্নাঘরে তরঙ্গিণীর উদ্দেশে হাত তুলিয়া দেখাইল। বলিতে লাগিল, বড়-জা মারা যাবার পর থেকে নিতু থাকত মামার বাড়ি। গেল বছর এখানে এসেছে। সেই থেকে আদর দিয়ে দিয়ে মেজদি ওকে যা করে তুলেছে—

মেজবউ ঝঙ্কার দিয়া উঠিল, আর তুই বড্ড ভাল, না? মিথ্যে কথা বলিস নে আভা, তা-হলে তোর সমস্ত কীর্তি বলে দেব এক্ষুণি। জগদ্ধাত্রীর দিকে চাহিয়া হঠাৎ আর এক প্রশ্ন করিল, আপনার ছেলে-মেয়ে নেই?

স্মিত মুখে জগদ্ধাত্রী কহিল, কে বলল নেই? এই তো কতগুলি রয়েছিস তোরা।

উঠানের প্রান্তে ডালপালায় আচ্ছন্ন ছোট একটি পেয়ারাগাছ। সহসা নজরে পড়িল, গাছের নিচের দিককার ডালপালাগুলি ভয়ানক আন্দোলিত হইতেছে। সর্বাগ্রে নজর পড়িল মেজবউর।

কে রে? দু একটা কুশি পড়েছে, হতভাগাদের জ্বালায় থাকবার জো নেই। কে রে তুই, কথা বলিস নে?

ছোটবউ আগাইয়া উঁকি দিয়া দেখিয়া কহিল, আবার কে? সেই ডাকাত। ইস্কুল-টিস্কুল এর মধ্যে হয়ে গেছে তোমার? কখন এসে স্বুড়-স্বুড় করে গাছে চড়ে বসেছ—নেমে এসো এক্ষুণি—

ডাকাত বিনাবাক্যে নামিয়া আসিল। বাড়ির মধ্যে একমাত্র ছোটকাকিকে সে যৎকিঞ্চিৎ সমীহ করিয়া থাকে।

ছোটবউ বলিতে লাগিল, সেদিন মানা করে দিইছি, তবু ডালে ডালে হনুমানের মতো লাফাতে লেগেছ। হাত-পা ভেঙে পড়ে মরবে যে কোন দিন।

উচ্চকণ্ঠে পাড়া জানাইয়া বিশেষত একজন বাহিরের লোকের সামনে এই প্রকার তুলনামূলক আলোচনায় নিতাই অপমান জ্ঞান করিল। ঘাড় ফিরাইয়া হাত তুলিয়া বলিল, মারব।

ছোটবউ হাসিয়া বলিল, ইস্—কত বড় মুরোদ। আয় দিকি কাছে এগিয়ে, কে কাকে মারে—আয়—

নিতাই আর আগাইল না, তা বলিয়া পরাজয় স্বীকারও করিল না। স্বস্থানে দাঁড়াইয়া বীরোচিত ভঙ্গিতে পুনশ্চ কহিল, মারব।

জগদ্ধাত্রী উঠানে নামিয়া আসিল। কহিল, গুরুজনকে মারতে চাচ্ছ, এই তোমার বুদ্ধি হয়েছে খোকা? ছিঃ—

এবারে খোকার নজর পড়িল জগদ্ধাত্রীর উপর। মারব—বলিয়াই

বোধকরি তাহার মনে হইল, ভয় দেখাইবার এই মামুলি কথায় তেমন আর জোর বাঁধিতেছে না। সহসা আর এক পন্থা ধরিল, বলিল, দে আমায় রেলগাড়ি দে—

কাল যে দিলাম।

সে ছাই গাড়ি। কলের গাড়ি দিবি বলেছিলি, দে এক্ষুণি।

জগদ্ধাত্রী হাসিতে হাসিতে বলিল, রেলগাড়ি আমি গড়াই নাকি? মেলা থেকে কিনে তো দেব—

অতএব জগদ্ধাত্রী নিতান্তই বে-কায়দায় পড়িয়া গিয়াছে। দে এক্ষুণি—বলিতে বলিতে উদ্যত হাতে নিতাই তীব্রবেগে ছুটিয়া আসিল।

ছোটবউ তাড়া দিয়া উঠিল, খবরদার, ছুঁয়ে দিও না ওকে। শুদ্ধ কাপড়চোপড় পরে মঠবাড়ি যাচ্ছেন—

নিতাই ছুঁইল না। থুঃ থুঃ—কাবয়া মুখের সমুদয় চিবানো পেয়ারা জগদ্ধাত্রীর গায়ে ঢালিয়া দিল। দিয়াই পলাইতেছিল, জগদ্ধাত্রী ধরিয়া ফেলিয়া ঠাস ঠাস করিয়া পিঠে দিল দুই চাপড়। প্রবল চিৎকারে নিতাই আছড়াইয়া মাটিতে পড়িল।

তরঙ্গিণী কোথায় ছিল, হাঁ হাঁ করিয়া আসিল। সকলের দিকে অগ্নিদৃষ্টি হানিয়া বিনাবাক্যে সে ছেলে কাড়িয়া লইয়া গেল। ঘরের মধ্যে গিয়া নিতুর কান্না থামিল। তাহাকেই সম্বোধন করিয়া তরঙ্গিণী তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলিতে লাগিল, আর যদি কারও কাছে যাস হতভাগা ছেলে, মেরে একেবারে খুন করে ফেলব। শত্তুরের হাতে ছেলে ফেলে দিয়ে সব দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তামাসা দেখে।

তাহার পর কয়েক মুহূর্ত নিস্তব্ধতা। কোন দিক দিয়া কোন সাড়া আসিল না দেখিয়া এবারে তরঙ্গিণী ঘরের আড়া-খুঁটিগুলিকেই শুনাইয়া শুনাইয়া বলিতে লাগিল, মিছরির ছুরি। গ্রামসুদ্ধ মানুষ ডাকাডাকি, কি সমাচার?—না জমিদারি-তালুকদারি সমস্ত ফাঁকি দিয়ে খাচ্ছে, তার সালিশি হবে। আবার ইদিকে বাড়ির ভিতরে এসে কত রঙ্গরস! ছেলে খুন করবার মতলব—ধনে-প্রাণে মারতে এসেছে আমাদের।

মেজবউ কখন উঠিয়া গিয়াছে। ছোটবউ মুখ লাল করিয়া নখ খুঁটিতে লাগিল। জগদ্ধাত্রী কথা কহিল, কিন্তু কণ্ঠস্বরে উত্তাপ নাই,

বলিল, ছেলেকে অত আদর দিও না বউ। এক শাসন করলে ছেলে খুন হয়ে যায় না।

ঘরের মধ্য হইতে জবাব আসিল, পেটের ছেলেকে শাসন করুক গিয়ে লোকে—

ম্লান হাসি হাসিয়া জগদ্ধাত্রী বলিল, তা যে নেই।

মুখের কথা কাড়িয়া তরঙ্গিণী বলিতে লাগিল, ভগবান দেন নি। সে অন্তর্যামী—সব বোঝে, খুনে মেয়েমানুষের কোলে দেবে কেন? যে যেখানে ছিল সব শেষ করে এখন আমার সংসারে নজর দিতে এসেছে—

কি, কি বললি? জগদ্ধাত্রী বাঘিনীর মতো উঠিয়া চক্ষের পলকে উঠানের এই প্রান্ত অবধি আগাইয়া আসিল। বলিতে লাগিল, বুঝি গো বুঝি, খাওয়া জিনিষ উগরে দিতে বড্ড লাগে। কিন্তু এত দেমাক? দর্পহারী আছেন, এখনও চন্দ্রসূয্যি আছে। আমি আর কি বলব।

গলা আটকাইয়া আসিল, সামলাইয়া লইয়া বোনকবি যাহাতে সেই দর্পহারীর কান পর্যন্ত পৌঁছিতে পারে এমনি উচ্চকণ্ঠে বলিতে লাগিল, ছেলের দেমাকে মরে যাচ্ছিস, তবু যদি নিজের ছেলে হত! খোঁটা দেবার জিনিষ এ নয় বউ, এক দণ্ডে কার কি হয়ে যায় কেবল ঐ উপরওয়ালা জানে—

মুহূর্তের জন্য জগদ্ধাত্রীর বোনকবি একটি অতি চরমক্ষণের কথা মনে পড়িয়া গেল। বিয়ে তখন তার খুব বেশি দিন হয় নাই। নতুন গিন্নিপনার আনন্দে লজ্জায় দিনগুলি উড়িয়া চলিয়া যায়। জগদ্ধাত্রী ছ-মাসের অন্তঃসত্ত্বা। স্বামী কণ্ট্রাক্টরি কাজ করেন, দুপুরের পর দিব্য পান চিবাইতে চিবাইতে ভালমানুষ বাহির হইয়া গেলেন, ঘণ্টা দুই পরে তাঁহাকে ফিরাইয়া আনিল। সর্বাঙ্গ রক্তে ভাসিতেছে, চক্ষু মুদ্রিত, এক উঁচু পাঁচিলের উপর হইতে পড়িয়া গিয়া প্রাণটুকু ধুকধুক করিতেছিল, বাড়ি আনিবার পথে তাহা নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। জগদ্ধাত্রী আছাড় খাইয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িল। একবার জ্ঞান হয়, আবার তখনই অজ্ঞান হইয়া পড়ে। পরের দিন প্রসব করিল অপরিণত একটি রক্তপিণ্ড, মানব-শিশু বলিয়া তাহাকে চিনিবার জো নাই। মিছা

কথা নয়—মিছা কথা বলে নাই তরঙ্গিণী। মা হইয়া নিজের শিশুকে সত্যই সে খুন করিয়াছে। তারপর কতদিন গিয়াছে, এখনও মাঝে মাঝে সেই সব মনে পড়িয়া দৃষ্টি তাহার ঝাপসা হইয়া আসে।

বাহিরে তখন অনেকগুলি কণ্ঠ চিৎকারের যেন প্রতিযোগিতা চালাইয়াছে। হৃদয় ব্যস্ত হইয়া আসিয়া ডাকিল, দিদি, আসুন তো শিগগির। তারপর হাসিয়া গলা খাটো করিয়া বলিতে বলিতে চলিল, আচ্ছা এক মজা হয়েছে। বিপিন চক্কোত্তি-টক্কোত্তি সবাই হাজির, তারই মধ্যে ক্ষেত্তোর-দা আপনাকে সাক্ষি মেনে বসেছেন। এইবার আপনি সব কথা বলুন গিয়ে—

ক্লান্তি জগদ্ধাত্রীর মুখের উপর বিস্তীর্ণ হইয়াছে। করুণকণ্ঠে বলিল, ওর মধ্যে আর আমাকে কেন? আমি বাইরের দিকে থাকব। তুমি যা হয় কর গিয়ে হৃদয়, ঐ গণ্ডগোলে আমাকে টেনো না।

সে কি? হৃদয় আশ্চর্য হইয়া কহিল, গণ্ডগোল কোথায়? এত ঠিকঠাক করে শেষকালে পিছিয়ে গেলে চলে? বলিয়া তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া দেখিল। বলিতে লাগিল, আমার দিদি এক কথা। ষাটটি টাকা দেবো, নগদই দেবো—কাল চান কালই পাবেন। আপনি গিয়েই ঘর মেরামত আরম্ভ করতে পারবেন। কিন্তু দশজনের মোকাবেলা জমিটা নির্গোল হওয়া চাই।

একটু চুপ থাকিয়া মৃদু মৃদু হাসিয়া আবার বলিল, বাপের বাড়ির গ্রাম—কার সামনে বেরুতে লজ্জা হচ্ছে ঠিক করে বলুন তো? ক্ষেত্তোর-দা রয়েছেন বলে বুঝি—

তীক্ষ্ণ স্বরে জগদ্ধাত্রী বলিয়া উঠিল, আমি কাউকে গ্রাহ্য করি নে। চলো—

গ্রামের অনেকেই আসিয়াছেন। বিপিন চক্রবর্তী মহাশয় বয়সে সকলের বড়; এতক্ষণ যা কথাবার্তা হইয়াছে, জগদ্ধাত্রীকে সংক্ষেপে বুঝাইয়া দিলেন। মাঝখানে হৃদয় বাধা দিয়া বলিল, ও সেটেলমেণ্টের কথা ধরবেন না আপনারা, ট্যাকে দু-পয়সা গুঁজতে পারলে 'হয়'কে স্বচ্ছন্দে 'নয়' করা যায়। সহায়রাম জেঠার বসতবাড়ি ছিল সিদ্ধ নিষ্কর। তিনি মারা যাবার পর ঘরদোর পড়ে গেল, ভিটের উপর

একহাঁটু জঙ্গল হয়ে পড়ল। তারপর ক'বছর পরে ক্ষেত্তোর-দা ওঁর উত্তর-বাগের বেড়াটা ঘুরিয়ে ও-জমিটাও ঘিরে ফেললেন। আমি বললাম, ক্ষেত্তোর-দা, কাণ্ডটা কি? জবাব দিলেন, ওরা দেশে-ঘরে এসে যখন দাবি করবে তখন ছেড়ে দেব, পোড়ো জায়গাটুকু বেড়া দিয়ে নিলে ওদিকে মজা-দীঘি পড়ে যায়, দু-পাশে আর বেড়া বাঁধতে হয় না, অনেক খরচের আসান হয়।...তখন কেউ আর বাদি হয় নি, এসে ঝগড়া করতে কার মাথাব্যাথা পড়েছে? এবার জগদ্ধাত্রী-দিদি তাঁর পৈতৃক ভিটে চাচ্ছেন—অনাথা বেওয়া মানুষ, আপনারা দশজনে বিচার করুন—

ক্ষেত্রনাথ গর্জন করিয়া উঠিলেন, মিথ্যে কথা।

বিপিন চক্রবর্তী বলিলেন, তা হলে তুমি যা বলবে, বল ক্ষেত্তোর নাথ—

ক্ষেত্রনাথ ক্রুদ্ধকণ্ঠে ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, আমি কিছু বলব না চক্কোত্তি মশায়, আমি তো বলেছি—আমি এক কথাও বলব না। ও-ই বলুক। উত্তেজনার বশে স্বর কাঁপিতে লাগিল। বলিলেন, হৃদয়ের সঙ্গে যোগ-সাজশ করে বড় আজ বাদি হতে এসেছে, ও বলুক আজ আপনাদের দশজনের সামনে—ওর বিয়ের পরদিন ফাল্গুন মাসের সতের তারিখ...তারিখটা পর্যন্ত আজো মনের মধ্যে গাঁথা রয়েছে—কুলীন বরযাত্রীরা বেঁকে বসল, মর্যাদা না পেলে খাওয়া-দাওয়া করবে না। সহায়রাম খুড়ো চোখে অন্ধকার দেখলেন—সেই সময় কে রক্ষে করল? বলো জগদ্ধাত্রী, বলো—মনে আছে-সে সব দিনের কথা? আমার মা'র বাজুবন্ধ কেশব দত্তর কাছে বন্ধক দিয়ে চল্লিশ টাকা এনে দিলাম, সহায়রাম খুড়ো আমার হাতখানা ধরে কেঁদে ফেললেন। বললেন, মেয়ে আমার রাজার ঘরে গেল—সে কিছু নিতে-থুতে আসবে না। তোমার এ টাকা শোধ করতে পারি ভাল, না পারি জমাজমি বাড়ি-ঘর-দোর সমস্ত তোমার। থাকত যদি কেশব দত্ত বেঁচে, সে বলত, এখন ও-ই বলুক—

জগদ্ধাত্রী আগড়ের বাঁশ ধরিয়া অন্য দিকে চাহিয়াছিল, তাহাকে উদ্দেশ করিয়া বলিতে লাগিলেন, বলো সব। সহায়রাম কাকা মাদুরে বসে, তুমি খাটের পাশে দাঁড়িয়েছিলে লাল বেনারসি পরে। অনেক

বরযাত্রী বউ দেখতে এলো সেই সময়—বল তুমি, সে সত্যি নয়? আমি এককথায় সমস্ত ছেড়ে দিচ্ছি।

জগদ্ধাত্রী কথা বলিল না, তেমনি মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। জবাব দিল হৃদয়। বলিল, কিন্তু আমরা শুনেছি, সে টাকা শোধ হয়ে গেছে। তা ছাড়া চল্লিশ টাকায় অতটা নিষ্কর জমি হতে পারে না।

ক্ষেত্রনাথ বলিলেন, তোমরা স্বপ্নে শুনেছ। চল্লিশ টাকা কি বলছ—কেশব দত্তর কাছ থেকে বন্ধক ছাড়িয়েছিলাম তার ডবল আশি টাকা দিয়ে। তার উপর আরও কত বছর হয়ে গেল, সুদের সুদ তস্য সুদ ধরব না? কত টাকা হয় তা হলে? সিকি পয়সা বেহাত দিচ্ছি নে।

একটু থামিয়া বলিতে লাগিলেন, আজ হৃদয় তোমার বড় আপনার হল জগদ্ধাত্রী, কোথায় ছিল সেদিন ওরা? ওর বাপ বরদাকান্ত সেইখানেই ছিলেন, চল্লিশটা পয়সা দিয়ে কোন সুহৃৎ সেদিন সাহায্য করে নি।

জগদ্ধাত্রী একবার হৃদয়ের মুখের দিকে চাহিল। তারপর বলিল, বাবা কেশব দত্তর টাকা শোধ করে দিয়েছিলেন।

অগ্নিদৃষ্টিতে চাহিয়া ক্ষেত্রনাথ বলিলেন, তোমার কাছে টেলিগ্রাফ হয়েছিল বুঝি?

বাবা চিঠি লিখেছিলেন।

দেখাও চিঠি।

জগদ্ধাত্রী একটু ইতস্তত করিয়া কহিল, এত দিনের চিঠি তাই কি থাকে?

ক্ষেত্রনাথ অধীর কণ্ঠে কহিতে লাগিলেন, থাকে, থাকে—সত্যি হলে সমস্ত থাকে। আমার কাছে টুকরা কাগজখানি অবধি রয়েছে। পাঠশালে যে দাগা বুলিয়েছ তা পর্যন্ত বের করে দেখাতে পারি। বলিয়া মৃদু হাসিয়া বলিলেন, এত কথা শিখিয়ে দিতে পেরেছ হৃদয়, আর একখানা চিঠি যেমন তেমন করে জোগাড় করে রাখতে পার নি?

হৃদয়ও মহাক্রোধে সমুচিত জবাব দিতে যাইতেছিল, নিবারণ মজুমদার মধ্যবর্তী হইয়া কলহ থামাইয়া দিল। নিবারণ কহিল, মোটের উপর আপনি কিন্তু হেরে গেলেন চাটুজ্জে মশায়, জগদ্ধাত্রী ঠাকরুনকে সাক্ষি মেনেছিলেন আপনিই—

ক্ষেত্রনাথ সে কথা আমলেই আনিলেন না। হাতমুখ নাড়িয়া কহিতে লাগিলেন, কিসের ঠকা? ও মিথ্যেবাদী, মহাপাপী—যা বলবে তাই হবে নাকি? আইন-আদালত রয়েছে, মামলা করে নিকগে। আমার আজ চল্লিশ বছরের দখল, গ্রামের সমস্ত লোক দেখছে, মিথ্যে বলে ও তো কেবল নিজের পরকাল খোয়াল—আমার কি?

নিবারণ কহিল, গ্রামের সমস্ত লোক আপনার দিকে সাক্ষি দেবে, তা-ই বা কি করে জানলেন?

ক্ষেত্রনাথ কহিলেন, দিক ঐ দিকে সাক্ষি—গ্রাহ্য করি নে। এটা কোম্পানির রাজত্ব—আমার দলিল রয়েছে, জরিপের রেকর্ড—তার উপর মতি বিশ্বেসের মেয়াদি কবলুতি। বিপিন চক্রবর্তীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, চকোত্তি মশায়, আপনি বসুন একটু। যখন পায়ের ধুলো পড়েছে মতি বিশ্বেসের কবলুতিটা একবার দেখে যান।

দ্রুতপায়ে ক্ষেত্রনাথ ঘরে গেলেন।

ঘরের কোণে দেবীদাস নায়েবের সিন্দুক বিছানায় বালিসে বিলুপ্ত হইয়া রহিয়াছে, কোন চিহ্ন নজরে পড়ে না।

ক্ষেত্রনাথ দলিলের দুই নম্বর বাক্স খুলিয়া মুহূর্ত মধ্যে কবলুতি লইয়া বাহিরে আসিলেন।

দেখুন, দেখুন রেজিস্ট্রির তারিখটা হল কোন সাল? হিসেব করে দেখুন, তেত্রিশ বছর হয়ে গেছে। বিশ্বেস জঙ্গল কেটে চাষবাস করবে এই চুক্তিতে মেয়াদি বন্দোবস্ত। আপনি তো বৈষয়িক লোক—বলুন এবার দখলি-স্বত্ব প্রমাণ হল কি না?

ফিরিবার পথে বিপিন চক্রবর্তী বকিতে লাগিলেন, আমি বুড়ো-মানুষ, অনর্থক আমাকে এই সব হাঙ্গামে টেনে আনা। কেঁদে করবি কি মা জগদ্ধাত্রী, ওর আর কোনো উপায় নেই। বাঘের মুখ থেকে মানুষ ফেরে, কিন্তু ক্ষেত্তোর চাটুজ্জের হাত থেকে বিষয় সম্পত্তি ফিরেছে কেউ কোনো দিন শোনে নি। সেবারে কি হল, ঐ বামুনডাঙার ভড়দের সঙ্গে? ভড়দের সেজবাবু এত লাফালাফি—হেন করেঙ্গা তেন করেঙ্গা—শেষ কালে দেখি ক্ষেত্তোরনাথ ওয়াশিলাতসুদ্ধ আদায় করে নিলে। মনে পড়ছে না হে নিবারণ?

বিকালবেলা ক্ষেত্রনাথ সেই চণ্ডীমণ্ডপেই বসিয়াছিলেন। মাদুরের উপর একদল প্রজা-পাটক। গোমস্তা রাখাল হাতি দাখিলা লিখিয়া টাকা লইতেছিল। নানারূপ গল্প হইতেছিল, বিশেষ করিয়া ও-বেলাকার বিজয়-কাহিনী। রাখাল একবার মুখ তুলিয়া বলিল, ঠাকরুনের শ্বশুর-বাড়িরা তো খুব ধনীলোক—

হা—হা করিয়া হাসিয়া ক্ষেত্রনাথ কহিলেন, খুব ধনী—বুঝলে, একেবারে রাজা রাজবল্লভ। আমার ভায়া একদিন গেছলেন সেখানে। তার মুখে রাজবাড়ির বর্ণনা পাওয়া গেল। ভাঙা পাঁচিলের উপর একখানা দোচালা, নারকেল-পাতার ছাউনি, অগুন্তি ফুটো। শুয়ে শুয়ে দিব্যি চাঁদের আলো পাওয়া যায়।

রাখাল বলিল, দেশেও তো ওদের বিস্তর জমিজমা ছিল, সে সব কি হয়ে গেল?

ক্ষেত্রনাথ বলিলেন, দেনাও ছিল একরাশ। সবাই মরে হেজে গেল, মহাজনেরা আর সবুর করল না। এখন থাকবার মধ্যে ঐ দোচালা অট্টালিকা আর বিঘেখানেক আমবাগান—

বলিতে বলিতে হাসির মধ্যে অকারণেই ক্ষেত্রনাথ রুখিয়া উঠিলেন, কিন্তু আমি এই বলে দিলাম রাখাল, আমার কাছে যেন সিকি পয়সার প্রত্যাশা না করে। তোমাকে হুকুম দেওয়া রইল, উমানাথ হোক আর সে নিজেই হোক যদি এসে প্যানপ্যান করে—সিকিপয়সার সাহায্য না পায়। ঘাড় ধরে বের করে দিও—মিথ্যেবাদী হাড়বজ্জাত সব! ব্যবহারটা কি রকম দেখলে? টাকার অভাব হয়েছে—আগে যদি আসত আমার কাছে, এসে কেঁদে-কেটে পড়ত, আমি কি ফেলে দিতে পারতাম, না দিইছি কোনদিন?

রাগের বশে এ কথাটা মনে পড়িল না, জগদ্ধাত্রী সর্বাগ্রে তাঁহাকেই অন্তত পনর-বিশখানা চিঠি লিখিয়াছে।

ক্রমে বেলা পড়িয়া আসিল। বাহিরবাড়ির সীমানায় ঘনসন্নিবিষ্ট তলতা-বাঁশের ঝাড়, তার ওদিকে রাস্তা, রাস্তার পরপারে সহায়রাম রায়ের সেই পোড়া ভিটা-বাড়ি। সেখানে আজকাল সরিষাক্ষেত, হলুদবরণ অজস্র ফুল ফুটিয়াছে। ক্রমে দু-একজন করিয়া লোক জমিতে

আরম্ভ করিল, কি কথায় উঠিল বাতাবি লেবুর গল্প, হইতে হইতে আধমুনে কৈলাস। এই কৈলাসটি কে, কোথায় তাঁর জন্ম, সে খবর কেউ জানে না। গল্প আছে, আধ মনের কমে তাঁর পেট ভরিত না। একবার কোন রাজবাড়িতে তিনি অতিথি হন। বিকাল-বেলা সরকার মহাশয়ের কানে গেল, ব্রাহ্মণ তখন পর্যন্ত অভুক্ত। বৃত্তান্ত কি? অতিথিশালায় ছুটিয়া আসিয়া দেখেন, সিধায় যে আধ-সেরখানেক চাউল দেওয়া হইয়াছিল, কৈলাসচন্দ্র স্নানাদির পর সে-ক'টি মুখে ফেলিয়া এক ঢোক জল খাইয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছেন, আর কি করিবেন?

সেকালের কথা কহিতে কহিতে অকস্মাৎ ক্ষেত্রনাথ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিলেন। কি দিনকালই ছিল! স্বর্গে গেছেন তাঁরা, সে-সব মানুষও আর আসবে না—তেমন হাসি-ফুর্তি আমোদ আহ্লাদও হবে না কোনদিন! একটা নিশ্বাস চাপিয়া বলিতে লাগিলেন, মনে হয় যেন কালকের কথা, স্পষ্ট চোখের উপর ভাসছে কিন্তু কোথায় বা কে!

আরও ঘোর হইয়া আসিল। রাখাল কাগজপত্র তুলিয়া রাখিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। ক্ষেত্রনাথও আসিলেন। হঠাৎ যেন তাঁহার নজরে ঠেকিল, আবছা মতন একটা লোক অতিশয় মন্থর গমনে রাস্তা পার হইয়া সরিষাক্ষেতে ঢুকিয়া পড়িল।

দেখ তো, দেখ তো একবার রাখাল—

অত দূর অবধি স্পষ্ট করিয়া ঠাহর হয় না, তবু যেটুকু নজরে পড়িল তাহাতেই ক্ষেত্রনাথ ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন। বলিলেন, নিশ্চয় বাইতি-পাড়ার সৈরভী, বদমায়েসের ধাড়ি। ভেবেছে অন্ধকারে বুড়ো দেখতে পাবে না—

কাঁপিতে কাঁপিতে লাঠি লইয়া নিজেই নামিয়া পড়িলেন। সামনে উমানাথকে আসিতে দেখিয়া বলিলেন, ছুটে যাও, গিয়ে ঐ মাগীর চুলের মুঠো ধরে নিয়ে এসো এখানে। তোলাচ্ছি আমি সর্ষেফুল! হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে এসো।

উমানাথ বলিল, উনি জগদ্ধাত্রী-দিদি। মঠবাড়ির মচ্ছব থেকে ফিরে এলেন এতক্ষণে।

ক্ষেত্রনাথ আরও ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, নবদ্বীপের মা-গোঁসাই এলেন। বের করে দিয়ে এসোগে। মামলা করে দখল নিয়ে তারপর যেন আমার ক্ষেতে ঢোকে।

উমানাথ ইতস্তত করিতে লাগিল। ক্ষেত্রনাথ কিছুকাল গুম হইয়া থাকিয়া বলিলেন, ঘরভেদি বিভীষণেরা সব পিছনে আছ, তা বুঝেছি। গালমন্দ না দিতে পার, গিয়ে ভাল কথায় কি বলা যায় না—দিদি, যা তুলেছ তুলেছ—আর তুলো না। এখন ফুল তুললে সর্ষের ফলন হবে না—

উমানাথ কহিল, উনি সর্ষেফুল তুলছেন না। ভিটের উপর গিয়ে আছড়ে পড়লেন—কাঁদাকাটা করেছেন না, কিছু না। দুপুরবেলাতেও ঐ রকম আর একবার দেখেছি।

আরও খানিক দাঁড়াইয়া উমানাথ আবার কহিল, আমি বললে কি যাবেন? আপনি গিয়ে একবার দেখে আসুন।

অর্থাৎ স্থূলকথা, তাহার দ্বারা এ কাজ হইবে না।

ক্ষেত্রনাথ তখন পায়ে পায়ে নিজে চলিলেন।

সরিষা-ক্ষেতের এক পাশে বড় একটি দেবদারুগাছ, তাহার গোড়ায় আসিয়া দেখিলেন—অনতিস্পষ্ট জ্যোৎস্না উঠিয়াছে, সেই আলোকে প্রথমটা নজরে আসিল না—তারপর দেখিলেন,—হলুদ-বরণ ফুলের মধ্যে সাদা কাপড়ে ঢাকা আবছা একটি মূর্তি মাটির উপর একেবারে ডুবিয়া আছে। ক্ষণকাল চুপ থাকিয়া ক্ষেত্রনাথ মনে মনে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিলেন। কথা বলিতে হয়, তাই যেন বলিলেন, কে ও? জগো?

জগদ্ধাত্রী চমকিয়া উঠিয়া গম্ভীর কণ্ঠে ডাকিল, পল্টুদা!

সেখানেই ক্ষেত্রনাথ বসিয়া পড়িলেন। দুইজনে চুপচাপ। চল্লিশ বছর পরে মুখোমুখি বসিয়া কিসের নেশায় মন ঝিমাইয়া আসিতেছে।···

হলুদরঙের ফুলে ভরা জনশূন্য নিস্তব্ধ ক্ষেতের উপরে আলতা রাঙা পা ফেলিয়া ঘরের লক্ষ্মী বা এঘরে ওঘরে সন্ধ্যা দেখাইয়া ফিরিতে লাগিলেন। সামনের আশশ্যাওড়া ও ভাঁটের জঙ্গলের উপর দেখিতে দেখিতে গড়িয়া উঠিল, দক্ষিণি কারিগরের তৈরি প্রকাণ্ড আটচালা ঘর

একখানি। ভিতরে জোড়া-তক্তপোষে ফরাসের উপর ঝকঝকে সাপের মাথায় হুঁকাদান, তার উপর রূপাবাঁধানো হুঁকা। কলিকায় তামাক পুড়িয়া যাইতেছে, ও-পাড়ার বৈকুণ্ঠ চাটুজ্জে হাত বাড়াইয়াছেন, কিন্তু হুঁকার নাগাল পান নাই। পাশার দান পড়িতেছে, চিৎকারে ঘর কাঁপিয়া যাইতেছে, ফিরিয়া তাকাইবার ফুরসৎ কাহারও নাই। বৈকুণ্ঠ আসিয়াছেন, কেদারনাথ বরদাকান্ত আসিয়াছেন, আরও কে কে যেন—নজর যায় না। বাড়ির মধ্যে দমাদম ঢেঁকির পাড় পড়িতেছে, নাড়ু-ভাজার গন্ধ—কানে পৈতা জড়ানো ফর্শা-বউ কে খড়ম খটখট করিতে করিতে দীঘির ঘাট হইতে এইদিকে আসিতেছে। কে ডাকিয়া উঠিল, ও জগো, ঘুমুস নি—ওঠ, ভুটো পেরে নিগে আগে, তারপর—

চুপ, চুপ, চুপ। নিশ্বাসেরও যেন শব্দ না হয়, উহারা কত কি কথা কহিতেছে—ভাল করিয়া শুনিতে দাও···

অনেকক্ষণ পরে ক্ষেত্রনাথ বলিয়া উঠিলেন, কেন তখন অতবড় মিথ্যে কথা বললে? হৃদয় তোমার আপনার হল? ঘর সারাবার টাকার দরকার—আমায় যদি আগে ভাল ভাবে বলতে পারো, দু-পাঁচ টাকা দেবার সঙ্গতি আমার কি নেই?

বড়বাবু। হঠাৎ নাগাল হাতির কণ্ঠস্বর। সে বাড়ি যাইতেছিল, রাস্তা হইতে বলিয়া গেল, আমি চললাম বড়বাবু।

ক্ষেত্রনাথ একবার কাসিয়া চারিদিক তাকাইয়া বলিলেন, এখানটা ছিল পথ, তুমি পাল্কির মধ্যে উঠে বসলে। কপালে সোনার সিঁথিপাটি ছিল—না?

পথ ওদিকে। এটা বাইরের উঠোন। তুমি সমস্ত ভুলে গেছ। বলিয়া একটু থামিয়া ম্লান হাসিয়া জগদ্ধাত্রী আবার বলিল, কতদিন পরে বাপের বাড়ি এসেছি পল্টুদা, চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর পরে—

ক্ষেত্রনাথ তাহারই কথার প্রতিধ্বনি করিলেন, গিয়েছিলে একরত্তি মেয়ে, ফিরে এলে কি রকম—

তোমারও কি সে-রকম সব আছে? চুল পেকে গেছে, সামনের দাঁত নেই।

তা হোক, তা হোক! ক্ষেত্রনাথ ব্যাকুল হইয়া সমস্ত যেন চাপা

দিতে চাহেন। বলিলেন, তুই আর পন্টুদা বলে ডাকিস নে জগো, ডাক শুনে চমকে উঠি—গা'র মধ্যে কেমন করে ওঠে যেন। মা মারা যাবার পর থেকে ও-নাম ভুলে বসে আছি। আজকাল দশ-গ্রামের লোকে আমায় মানে গণে—এর মধ্যে ছেলেবয়সের ঐ ডাক-নাম—না-না-না, ও বলে আর ডাকিস নে, বুঝলি ?

বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

হিমে সরিষা-বন ভিজিয়া গিয়াছে, ঝিঁঝি ডাকিতেছে, চাঁদের আলো তীক্ষ্ণ ছুরির মতো গাছপালা বিদীর্ণ করিয়া মাটিতে আসিয়া পড়িয়াছে। নিশুতি গ্রাম ; চারিদিক কি মায়ায় থমকিয়া আছে ! উঠিয়া দাঁড়াইয়া নিশ্বাস ফেলিয়া ক্ষেত্রনাথ ডাকিলেন, চল যাই।

আবার সহসা বলিয়া উঠিলেন, আমার টাকাটার একটা কিনারা করে দে জগদ্ধাত্রী, তোর বাপের ভিটে তোরই থাকুক। শুধু ঐ আশিটা টাকা দে—সুদ-টুদ আর চাই নে—সরষে-কলাই আম-কাঁঠালে যাই হোক কিছু ঘরে তো উঠেছে।

জগদ্ধাত্রী জবাব না দিয়া একটুখানি হাসিল। কয়েক পা গিয়া রাস্তায় পড়িয়া বলিল, ও সব মরুকগে—তুমি আমায় শুধু চারটে টাকা দিতে পার ? দু-টাকা এই আসবার গরুর গাড়ি ভাড়া, আর দু-টাকা ফিরে যাবার।

তার মানে শেষকালে তো বলে বেড়াবি, জমিটা ফাঁকি দিয়ে নিলে। চিরকালের খোঁটা। ও সব আমি পারব-টারব না বাপু—যা কিছু আছে তোমার, নিয়ে আমায় অব্যাহতি দাও।

নিঃশব্দে আরও কয়েক পা আসিয়া আবার ক্ষেত্রনাথ কথা কহিয়া উঠিলেন, টাকার দরকার থাকে, সিন্দুক বিক্রি কর—দিচ্ছি টাকা··· এমনি কে কাকে টাকা দিয়ে থাকে ? সেই যে দেবীদাস রায়ের দরুন সিন্দুক—সিন্দুক নয়, ক'খানা ভাঙা তক্তা। সেবারে লিখেছিলে, তাই নিয়ে এসে সেই অবধি টানাটানি করে মরছি। চার-টার নয়, পুরোপুরি পাঁচই নিয়ে নিয়ো—ক্ষতি-লোকসান যা হয় হোকগে, আর কি হবে—

বাড়ি ফিরিয়া ক্ষেত্রনাথ চুপচাপ বসিয়া রহিলেন। খানিক পরে আভা পা ধুইবার জল দিয়া গেল। তারপর আহ্নিকের আয়োজন

করিতে আসিয়া দেখিল, জলচৌকির উপর তিনি যেমন বসিয়াছিলেন তেমনই আছেন—যেন তাঁহার সম্বিৎ হারাইয়া গিয়াছে। ক্ষেত্রনাথ বড় শঙ্কিত ভাবে তাড়াতাড়ি জলের ঘটি টানিয়া লইলেন। বলিলেন, বউমা, তোমার ছোট-মাকে ডাকো দিকি একবার—

তরঙ্গিণী সামনে আসে না, সম্পর্কে বাধে। কবাটের ওধারে আসিয়া দাঁড়াইল।

মুখখানা অতিশয় ম্লান করিয়া ক্ষেত্রনাথ বলিতে লাগিলেন, সর্বনাশ হয়েছে মা, বিষম সর্বনাশ। সহায়বামের সবষে-বন না ছেড়ে আর উপায় নেই। গ্রামসুদ্ধ সব একজোট। মামলা করবে—আপোষে না দিলে হাজার টাকা খেসারত আদায় করবে—

করুক গে। এতবড় ভয়ানক কথাটাকে একেবারে অগ্রাহ্য করিয়া উড়াইয়া দিয়া তরঙ্গিণী বলিল, আভা, বল্ তুই—ওসব ঠাকরুন মিথ্যে করে ভয় দেখিয়েছেন। গ্রামের লোকের বয়ে গেছে।

গম্ভীরভাবে ঘাড় নাড়িয়া ক্ষেত্রনাথ বলিলেন, তা বলা যায় না—

করে করুক। আমরাও দেখব শেষ অবধি। রায় দিয়া তরঙ্গিণী চলিয়া যাইতেছিল, ক্ষেত্রনাথ আবার ভয়ে ভয়ে বলিলেন, আবার তার সিন্দুক ফিরে চাচ্ছে।

তরঙ্গিণী এক মুহূর্ত থমকিয়া দাঁড়াইল। বলিল, সিন্দুক-টিন্দুক নেই। আভা, বলে দে—সে ভেঙে চুরে করে উই ইঁদুরের পেটে চলে গেছে।

কিন্তু কাল যে নিতে আসবে, আমি স্বীকার করে এসেছি।

কাল? আসুক আগে, তখন দেখা যাবে।

দৃপ্ত ভঙ্গিতে তরঙ্গিণী চলিয়া গেল। ক্ষেত্রনাথ চুপ হইয়া গেলেন।

সিন্দুকের বৃত্তান্ত হৃদয়ও শুনিল। শুনিয়া নূতন করিয়া সে রুখিয়া উঠিল।

আপনি নিশ্চয়ই হাতে-নাতে ধরে ফেলেছিলেন—না দিদি?

জগদ্ধাত্রী চুপ করিয়া রহিল। হৃদয় বলিতে লাগিল, নইলে ও কি স্বীকার করে? ও বুড়ো কি কম পাজোর? ওটা আমার চাই। এই

একখানা জমি নিয়ে কতদিন আপনার পিছনে ঘুরলাম, কত পয়সা ব্যয় করলাম—সমস্ত গেল ফেঁসে।

ইহারও ভাল-মন্দ কোন জবাব না পাইয়া আরও উত্তেজিত কণ্ঠে বলিতে লাগিল, পাঁচ টাকা কি—আমি দশ টাকা দেব, আমাকে দিন ঐ সিন্দুক। বাবাকে একদিন না-হক দশকথা শুনিয়ে চোখের সামনে দিয়ে হিড়-হিড় করে ক্ষেত্তোর-দা ঐ সিন্দুক ঘরে তুলেছিল, ও-ই আবার আমি ওর ঘর থেকে টেনে বের করব। কড়ায় গণ্ডায় সমস্ত শোধ তুলব, তবে আমি বরদাকান্তর বেটা।

পরদিন জগদ্ধাত্রী আসিল। সঙ্গে হৃদয়। বলিল, সিন্দুকটা কি রকম আছে, দেখি একবার। ক্ষেত্রনাথ ঘরের মধ্যে গিয়া এদিক-ওদিক তাকাইয়া ভিতরের দিককার দরজা বন্ধ করিলেন, তারপর ঝনাৎ করিয়া চাবি ফেলিয়া দিয়া নিস্পৃহ ভাবে তামাক খাইতে লাগিলেন। উমানাথ বালিশ-বিছানা সিন্দুকের উপর হইতে নামাইতে লাগিয়া গেল।

কড কড—কড়াৎ। প্রকাণ্ড লোহার তালা কতকাল মরিচা ধরিয়া আছে। গোড়ায় কিছুতে চাবি ঢোকে না, অনেক ঝাঁকাঝাঁকি টানা-টানি করিতে করিতে অবশেষে শিকলের মাথা ভাঙিয়া ঝুলিয়া পড়িল। উমানাথ ডালা তুলিল।

বিশ্রী ভাপসা গন্ধ। তারপর স্রোতের জলের মতো আরশুলার ঝাঁক বাহির হইতে লাগিল। ভিতরটায় অতলস্পর্শী অন্ধকার।

হৃদয় উঁকি দিয়া বলিল, বাপ রে, তালপাতার আঁস্তাকুড়! ঝেঁটিয়ে ফেল—ঝেঁটিয়ে ফেল। ভিতরের ঐ দু-দিক তলা-মাথা কেমন আছে দেখি আগে। বলিয়া ঝাঁটার অভাবে সে নিজেই দুই হাতে একবোঝা ঝপ করিয়া ফেলিয়া দিল, তারপর আর এক বোঝা। তালপাতার পুঁথি, পুঁথির উপর চিত্র-বিচিত্র কাঠের পাটা, ক'খানা তুলোট কাগজের পুঁথিও রহিয়াছে। হাতে তুলিতে সমস্ত টুকরা হইয়া মাটিতে ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

রোসো, রোসো, সব যে গেল! উমানাথ ব্যাকুল হইয়া তাড়াতাড়ি হৃদয়কে হঠাইয়া দিল।

হৃদয় বলিল, রাগ কোরো না, একেবারে ফেলে দিই নি। তোমাদের উনুন ধরাতে কাজে লাগবে।

উমানাথ তখন মাটির উপরে ছড়ানো ছিন্নবিচ্ছিন্ন টুকরাগুলি সাজাইতে লাগিয়া গিয়াছে। হৃদয়ের দিকে মুখ ফিরাইয়া কহিল, এ-সব সোনার গুঁড়ো হৃদয়, এ চিনবার ক্ষমতা তোমার নেই। এই সার্বভৌমের পুঁথির স্বাদ নিতে দেশদেশান্তর থেকে কত কত পড়ুয়া ছুটে আসত--

সে কবি লোক। পূর্বগামী মহাজনেরা তাঁহাদের অতি আদরের যে-কথাগুলি উত্তর-পুরুষের জন্য যত্ন করিয়া পুঁথির পাতায় গাঁথিয়া রাখিয়া নিশ্চিন্ত বিশ্বাসে চক্ষু মুদিয়াছিলেন, তাহাদের এই অবহেলার বেদনা তাহার বুকে আসিয়া আঘাত করিতে লাগিল। বলিল, এই পাতাগুলোয় রয়েছে সহায়রামের গান, ধানক্ষেতে চাষাভুষোর মুখে একদিন শুনে এসো। তারা ভুলে যায় নি।··কিন্তু এটা কি?

একখানি লম্বা আকারের খাতায় গোল গোল মোটা হরপে গঙ্গা-স্তোত্র, দাতাকর্ণ এবং আরও কত কি উপাখ্যান। উমানাথ পাতা উল্টাইতে জিজ্ঞাসা করিল, এটা আবার কার গান?

জগদ্ধাত্রী হাতে লইয়া দেখিয়া শুনিয়া খাতাটি নিজের কাছে রাখিয়া দিল।

কি ওটা?

বাজে।

উমানাথ দৃঢ়কণ্ঠে বলিল, দেবীদাস রায়ের সিন্দুকে সোনা থাকে—বাজে জিনিস থাকে না দিদি, আপনি চিনতে পারেন নি। দিন আমাকে—দেখব। বলিয়া হাত বাড়াইল।

জগদ্ধাত্রী ঝঙ্কার দিয়া উঠিল, তা বই কি। আমার হাতের লেখার খাতা, আমি চিনি নে?

ক্ষেত্রনাথকে দেখাইয়া বলিল, এ ওঁর কীর্তি। বলিতে লাগিল, মনে পড়ে পল্টুদা, এই খাতা আর শিশুবোধক তুমি চুরি করে এনে দিয়ে-ছিলে। এই তোমার হাতের লেখা—কি ধ্যাবড়া আর যাচ্ছেতাই। আর এই আমার—কেমন মুক্তোর মতো দেখ দিকি! সকালবেলা উনি তিন-চার ছত্র করে লিখে দিয়ে যেতেন—পাঠশালে সমস্ত দিন ধরে যত মার

খেতেন, বাড়ি এসে তার শোধ তুলতেন আমার উপর—সমস্ত দিন ধরে সেই ভয়ে বসে বসে দাগা বুলোতাম। কত কষ্টই যে দিয়েছ তুমি—

পুঁথিপত্র নামাইয়া সিন্দুক ক্রমশ খালি হইতে লাগিল। মাঝের তক্তা ভাঙিয়া গিয়াছে, সমস্ত জোড় আলগা হইয়া গিয়াছে, তলাটাও একদম নাই। দেখিয়া শুনিয়া হৃদয়ের প্রতিশোধের উষ্ণতাও ক্রমশ শীতল হইয়া আসিতে লাগিল। টাকা দিয়া এই বস্তু কিনিয়া বাড়ির পথেই তো অর্ধেক গুঁড়া হইয়া যাইবে। বলিল, ইস, একদম গিয়েছে যে!

জগদ্ধাত্রীও বুঝিল, ইহা কায়দায় ফেলিয়া দাম কমাইবার চেষ্টা। সভয়ে কহিল, নেবে না নাকি? না-ই যদি নেবে, এই টানা-হেঁচড়ার দরকার ছিল কি?

হৃদয় বলিতে লাগিল, নেবো না বলছে কে? কিন্তু আগে তো জানতাম না, এই দশা। দশ টাকা আমি দিতে পারব না।

ক্ষেত্রনাথ কি বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু তার আগেই উমানাথ বলিয়া উঠিল, আমি রাখব দিদি, আমি দশ টাকা দেব। সরুন, পুঁথি-পত্তোর তুলে ফেলি, গানের খাতা তুলে ফেলি—বলিয়া সহায়রামের গানের খাতা কপালে ঠেকাইয়া সে সিন্দুকে তুলিল। বলিতে লাগিল, বরাতক্রমে ঘরে এসেছে তো এমন সিন্দুক জীবন থাকতে ছাড়ছি নে। দশ টাকা চান, তাই দেওয়া যাবে। সরো হৃদয়, তোমার পিছনে ওদিকটায় আরও যে কি কি সব পুঁথি রয়েছে···

সমস্ত সাজাইয়া তুলিয়া উমানাথ সিন্দুকের ডালা বন্ধ করিল। ক্ষেত্র-নাথের দিকে তাকাইয়া দেখিল, তিনি নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া আছেন। তারপর জগদ্ধাত্রীর হাতের দিকে নজর পড়িতে বলিল, ওটা আবার কি—সেই হাতের লেখার খাতা?

জগদ্ধাত্রী হাসিয়া বলিল, এটা তো বিক্রি করি নি···আচ্ছা, কত টাকা দিতে পার এর দাম? এক পয়সাও না? তাই বই কি! লাখ টাকা—বুঝলে, তারও বেশি। তারপর বলিল, যা-ই হোক—টাকা দশটা কালকে দিয়ে দিও উমানাথ, খুব সকালে রওনা হয়ে যাব। হৃদয় লক্ষ্মী ভাই, আজ বিকেলের দিকে একটা গরুর গাড়ি ঠিক করে রেখো—

হৃদয় বিরক্ত কণ্ঠে বলিল, আমি পারব না। ক'দিন ধরে এই করে

করে কাজকর্ম হচ্ছে না কিছু। আজ আমার আদায়ে বেরুতে হবে। আপনি আর কাউকে বলুন।

ক্ষেত্রনাথ এতক্ষণ সকলের পিছনে নির্বাক পাথরের মতো দাঁড়াইয়া কি ভাবিতেছিলেন তিনিই জানেন, এইবার কথা কহিয়া উঠিলেন। বলিলেন, তুমি ভেবো না জগো, গাড়ি আমি ঠিক করে দেব। আর এত বেলায় হৃদয়ের বাড়ি অদ্দূর না-ই গেলে। তরঙ্গিণীর আপ্যায়নের কথা ভাবিয়া একবার একটু ইতস্তত করিলেন, তারপর দৃঢ়কণ্ঠে বলিলেন, আজ থাকো আমার বাড়ি কাল এখান থেকে অমনি চলে যেও। হৃদয় বরঞ্চ একসময় কাউকে দিয়ে তোমার জিনিষপত্তোর যা আছে পাঠিয়ে দেবে।

তা দেব—বলিয়া ব্যঙ্গভরা হাসি হাসিয়া হৃদয় বলিল, অঢেল জিনিষপত্তোর। মুদো ঘটি আর খান দুই কাপড়—দেব পাঠিয়ে বিকেল বেলা।

সকলে চলিয়া গেল, রহিলেন কেবল ক্ষেত্রনাথ ও জগদ্ধাত্রী। ক্ষেত্রনাথ বলিলেন, জগো, দিয়ে দে যা-কিছু টাকা, আমি তোর জিনিষপত্তোর, বাপের ভিটে—সমস্ত ছেড়ে দিচ্ছি। আমি বেঁচে বাঁচি তা হলে।

জগদ্ধাত্রী হাসিল।

না পারিস আচ্ছা, টাকা দিস এর পর। সত্যি তুই চাস? একটু থামিয়া আবার বলিলেন, সত্যি সত্যি চাস কিনা তাই বল।

জগদ্ধাত্রী একটু চুপ থাকিয়া বলিল, ও তোমারই থাক। তুমি বরঞ্চ মাঝে মাঝে দু এক টাকা করে পাঠিয়ে দিও আমায়। জায়গা-জমি তো পেটে খাওয়া যায় না।

পরদিন খুব ভোরে গরুর গাড়ি আসিয়া দাঁড়াইল। মেজবউ ছোটবউ অনেক আগেই উঠিয়াছে। বলিল, ভুলে যাবেন না মা, আসবেন আবার।

আঁচলের প্রান্তে চোখ মুছিয়া জগদ্ধাত্রী বলিল, সোনার বাছারা তোদের মা, ছেড়ে যেতে মন আমার চাচ্ছে না।

ক্ষেত্রনাথ আসিয়া ডাকিলেন, শোনো—

তাহাকে একান্তে ডাকিয়া পাঁচটি টাকা হাতে দিলেন। বলিলেন, সিন্দুকের দাম।

জগদ্ধাত্রী আশ্চর্য হইয়া বলিল, এ কি? দশ টাকার কথা ছিল যে! উমানাথ কোথায়?

সে তো তারপর থেকে নিরুদ্দেশ। মঠবাড়িতে গেছে, সেখানে মালসাভোগ হচ্ছে আর কি! তার কথায় কি হবে? দরদস্তুরের সে জানে কি? নেহাৎ বলে ফেলেছে বলেই—নইলে ভাঙা সিন্দুক আর কি কাজে লাগবে বল? ইচ্ছে হলে তোমার জিনিষ নিয়ে যেতে পার।

জগদ্ধাত্রী ভাবিতে লাগিল।

ক্ষেত্রনাথ প্রশ্ন করিল, কি বল? যাবে নিয়ে? ঐ রকম বেকায়দা জিনিষ গরুর গাড়িতে যাবে বলে তো বোধ হয় না, অন্য রকম ব্যবস্থা করতে হয় তা হলে। খরচও ঢের—

জগদ্ধাত্রী বলিল, দাও, ও-ই দাও—তোমার যা খুশি···আসা-যাওয়ার ভাড়া গেল চার—হাতে থাকল এক টাকা। তাই ভাল। বলিয়া ম্লান হাসি হাসিয়া হাত পাতিল।

ক্ষেত্রনাথ টাকা দিয়া একটু ওদিকে যাইতে আভা পুনশ্চ আগাইয়া আসিয়া সসঙ্কোচে বলিল,মা, ছোঁব আপনাকে?

জগদ্ধাত্রী হাসিয়া বলিল, মুচির মেয়ে নাকি তুই যে ছুঁলে জাত যাবে?

নত হইয়া সে জগদ্ধাত্রীকে প্রণাম করিল। বলিল সকালবেলা নেয়ে-টেয়ে নিয়েছেন কিনা—তাই বলছিলাম। পায়ের ধুলো নি একটু আপনার যাবার বেলা—

জগদ্ধাত্রী ছোট মেয়ের মতো তাহাকে জড়াইয়া কোলে তুলিয়া লইল। অশ্রু আর বাধা মানিল না, ঝরঝর করিয়া গাল বহিয়া ঝরিতে লাগিল। চিবুকে আঙুল ছোঁয়াইয়া আঙুলের অগ্রভাগ চুম্বন করিয়া বলিল, রাজ-রাণী মা তুই আমার—পোড়াকপালির পায়ে হাত তুই কেন দিবি মা? কেন দিবি, কেন? খানিক স্তব্ধ হইয়া রহিল। তারপর যেন তন্দ্রা ভাঙিয়া বলিয়া উঠিল, আচ্ছা, যাই তবে। তোর শাশুড়ি এখনও ঘুমুচ্ছেন বুঝি! নিতাই কোথায় রে—ঘুমুচ্ছে?

আচ্ছা, চললাম। ও পন্টু দা—

ক্ষেত্রনাথ মুখ ফিরাইতে জগদ্ধাত্রী বলিল, আচ্ছা, সেই যে গাড়িটা—মেলার সেই রেলগাড়ি—দাম ঠিক ঠিক কত নেবে বল তো?

ক্ষেত্রনাথ বলিলেন, বলে তো পাঁচসিকে। এক টাকার কম দেবে না বোধ হয়—

এই টাকাটা দিয়ে নিতুকে ওটা কিনে দিও। বলিয়া আঁচলের প্রান্ত হইতে ক্ষেত্রনাথের দেওয়া পাঁচ টাকার একটি টাকা বাহির করিয়া বাঁধানো বোধন-পিঁড়ির উপর রাখিল। আবার হাসিয়া বলিল, গরুর গাড়ির চার আর রেলগাড়ির এক। লাভে রইল আমার এই খাতাখানা। তবু তো বাপের বাড়ির একটা জিনিষ—

জীর্ণ মটকার থানের আঁচলে সেই কীটদষ্ট বহু-পুরাতন দাগা-বুলানো হাতের-লেখার খাতাখানা যত্ন করিয়া জড়াইয়া লইয়া জগদ্ধাত্রী গাড়িতে গিয়া বসিল।

ক্যাঁচ-কোঁচ শব্দ করিয়া আর্তনাদ করিতে করিতে অসমান গ্রাম্য রাস্তার উপর দিয়া গাড়ি চলিয়াছে। চলিতে চলিতে হঠাৎ কি রকমে গরুর কাঁধের ফাঁস খুলিয়া গিয়া গাড়ি একটুখানি থামিল। অল্প দূরেই সহায়রাম রায়ের পরিত্যক্ত ভিটার উপর শিশির-স্নাত হলুদবরণ সরিষা-ফুলের সমুদ্র। প্রভাতের শান্ত নিস্তব্ধ গ্রাম। চণ্ডীমণ্ডপের দাওয়ায় দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ক্ষেত্রনাথ দেখিতেছিলেন। হঠাৎ কি মনে হইল, বাক্স হইতে আরও পাঁচটি টাকা লইলেন। এক মুহূর্ত ইতস্তত করিলেন, তারপর গাড়ির পিছে পিছে এক রকম ছুটিয়া গিয়া ডাকিয়া থামাইয়া টাকা কয়টি জগদ্ধাত্রীর হাতে দিলেন।

এই নাও। হল তো? ঘর সারাতে হয়, যা করতে হয়, কর গিয়ে—আমি আর কিছু জানি নে। যেন একজন কাহার উপর বড় অভিমান করিয়া বিদায় হইয়া যাইতেছে—নিজের মান বজায় রাখিতে হইবে, তাহাকেও ঠাণ্ডা করিতে হইবে, এমনি একটা ভাব। ক্ষেত্রনাথ বলিতে লাগিলেন, ভায়া আমার বেশ মানুষ। দশ টাকা হুকুম করে নিজে তো গা ঢাকা দিয়েছেন, এখন মর শালা তুই টাকার জোগাড় করে।

অপর পক্ষ অবাক বিস্ময়ে চাহিয়া আছে দেখিয়া ক্ষেত্রনাথ

গাড়োয়ানের উপরেই হাঁক দিলেন, চালা, চালা—বেলা বাড়ছে না? থেমে রইলি কেন?

জগদ্ধাত্রী বলিল, আর কতদূর যাবে পল্টুদা, ফেরো এবার।

তাই তো! বলিয়া ক্ষেত্রনাথ চমকিয়া মুখ তুলিলেন। তারপর হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিলেন, না হয় যাব তোর বাড়ি অবধি। একটা দুটো দিন খেতে দিবি নে?

উঠে এসো, গাড়িতে জায়গা ঢের। গাড়োয়ানকে বলিয়া জগদ্ধাত্রী গাড়ি দাঁড় করাইল। নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, তুমি যাবে আমার বাড়ি? হা রে আমার কপাল! সেই জঙ্গলরাজ্যের মধ্যে যাবে আনন্দের হাট ফেলে?

ক্ষেত্রনাথ নিরাপত্তিতে গাড়িতে উঠিলেন, আবার গাড়ি চলিতে লাগিল। সামনে ধুলা উড়াইয়া আর একটা গরুর গাড়ি চলিতেছে। জগদ্ধাত্রী পুনশ্চ প্রশ্ন করিল, সত্যি, চললে কোথায়? এদিকে তাগাদাপত্তোর আছে বুঝি?

সে কথায় কান না দিয়া হঠাৎ ক্ষেত্রনাথ উচ্ছ্বসিত গলায় হাসিয়া উঠিলেন। মনে হইল, কতকাল—কতকাল পরে গলার উপর হইতে কিসের একটা বাঁধন খসিয়া গিয়াছে, বুক ভরিয়া ক্ষেত্রনাথ হাসিতে লাগিলেন। বলিলেন, দেখ, দেখ—ঐ গাড়ির ওরা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে। কি ভাবছে বল তো?

জগদ্ধাত্রীর মুখেও মৃদু হাসির আভা খেলিয়া গেল। বলিল, কি ভাবছে ওরাই জানে—

আচ্ছা, এই যদি বিশ-পঞ্চাশ বছর আগে হ'ত—এমনি ভাবে যেতাম, লোকে ঠিক হাসাহাসি করত—না? কি ভাবত বল দিকি?

জগদ্ধাত্রী তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল, তা হাসত। ভাবত, তোমার ঠ্যাং ভেঙেছে। পায়ে বল থাকতে শখ করে কেউ কি আর গরুর গাড়ি চড়ে?

তোমার মুণ্ডু।

তবে?

সেই সময় এদেশ-সেদেশ কত কি রটে গিয়েছিল, মনে আছে?

ক্ষেত্রনাথ ঘাবড়াইয়া গেলেন। ভারি লজ্জা হইল। সহসা কথা জোগাইয়া উঠিল না।

বলিলেন, লজ্জা নয়···হাসির কথা, শুধু একটা হাসির কথা জগো, একটা সেকেলে কথা। কত কথাই তো মানুষে বলে—

জগদ্ধাত্রীর চোখে এক ফোঁটা জল গড়াইয়া আসিল। অলক্ষ্যে মুছিয়া সে বলিয়া উঠিল, হোক কথা। আমি এক্ষুণি গ্রামে ফিরে তোমার সমস্ত কীর্তি রাষ্ট্র করে দেব।

কণ্ঠস্বরে কৌতুকের আভাস পাইয়া ক্ষেত্রনাথ মুখের দিকে তাকাইলেন, চোখ দু'টি তার ছল-ছল করিতেছে। হাসিয়া উঠিয়া বলিলেন, তা দিগে যা। তখনকার মানুষ কে আছে, আর কে-ই বা বুঝবে? এক্ষুণি আনন্দের হাটের কথা বলছিলি না জগো, আমাদের এখন ভাঙা হাট, আমাদের হাটের মেলা ঐ জমছে ঐদিকে।

বলিয়া আকাশের দিকে নির্দেশ করিয়া হঠাৎ চুপ হইয়া গেলেন।

নদীর তীরে খেয়াঘাটে গাড়ি থামিল। মঠবাড়ি এখান হইতে বেশি পথ নয়, সেখানে এখনও প্রবল খোলের আওয়াজ। খেয়ানৌকা ঘাটে পড়িয়া আছে, কিন্তু মাঝি নিরুদ্দেশ। জমার খেয়া নয়, অতএব ইহা নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। পারার্থীরা আসিয়া মাঝির ঘরের দরজায় ধন্না দিয়া পড়ে, মেজাজ যেদিন তার ভাল থাকে ঘণ্টাখানেকের বেশি ডাকাডাকি করিতে হয় না। গাড়োয়ান মাঝির খোঁজে চলিয়া গেল।

দু-জনে খেয়াঘাটের কিনারে গিয়া বসিল।

শীতের নদীজলে ধোঁয়ার মতো কুয়াসা উড়িতেছে। তখন ভরা জোয়ার—কল-কল বেগে জল ছুটিয়া আসিয়া পাড়ের উপর প্রহত হইতেছে। একটু দূরে মহাকালের মতো মহাবৃদ্ধ একটি অশ্বত্থগাছ শত-সহস্র ঝুরি নামাইয়া অনেকখানি জায়গা জাপটাইয়া বসিয়া আছে। আগের গরুর গাড়িখানাও গাছের তলায় আনিয়া রাখিয়াছে। ছইএর মধ্যে ফুটফুটে একটি বউ, বউটির মুখের উপর অশ্রুর ছাপ। চালার উপর বাহিরে সুন্দর একটি যুবা বধূর মুখের কাছে মুখ লইয়া হাত-মুখ নাড়িয়া নাড়িয়া কি বলিতেছে। অশ্রু-চোখে বউটি হাসিয়া উঠিল।

দু-জনে সেই তরুণ-তরুণীকে দেখিল, কুয়াসাচ্ছন্ন নদীস্রোতের দিকে দেখিল, চারিদিকের নিস্তব্ধ প্রান্তর পথ-ঘাটের দিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিল। হঠাৎ ক্ষেত্রনাথ বলিয়া উঠিলেন, দশা তোরও যা, আমারও তাই। আমারও কেউ নেই—তোরও না।

জগদ্ধাত্রী গাঢ় স্বরে বলিল, ওরা কেউ যত্ন করে না বুঝি!

ক্ষেত্রনাথ ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, মানুষের দোষ নয় রে—বয়সের দোষ। কিন্তু সে যাক, তুই রাগিস নি তো? বল্ জগো, সত্যি করে বল্—

জগদ্ধাত্রী হাসিয়া বলিল, না। আমি কি সেই জগদ্ধাত্রী আছি না তুমি সেই পন্টুদা? আমরা দুই বুড়োবুড়ি আর কাদের গল্প বলছিলাম।

দু-জনেই হাসিতে লাগিল।

গাড়োয়ান ফিরিয়া খবর দিল, মাঝি বাড়িতেও নাই—রাত্রে মঠবাড়িতে গান শুনিতে গিয়াছিল, এখনও ফিরে নাই।

ক্ষেত্রনাথ বলিলেন, আমি যাই। বেটাকে তাড়া না দিলে কি উঠবে?

জগদ্ধাত্রী উঠিয়া দাঁড়াইল।

তুইও যাবি নাকি?

মঠবাড়িতে গান তখন বড় জমিয়াছে। অষ্টপ্রহর সঙ্কীর্তন, শেষরাত্রি হইতে গান জুড়িয়াছে। বাল বালক-সঙ্কীর্তনের দল আসিয়া পড়িয়াছে, কালও সমস্ত দিন গান হইয়াছে, সেই জন্য উমানাথের আর বাড়ি যাওয়া হয় নাই। জগদ্ধাত্রী চলিয়া যাইবে তাহা মনে ছিল, তব যাইতে পারে নাই। অনেকক্ষণ অবধি চুপ করিয়া গান শুনিয়া, তারপর সে থাকিতে পারে নাই, নিজেই দলের মধ্যে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল। গান ভাঙিতে বেলা গড়াইয়া গেল, তখন আর বাড়ি-ঘরের কথা উমানাথের মনে নাই। বৈষ্ণব-সেবার ডাক আসিল, উমানাথ তখনও মনে মনে সুর ভাঁজিতেছে।

সেই প্রথম দিনের দলটির কর্তা আসিয়া মনে করাইয়া দিল, ছোট-চাটুজ্জে মশায়, মনে আছে তো আমাদের মাথুর পালাটা ঠিক করে দেবার কথা?

কীর্তনীয়াদের থাকিবার জন্য খড়ে-ছাওয়া প্রকাণ্ড মণ্ডপ। তাহার একদিকে চাঁদের আলো আসিয়া পড়িয়াছে। কেরোসিনের ডিবাটা সরাইয়া লইয়া উমানাথ সেখানে বসিল। খেরো-বাঁধা পাতা বাহির হইল, আর বাহির হইল সহায়রামের পুরাণো গানের খাতা—দেবীদাস রায়ের সিন্দুকে যাহা পাওয়া গিয়াছে। খাতার সঙ্গে দড়ি দিয়া বাঁধা পেন্সিল থাকিত।

গুনগুন করিয়া গাহিতে গাহিতে উমানাথ পালা লেখা শেষ করিল। রাত্রেই খানিক তালিম দেওয়া হইয়াছে, সকাল হইতে সেই পালা চলিতেছিল—

বৃন্দা বলিতেছে, ওগো অকরুণ শ্যাম, তোমার বিরহে বৃন্দারণ্য শ্মশান হইয়াছে, তোমার পথ চাহিতে চাহিতে গোপীরা অন্ধ হইয়া গেছে, তোমার সোহাগিনী রাই শীর্ণ চতুর্দশী-চাঁদ হইয়া ধূলায় পড়িয়া রহিয়াছে, প্রাণের স্পন্দনটুকু তাহার বুঝি এতদিনে নিঃশেষে থামিয়া গেল…

সহসা শ্রোতারা চাহিয়া দেখিল, ক্ষেত্রনাথ চাটুজ্জে মহাশয় একপাশে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া শুনিয়া অবশেষে সকলের মধ্যে বসিয়া পড়িতেছেন। জগদ্ধাত্রীও মেয়েদের মধ্যে বসিয়াছে।

তখন দূতীকে কৃষ্ণ অভয় দিতেছেন, ভয় করিও না সখি বৃন্দে, আমি ফিরিয়া যাইতেছি। আমার রাইকমল—আমার কৈশোরের সেই বৃন্দাবন—কিছুই মরে নাই। আবার আমি ফিরিয়া যাইব, ম্লান কুসুম শতদল ফুটিয়া উঠিবে…

…পীত ধড়া পরিয়া হাতে মুরলী লইয়া মথুরার রাজা কতকাল—কতযুগ পরে আবার রাখাল-বেশে কৈশোরের বৃন্দাবনে চলিলেন। আকাশে চাঁদ উঠিল, যমুনা উজান বহিতে লাগিল, হারাণো কালের বাঁশীর ধ্বনি আবার গোকুল-বৃন্দাবন আকুল করিয়া বাজিতে লাগিল…দুরন্ত কালার ভয়ে ভূমিশয্যা ছাড়িয়া চকিতে শ্রীমতী মুখ ঝাঁপিয়া বসিলেন। আঁচল ধরিয়া গদগদ কণ্ঠে কত কি কহিতেছেন। কুঞ্জবৃক্ষের শাখাগ্রে কোকিল ডাকিতে লাগিল…

সজল চোখে জগদ্ধাত্রী ক্ষেত্রনাথের দিকে চাহিল। ক্ষেত্রনাথও তাকাইলেন। সবিস্ময়ে সকলে দেখিল, ক্ষেত্রনাথের চোখে জল। গান শুনিয়া ক্ষেত্রনাথ কাঁদিয়া ফেলিবেন, অতিবড় শত্রুও এমন অপবাদ দিবে না। হয়তো চোখের অসুখ, হয়তো চোখে খড়-কুটা পড়িয়াছে—